বিষয় গজ়ল

অজিত রায়

বিষয় গজল

বিষয় গজল

অজিত রায়

BISHOY GHAZAL
A Complete Research-Work on Urdu & Hindi Ghazal
by
AJIT ROY

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০২১

গ্র ন্থ স্ব ত্ব
অজিত রা
অ ক্ষ র বি ন্যা স
দাঁড়িয়াবান্ধা
প্র চ্ছ দ
নির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিকথা পাবলিকেশন-এর পক্ষে
ধীমান ভট্টাচার্য কর্তৃক শিমুলিয়া পাড়া, চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, ৭৪৩২৪৫ থেকে প্রকাশিত এবং
শরৎ ইমপ্রেশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩ থেকে মুদ্রিত।

ISBN 978-81-952322-0-8

যোগাযোগ : ৯১৫৩৬৪৯৩২৮
E-mail : itykathapublication@gmail.com
www.itykatha.com

প্রা প্তি স্থা ন
ইতিকথা বইঘর
সূর্য সেন স্ট্রিট, ব্লক ২, স্টল ২৪,
কলেজ স্কোয়ার, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১২

পেন্ডুলাম পাবলিশার্স
দোকান-৭১,
কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স, কাঁটাবন, ঢাকা, বাংলাদেশ।

উৎসর্গ

ফিরাক গোরখপুরী ও দুষ্যন্ত কুমারকে
যাঁরা বুঝেছিলেন, এবং রাষ্ট্র যে-কথা বোঝে না, যে,
সমাজে সৃষ্টিশীল কাজই হচ্ছে সবচেয়ে ব্যবহারিক বিষয়।
কেননা, সৃষ্টিশীল কাজগুলিই মানুষকে অটোলভাবে প্রতিফলিত করে।

লেখকের অন্যান্য গবেষণা-গ্রন্থ

বাংলা স্ল্যাং : সমুচয় ঠিকুজিকুষ্ঠি (১ম সং ২০১২, ২য় সং ২০১৭)

ছোটলোকের শব্দলোক (২০০৫)

বাংলা স্ল্যাং (২০০৭)

যৌনতা : সমুচয় তত্ত্বতালাশ (২০০৬)

ধানবাদ ইতিবৃত্ত (১ম সং ১৯৯৬, ২য় সং ২০০৭, ৩য় সং ২০২১)

ঝাড়খণ্ড ইতিবৃত্ত (২০২১)

হাংরি জেনারেশন : গেরো-ফাঁসগেরো (২০০৫)

বিষয়বস্তু

লেখকের এযাবৎ প্রকাশিত উপন্যাস সমূহ

দোগলাচরিত (১৯৮৮)
এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না (১৯৯২)
এক জর্নলিস্ট কী মৌত (হিন্দী, ১৯৯৫)
যোজন ভাইরাস (১৯৯৮ থেকে এযাবৎ ৭টি সং)
পাপরাৎজি (১৯৯৮)
পাতিনা ওয়েসিস (১৯৯৯)
কারগিল হাসিলের দিনগুলি (১৯৯৯)
ম্যাওড়া জোন (২০০০)
মায়ামঘর (২০০১)
জোখিম কোরকাপ (১ম সং ২০০৪, ২য় সং ২০২১)
পাগলনামা (২০০৫)
ধানকাঠের তয়খানা (২০০৫)
নভাক যামিনী (২০০৭)
রত্নিসুখের একক উপপাদ্য (২০০৮)
ঘামলাঘাট (১ম সং ২০১০, ২য় সং ২০২১)
হিরণ্যরেতাঃ (১ম সং ২০১১, ২য় সং ২০১৯)
ফখ্র হোগা তুমহে কি তুমনে এ কে রায় কো দেখা থা (হিন্দী, ২০১১)
শহীদ গুরুদাস চটর্জী কী মার্মিক দাস্তান (হিন্দী, ২০১২)
নিরুজের রক্ততৃষা (২০১৪)
রূপকথা মগলা (২০১৬)
খানাখারাব (২০১৭)
যাতনাভূমি (২০১৭)
জুভেনিলিয়া জুনূন (২০১৮)
দামুণ্ডাচরের কালিখপুরাণ (২০১৯)
নির্জিত প্রেমের কুহর (২০২১)
ক্ষুৎক্ষাম (২০২১)
চিহ্নদখলের লড়াই (২০২১)
বহমান নিয়ামকের সেরেস্তা (২০২১)

রাষ্ট্র কখনোই বোঝে না অথচ কবি বোঝেন, যে, অর্থোপার্জন অথবা নিজেকে পণ্ডিত কিংবা দানেশমন্দ জাহির করার মতো বেওকুফি আর হতে পারে না। কবি যা বোঝেন অথচ রাষ্ট্র বোঝে না, যে, সমাজে সৃষ্টিশীল কাজই হচ্ছে সবচেয়ে ব্যবহারিক বিষয়। কেননা, সৃষ্টিশীল কাজগুলিই মানুষকে অটোলভাবে প্রতিফলিত করে। মানুষের মধ্যে ইদানীং কলাকৌশলের প্রতি মনোযোগ বেড়েছে। মনোযোগটা শিল্পপ্রকরণের দিকে নয়। শিল্পসামগ্রীর দিকে। এই বিশেষ প্রবণতাকে লক্ষ্য রেখে বর্তমান গ্রন্থের পরিকল্পনা। প্রকৃতিস্থ মানুষের যে-বয়সে হাজার ডিং মেরেও দরজার ছিটকিনিতে হাত পৌঁছোয় না—সেই কৈশোর লগ্নে আমার মধ্যে কাব্যরোগের দারুণ দুর্লক্ষণ জাগে। এক খেরো খাতায় লেখা কিছু প্রেমমূলক উর্দু শের-এর হদিস পেয়েছিলাম। ব্যাধির প্রকোপ তখন থেকেই। খাতাটা ছিল আমার এক দূর-সম্পর্কীয় দাদার একান্ত গোপন বৈভব। তিনি যৌবনের মুগ্ধ প্রহরে নিরিবিলি পুষ্পকাননে শুয়ে ঘাসের ডাঁটি চিবোতে চিবোতে সুললিত স্বরে গজলের শের আবৃত্তি করে শোনাতেন তাঁর প্রেয়সীকে। ওইসব শের-এর স্তৈনপাঠ থেকেই শুরু হয়েছিল আমার গজলচর্চা। এবং এতদিন যা ছিল নিছক ব্যক্তিগত রসাস্বাদনে সীমিত, তাকেই সর্বজনীন রূপ দেবার অভিপ্রায়ে এই গ্রন্থ।

বাংলায় গজল নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভবত এই প্রথম। আমার আলোচনা মূলত উর্দু ও হিন্দী গজল নিয়ে। অন্যান্য ভাষা, যেমন আরবি, ফারসি কিংবা গুজরাটি, পাঞ্জাবি, রাজস্থানি, মারাঠি প্রভৃতি ভাষায় যে-পরিমাণ এলেম থাকলে সে-সমস্ত ভাষার গজল নিয়ে চর্চা করা সম্ভব, সেহেন জ্ঞান আমার নেই। সাহিত্যের যে বিশেষ ফর্ম বা শৈলী আবহমান কাল ধরে উর্দু ও হিন্দী পাঠকমণ্ডলীর এক বিরাট অংশের রসতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করে চলেছে, তারই যথাসম্ভব সম্পূর্ণ ও প্রামাণ্য পরিচয় পরিস্ফুটনের চেষ্টা করেছি এ গ্রন্থে। গোড়ার পরিচ্ছেদগুলিকে সাজিয়েছি আঞ্চলিক শৈলীর ধারার ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শাসকবংশের ক্রম অনুযায়ী এবং শেষের দিকে অনুসৃত হয়েছে শায়র ও শায়রীর ধারা। সংগীত-পিপাসুদেরও খুশি করতে বিন্দুমাত্র কসুর করিনি। সেকালের বাঈজীদের সঙ্গে গজলের সম্বন্ধ এবং একালের গজল গান, তার জনপ্রিয়তার উৎস, সারল্য ও ব্যর্থতা ইত্যাদি নিয়ে রয়েছে পৃথক আলোচনা। কিন্তু আমি যেহেতু কাব্যকাতর, তাই গজলের সংগীত ধর্মের চেয়ে সাহিত্যমূল্যের আলোচনাকেই তোল্লাই দিয়েছি বেশি।

আলোচনা অযথা উদ্ধৃতিতে অহেতুক কণ্টকিত করতে চাইনি। প্রবন্ধে ভূরি-ভূরি উদ্ধৃতি পাঠকের বিরক্তির কারণ হতে পারে এই আশঙ্কায় যেসব রচনার ঋণ নিয়েছি তাদের স্বীকৃতি গ্রন্থ শেষে সকৃতজ্ঞ সন্নিবেশিত হয়েছে। আলোচনাকে সজীব করতে গিয়ে মাঝেমধ্যেই 'আমি' নামক ব্যক্তিটি চলে এসেছে। এড়াবার উপায় ছিল না—কারণ এতে এমন বহু শায়র ও গজলিয়ার কথা বলা হয়েছে, যাঁদের সঙ্গে এই 'আমি'টির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল বা আছে। যাঁরা নিজেদের বহুমূল্য সময় অপচয় করে আমাকে সাক্ষাৎকার ও চিঠি দিয়েছেন এবং যেসব সহৃদয় ব্যক্তির সহযোগিতা ভিন্ন এ রচনা সম্পূর্ণ হত না, ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদের অকৃত্রিম প্রীতির মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করতে চাই না।

অজিত রায়

মহরত

“The ghazal is a marvel of the magnetic dynamism of *husn o i'shq* (beauty and live) in highly charged metaphoric idiom. It is a celebration of love and freedom in an ambience of pure ecstasy and unremitting joy as well profound capacity for enduring pain and suffering. The ghazal is the soul of Urdu poetry and the play of creativity at its peak.”—এভাবেই গজলকে সংজ্ঞা প্রদানের মাধ্যমে পাতনামা করেছেন গোপীচাঁদ নারং, তাঁর ‘The Urdu Ghazal : A Gift of India's Composite Culture’ নামের স্মৃতিসৌধ গ্রন্থটির। মোদ্দা কথা, গজল উর্দু কাব্যসাহিত্যের আত্মা এবং উর্দু কবিদের মননবিশ্বে সরাসরি শীর্ষে তার অবস্থান।

গজল বিষয়ক আমার এই যে বইটি, এটি নিছক কোনও মনোগ্রাফ অথবা প্রকরণগ্রন্থ নয়, বরং পারস্যে সুফিবাদের হামাল-পর্বে ফার্সি ভাষায় ফিটাস লাভ করে ক্রমে ক্রমে পথম মিলিনিয়ামের সান্ধ্যকালে সুফি রহস্যবাদ তথা ভারতীয় ভক্তি আন্দোলনের গাঁঠছড়া বাঁধার মওকা বাগিয়ে তা কীভাবে অঞ্জিনব মিশ্রকৃষ্টির ড়ুপ পরিগ্রহ করে ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রোড়ে লালিত হয়ে ক্রমে ক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মিলিনিয়ামে এসে উর্দু তমদ্দুনের গুলবাগিচায় সবচেয়ে বেহত্রিণ মুঞ্জরির শিরোপা হাসিল করল, তার বিশদ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টাও লক্ষিত হবে এতে। এমনিতে গজলের প্রকরণগত তত্ব নিয়ে উর্দু, হিন্দী এবং ইংরেজি ভাষায় বেশ কিছু উন্নতমানের গবেষণাগ্রন্থ বিদ্যমান, কিন্তু আমার এটি সেগুলি থেকে সর্বৈব ভিন্ন। এতে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছে একজন অপেশাদার গবেষকের আ-তারুণ্যসিঞ্চিত গজলের প্রতি নিজস্ব জিজ্ঞাসা ও কোতূহল এবং ঐকান্তিক মমত্ব।

সাহিত্যরাজ্যে গজলের সংবৃত্তি বা সূচনা এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে যখন এই উপকহাদেশে ভাষা ও সাহিত্য তথা সংস্কৃতি ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক রাহুর যাদুটোনায় হয়ে পড়েছিল একুনে মোহাচ্ছন্ন। গজল সেই জীয়নকাঠি যা মানুষের প্রাণনে নিষেক করল নতুন আস্তিত্বক চেতনা, প্রেমময় দৃষ্টি এবং অন্তঃস্যন্দী মানবতার তরস্বান তোড়।

খানিক পেছনে ফিরে যাই। ইতিহাসের যে-লগ্নে ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন ও আগ্রাসন শুরু হয়েছিল এবং যার ফলস্বরূপ এই উপমহাদেশে কম্পোজিট কালচারের সূচনা, সেই একই কালপটে আমরা হিন্দু ভক্তি আন্দোলনের মূর্তিটিকে অদূরে দণ্ডায়মান দেখতে পাই, যা ক্রমশ ভারতীয় হিন্দু মানসে বাসাও বাঁধতে শুরু করেছিল। ভারতীয় বহুত্ববাদী ও সমন্বয়ী ঐতিহ্যের এক প্রোজ্জ্বল প্রকাশ আমরা দেখতে পাই ভক্তি ও সুফি আন্দোলনের মধ্যে। দুটি আন্দোলনই বেশ কয়েক শতাব্দী জুড়ে সৃষ্টিশীল কবি, চিন্তাবিদ এবং ভারতীয় আম জনতাকে প্রভাবিত করে রেখেছিল এবং উভয়েরই একটি সর্বভারতীয় চরিত্র ছিল।

যদিও সুফি মতবাদের উদ্ভব আরবে, কিন্তু এর জন্মলগ্নেই এই মতাদর্শের ওপর যোগ, উপনিষদ ও বৌদ্ধ ধর্ম এবং বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক প্রস্তাবের গভীর প্রভাব পড়েছিল। ভারতে খৃষ্টীয় নবম-দশম শতকে ইসলাম ধর্মের অভ্যন্তরে যে প্রগতিশীল আন্দোলন শুরু হয়েছিল, সেটিই ছিল এখানকার সুফি আন্দোলন। যারা সুফ বা পশমের বস্ত্র পরিধান করে, তারাই সুফি। অর্থাৎ সুফি শব্দটির সঙ্গে ‘সাফা’ বা ‘শুচিতা’ অথবা ‘পবিত্রতা’র কোনো যোগ নেই। সুফিদের মধ্যে মতাদর্শ ও তত্বগত বৈভিন্ন্যের দরুন তাঁদের পারস্পরিক বিরোধও ছিল। ভারতে সুলতানি সাম্রাজ্য পত্তনের ফলে মুসলিমদের মধ্যে ভোগবিলাস তথা ঐশ্বর্যের দাপ ও উন্মাদনা তথা নৈতিক অধঃপতন চাগিয়ে উঠলে কতিপয় ধর্মপ্রাণ মুসলমান সুফি আন্দোলনের সূত্রপাত করেন এবং গোঁড়া মুসলমানদের উষ্মা ও রোষের কোপে পড়েন। গোঁড়ারা সুফিদের সরাসরি ইসলাম-বিরোধী আখ্যা

দিয়েছিলেন। ফলে সুফিরা আন্দোলন থেকে সরে গিয়ে জনৈক পীর বা শেখের অধীনে নিজস্ব ধর্মমঠ গড়ে তুলে নির্জনে ধর্মচর্চা শুরু করেন এবং তাঁরা হয়ে ওঠেন ফকির বা দরবেশ।

সুফিদের মূল তত্ত্ব হলো, প্রেম ও ভক্তিই ঈশ্বরলাভের একমাত্র পথ। এঁরা কোনও বিপ্লবের প্রত্যাশা করেননি, কেবল বিশ্বাস করতেন এমন দিন আসবে যেদিন আল্লাহ স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে ইসলামের আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। ভারতবর্ষে বিখ্যাত সুফি সন্তদের মধ্যে গোড়ার দিকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন শাহ রুমি, নথর শা, গনজ বকশ প্রমুখ। রুমি বাঙলায় এসেছিলেন ১০৫৩ সালে। ময়মনসিংহের নেত্রকোণায় তাঁর মকবরা আছে। শেষোক্ত জনকে ভারতের প্রথম সুফি সাধক বলে মান্য করা হয়। ভারতের দাক্ষিণাত্যে সুফি মতবাদ নিয়ে যান নথর শা। চেন্নাইয়ের ত্রিচিনোল্লিতে তাঁর সমাধিভূমি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। দ্বাদশ শতক থেকে ভারতবর্ষে সুফি-সন্তদের ঢেউ আছড়ে পড়ে। আসমুদ্রহিমাচল সুফি সাধকেরা ছড়িয়ে পড়েন। যাঁরা এই সময় ভারতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন চিশতি ও সুরাবর্দি সম্প্রদায়। ভারতবর্ষে সুফিদের প্রধানত তিনটি শাখা প্রভাবশালী ছিল—দিল্লি ও দোয়াব অঞ্চলে চিশতি; সিন্ধু, পাঞ্জাব ও মুলতানে সুরাবর্দি; এবং বিহারে ফিরদৌসী। এছাড়া আরও একটি সম্প্রদায় গড়ে ওঠে, সেটি হলো মদানি সম্প্রদায়। চিশতি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মৈনুদ্দীন চিশতি, যিনি মহম্মদ ঘুরির সময়ে মধ্য এশিয়া থেকে ভারতবর্ষে আসেন এবং আজমিরে বসবাস শুরু করেন। চিশতি শাধকদের মধ্যে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত কবি আমির খুসরো এবং ইতিহাসবিদ জিয়াউদ্দীন বরানি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। সুরাবর্দি সম্প্রদায়ের সুফিরা পাঞ্জাব, মুলতান ও বাঙলায় প্রভাবশালী ছিলেন। এঁদের মধ্যে শিহাবউদ্দীন সুরাবর্দি ও হামিদউদ্দীন নাগরি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই সম্প্রদায়ের সুফিরা চিশতিদের মতো কৃচ্ছ্রসাধনে বিশ্বাসী ছিলেন না, এঁরা মেনকি রাষ্ট্রের অধীনে উচ্চপদও গ্রহণ করতেন। এই তিনটি ধারা ব্যতিরেকে সুফিদের আরও কতিপয় উল্লেখযোগ্য ধারা ছিল, এবং কতকগুলি এখনও বিদ্যমান। একাদশ শতকে বাগদাদের সৈয়দ আবদুল কাদির প্রতিষ্ঠা করেন কাদেরিয়া সম্প্রদায়। চতুর্দশ শতাব্দে উদ্ভব হয় বদিউদ্দীন শাল মদারের নেতৃত্বে মদারি সম্প্রদায়। পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে তুর্কিস্তানের খাজা বাহাউদ্দীন নক্কশ বনদ গঠন করেন নকশাবন্দি সম্প্রদায়।

সুফি আর ভক্তি মতবাদের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকলেও ভক্তি আন্দোলন আসলে সুফি আন্দোলনের চেয়েও প্রাচীন। উপনিষদে এর দার্শনিক ও তাত্ত্বিক লক্ষণ সমূহের প্রতিপাদন রয়েছে। ভক্তি আন্দোলন বস্তুত হিন্দুদের সংস্কারবাদী আন্দোলন। ঈশ্বরে অগাধ ভক্তি, মানুষের ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, যাবতীয় ধর্মের সমানতার প্রচার তথা জাতি ও কর্মকাণ্ডের ভর্ৎসনা করা হয়েছে।বাস্তবত, ভক্তি আন্দোলনের প্রবর্তন দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ুতে, সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দের মাঝামাঝি সময়ে, যার উদ্দশ্য ছিল নায়ম্মার তথা আলওয়ার গোষ্ঠীদ্বয়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও মনোমালিন্য দূরীভূত করা। কথিত আছে, এই আন্দোলনের প্রথম প্রচারক নাকি শঙ্করাচার্য। ধর্মভিত্তিক হলেও, ভক্তি আন্দোলন অচিরেই গণচরিত্র অর্জন করেছিল। এই চরিত্র অর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক সংগীত তথা হয়েছিল বাদ্যযন্ত্র। ধর্মপ্রচারক সন্তদের অধিকাংশই ছিলেন কবি ও গায়ক।

পরবর্তীকালে ভারতে ইসলাম ধর্ম প্রসারের ফলে হিন্দু ধর্ম ও সমাজে উদ্বেগ ও অস্থিরতা দেখা দিলে এই আন্দোলন পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মুসলিম শাসকেরা গদি জাঁকিয়ে বসলে হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম বরণের ব্যাপক হিড়িক দেখা দেয়। ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ধর্মান্তরিত মুসলমান। যদিও এই ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়া হিন্দুধর্মের অস্তিত্ব কখনোই বিপন্ন করেনি, তবু এটি হিন্দুদের উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছিল। আত্মরক্ষা ও সমালোচনার পড়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে রামানন্দ, নামদেব, কবীর, গুরুনানক, শ্রীচৈতন্য, মহন্ত শঙ্করদেব, বল্লভাচার্য, মীরাবাঈ, দাদু প্রমুখের নাম সবিশেষ উচ্চার্য।

গজলের উৎপত্তি আরবে হলেও ফার্সি ভাষায় এই জঁরটির যথাযথ বিকাশ ঘটে। যদিও জন্মলগ্নে ভ্রুণটির নাম ছিল 'কাশিদা'। কাশিদার শাব্দিক অর্থ এমব্র্যাসি বা হেম স্টিচ। বাংলায় যাকে বলে, ঝুলপি-সেলাই; আর হিন্দীতে কাপড়ে বেল-বুটি বসানোর কাজ, যেমন 'কসিদা কাঢ়না'। অথচ এখানে যে অর্থে 'কাশিদা', তার সঙ্গে সূচীকর্ম বা বোনাবুনির কোনো যোগ নেই। আরবি শব্দ 'কাসাদ' থেকে এর উৎপত্তি। কাসিদা একটি পুংলিঙ্গবিশিষ্ট বিশেষ্য পদ এবং এটি শায়রির এমন একটি জঁর বা রূপ, যার মাধ্যমে কারও প্রশস্তি বা প্রশংসা করা হয়। মূলত বাদশা-শাহেনশাদের প্রশস্তি গাওয়ার জন্যই লেখ্য-মাধ্যমে এর স্ফুরণ ঘটেছিল। এর সঙ্গে ঈশ্বরের স্তুতি গাওয়ার কোনও যোগ নেই। ইসলাম আগমনের বহু আগে থেকেই আরবে কাশিদা লেখা ও গাওয়া হতো। গোড়ার দিকে ফার্সি-উর্দু কাশিদা লেখা হতো সতেরো চরণে, যাতে থাকত প্রশংসা, নিন্দা অথবা উপদেশের ভাব। কাশিদা লেখকদের বলা হতো 'কাসিদাগো' আর যাঁরা কাশিদা পাঠ করতেন, তাঁরা ছিলেন 'কাসিদাখাঁ'। গোড়ার দিকে ইমাম গজালী, মৌলানা জালালুদ্দীন রুমি, হাফিজ সিরাজী, ফখরুদ্দীন আত্তার, হাকিম শানাঈ প্রমুখ এই নবপ্রসূত জঁরটির অনুশীলন করে বেশ সুনাম অর্জন করেন।

তো, গোড়াতেই আমাদের খুঁড়ে বের করতে হবে উর্দু গজলের সেই অধঃপ্রোথিত ক্রস-কালচারাল শেকড়টি। এগারো শতকের গোড়া থেকেই ইসলামি এবং হিন্দু সংস্কৃতির মিশ্র ধারাটি শেকড় চারাতে শুরু করেছিল ভারতীয় উপমহাদেশে, যা লক্ষ-লক্ষ মানুষকে সম্মোহিত ও বিমুগ্ধ করেছিল। দিল্লির চিশতি সুফি সন্ত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার নিকটতম অনুগামী আমির খহুসরোর (১২৫৩-১৩২৫) উত্থান সময়ের সেই পৃষ্ঠকালে, যিনি ছিলেন মূলত কবি ও সংগীতশিল্পী। আমিরের সমস্ত লেখকর্ম ছিল ফার্সিতে, যেটি মধ্য এশিয়ায় পরচলিত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর ইরানীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত একটি ভাষা। পারস্যের প্রাচীন জনগোষ্ঠীর ভাষা থেকে ফার্সির উদ্ভব। বস্তুত, উত্তর ভারতের তৎকালীন ভাষাপদ্ধতির সঙ্গে ফার্সির মিশ্রণে তৈরি হয়েছিল 'হিন্দুস্তানি' ভাষার এক অভিনব হাইব্রিড প্রোটো-মডে, যা অভিহিত হয় 'হিঁদয়ী' বা 'হিন্দভী' নামে,—সেটিই ছিল আমিরের মাতৃভাষা (তাঁর বাবা ছিলেন তুর্কি কাছারির কর্মী এবং মা রাকপুত)। আমির ঐ হিন্দভী ভাষাথ কবিতা লিখতরন এবং সেগুলি সুফি সভাসমূহে গান করে বেড়াতেন। পরবর্তী কালে ঐ মিশ্রভাষাটি 'রেখতা' নামে চিহ্নিত হয়। রেখতা অর্থে 'বিক্ষিপ্ত', কিন্তু একই সঙ্গে 'মিশ্রিত'; যার আধার ছিল মূলত ফার্সি।

মুসলিম শাসকেরা, যাঁরা নিজেদের রাজত্বের বিসার ঘটিয়েছিলেন গুজরাত এবং সুদূর দাক্ষিণাত্য অবধি, তাঁরা সরকারি কাজকর্মের সুবিধার্থে গুজরাতের 'গুজারি' আর ডেকানের 'দখিনি'র পাশাপাশি এই হাইব্রিড ভাষাকেও ব্যবহার করতে শুরু করেন তখন থেকেই। এই মিশ্রভাষাটি একই অর্থে 'হিন্দয়ী', 'হিন্দুস্তানি', 'উর্দু', 'উর্দু-এ-মুয়ল্লা' এবং 'হিন্দী' নামেও চিহ্নত। আমির খুসরোই সেই আদিকবি যিনি ভারতবর্ষে দোহা, পহেলি, গীত, কাওয়াল, কাওয়ালা এবং নতুন ধরনের প্রাণবন্ত আধ্যাত্মিক গানের প্রবর্তক যেটি ফার্সি-রেখতার মিশ্র ফর্মে পরবর্তী কালে 'গজল' নামে চিহ্নিত হয়। এভাবেই আমির খুসরোর কব্জি ধরে ভারতীয় গজলের সূচনা। আমির খুসরোকে একাধারে হিন্দী আর উর্দুর প্রথম কবিও বলা যেতে পারে।

উর্দুর উৎসমূলে রয়েছে কতিপয় আপাত-বিচ্ছিন্ন অথচ পরস্পর বিলীয়মান ভাষাপদ্ধতির অভিনব সংমিশ্রণ। উর্দু ভাষা গড়ে ওঠার প্রাথমিক পর্বে এটি চিহ্নিত ছিল 'হিন্দভী' নামে, যা একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক ও জনতাত্ত্বিক ভাষাপদ্ধতি রূপে গণ্য হতে পারে। ঐ হিন্দভীর উৎকর্ষে পৌঁছনোর পেছনে রৈখিক বা নগণ্য হলেও, যুক্ত হয় দাক্ষিণাত্যের দখিনি, দিল্লির দেহলভী এবং লখনউয়ের লখনভী।

উর্দু ভাষা 'উর্দু' নামে আখ্যায়িত হওয়ার আগেও শব্দটি বিদ্যমান ছিল। উর্দু মূলত তুর্কী থেকে এসেছে এবং 'শাহী শিবির' কিংবা 'খেমা' (তাঁবু) অর্থে এটি ব্যবহৃত হতো। তুর্কীদের সঙ্গেই শব্দটি ভারতে প্রবেশ করে এবং গোড়ার দিকে খেমা বা সৈন্য শিবির অর্থেই এটির ব্যবহার বজায় ছিল। শাহজাহান দিল্লিতে যে লালকেল্লাটি গঠন করেন, সেটিও ছিল একটি উর্দু বা শাহী শিবিরই; কিন্তু যথেষ্ট বৃহদাকার হওয়ার দরুন লাল কিলাকে বলা হতো 'উর্দু', 'উর্দু-এ-মুয়ল্লা' (শ্রেষ্ঠ রাজকীয় শিবির)। তারই সংক্ষিপ্ত রূপ হলো 'উর্দু'।

এই গল্পের সঙ্গেই সাদৃশ্যযুক্ত আর একটি মজার উপগল্প প্রচলিত। উর্দু অভিধান মান্য করলে, 'উর্দু' শব্দটির অর্থ সামান্য ভিন্ন। এর অর্থ লশকর বা ছাউনির বাজার। এমন বাজার যেখানে সবধরনের জিনিশপত্র কিনতে পাওয়া যায়। যাই হোক, গল্পটি এরকম। পাঠান, তুর্কি, বেলুচি, আরবি, ইরানি, পখতুনি, মঙ্গোল প্রভৃতি সৈনিকদের নিয়ে গঠিত হতো এক-একটি মুঘল সামরিক বাহিনী। বাহিনীগুলির বেশির ভাগ শিবির বা ছাউনি পড়ত দিল্লি, মেরেঠ, ব্যারেলি, সাহারানপুর প্রভৃতি এলাকায়। এসব অঞ্চলের কথ্যভাষা ছিল খড়িবোলি হিন্দী। অবসর বিনোদনের জন্য সৈন্যরা যখন পথেঘাটে বেড়াতে বেরতো তখন তারা 'খড়ী' বুলি বলার চেষ্টায় তুর্কি, বেলুচি ইত্যাদি শব্দযোগে একটি নতুন ধরনের জারগন বা অপভাষা বা শব্দজাল তৈরি করে নিয়েছিল। বাজারকে যেহেতু 'উর্দু' বলা হয়, সুতরাং সেখানে ঐ উর্দুর (অর্থাৎ বাজারের) ভাষাকেই উর্দু বলা হতে লাগল।অতএব, দুটি গল্পেই দেখা যাচ্ছে, গোড়ার দিকে উর্দুর প্রচলন ঘটেছিল লোকের মুখে মুখে। যতদিন খড়ী ভাষায় হিন্দী আর সংস্কৃত শব্দের প্রাধান্য ছিল ততদিন এই ভাষাকে হিন্দী, হিন্দভী না রেখতা বলা হতো। কিন্তু এর ওপর আরবি-ফার্সির প্রভাব পড়তেই এটি বদলে গিয়ে 'উর্দু' হয়ে যায়। পরে সাহিত্যে ব্যবহার শুরু হলে একে ফার্সি লিপি (বিদেশি) প্রদান করা হয়। তখন থেকেই উর্দু একটি পৃথক ভাষা হিশেবে গণ্য।

অন্যদিকে, প্রখ্যাত উর্দু লেখক মুহম্মদ হুসেন আজাদ উর্দুর উৎপত্তি ব্রজভাষা থেকে, এমত দাবি করেন। অবশ্য, এ বিতণ্ডা আমাদের মূল আলোচনায় দুর্যোগ ঘটাতে পারে, সুতরাং নীরব থাকছি। মোটা অর্থে বলতে পারি, উর্দু হলো হিন্দী ভাষার তেমন একটি রূপ যাতে আরবি, ফার্সি, তুর্কি ইত্যাদি শব্দের প্রাচুর্য এবং যা লেখা হয় ফার্সি লিপিতে। বর্তমান কালে ভারতে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বিষ মানুষের মনকে কলুষিত করেছে, ফলে, এখন অনেকেই মনে করেন হিন্দুদের ভাষা হিন্দী আর মুসলমানেদের ভাষা উর্দু। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৮০ সালে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ড. জগন্নাথ মিশ্র রাজ্যের বহু মানুষের মুখ চেয়ে দ্বিতীয় রাজ্যভাষা হিশেবে উর্দুকে অভিষিক্ত করতে 'উর্দু অধ্যাদেশ' জারি করলে রাজ্যব্যাপী হিন্দুরা চরম উত্তাল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বলা বাহুল্য, ধারণাটি সর্বাংশে ভ্রান্ত। উর্দুর ওপর মুসলমান ও হিন্দুদের সমান অধিকার। এখনও পাঞ্জাবের বেশির ভাগ লোক কথ্য ভাষায় উর্দু ব্যবহার করে। জায়সী, রসখান, রহীম প্রমুখ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ফার্সি ছাড়াও ব্রজভাষার (অওধি ভাষা) কবি ছিলেন। খুসরোকে তো হিন্দী ভাষার প্রথম শ্রণীর কবিদের মধ্যে অন্যতাম মনে করা হয়। তাছাড়া, বলা বাহুল্য, উর্দু গজল কেবলমাত্র মুসলিম কবিরাই রচনা করেননি, অনেক আগে থেকেই বেশ কিছু হিন্দু, বিশেষত কায়স্থ বর্ণের হিন্দু কবি এ ক্ষেত্রে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। উল্লখযোগ্য হলেন মুনশি হর করণ, চন্দর ভান ব্রাহ্মণ, মুনশি মাধব রাম, মুনশি লালচন্দ এবং মুনশি উদয়রাজ। এঁদের মধ্যে প্রথম উর্দু গজল লিখেছিলেন চন্দর ভান ব্রাহ্মণ (১৫৭৪-১৬২০)। স্মর্তব্য যে, উর্দুকে মধ্যাকালীন 'রিয়াসতী' মানসিকতার কবল থেকে বের করে আনেন স্বয়ং মুনশি প্রেমচন্দ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে হিন্দীর মতো উর্দুও কোনো বিশেষ ধর্ম বা জাতির নিজস্ব সম্পদ নয়। প্রেমচন্দ, কৃশন চন্দর, রাজেন্দ্র সিং বেদী, প্রকাশ পণ্ডিত, ফিরাক গোরখপুরী, রামপ্রসাদ বিসমিল, পণ্ডিত রতনসার সরসার, অমৃতা প্রীতম—এঁরা প্রত্যেকে হিন্দু হয়েও উর্দুতেই বেশি লিখেছেন। উলটো দিকে ড. মলিক মোহম্মদ, রাহী মাসুম রজা, সহয়াত সুলাহী প্রমুখেরা হিন্দীতে এবং নজরুল বাংলায় যুগন্ধর সাহিত্যিক রূপে চিরবরেণ্য।

যে-কথা আগেও বলেছি, উর্দু নামকরণের আগে, এবং পরেও, এই ভাষা স্থানবৈভিন্ন্যে নানান উপনামে চিহ্নিত ছিল। হিন্দী আর উর্দুর সংমিশ্রণ ঘটেছিল যেসব জায়গায় সেখানে এটি হিন্দুয়ী, হিঁদয়ী, হিন্দভী, জবান-এ-হিন্দ, জবান-এ-হিন্দুস্তান, হিন্দুস্তানী বোলি রেখতা ও হিন্দী নামে পরিচিত ছিল, যা পরবর্তীতে দক্ষিণ ভারতে চিহ্নিত হয় জবান-এ-গুজারি, এবং দিল্লিতে জবান-এ-দেহলভী, তথা সমগ্র দিল্লি পরিমণ্ডলে সরাসরি উর্দু নামেই ছিল পরিজ্ঞাত। বস্তুত উর্দু একটি ইন্দো-আর্য ভাষা যার উৎসমূলে রয়েছে দিল্লির জনবুলি বা ডায়ালেক্ট পশ্চিমা হিন্দী। ঐ হিন্দী-উর্দু আবার খড়ীবোলি নামেও সমধিক খ্যাত। সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, ভাষার রয়েছে দুটি স্রোতধারা। প্রথমটি প্লুরোসেন্ট্রিক বা পলিসেন্ট্রিক, যা আসলে একাধিক ভাষার

সংমিশ্রণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ চাইনিজ, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, জারমান, কোরিয়ান, স্প্যানিশ এবং তামিল। দ্বিতীয়টি মোনোসেন্ট্রিক ল্যাঙ্গুয়েজ, যার দৃষ্টান্তে স্থান পায় জাপানিজ ও রাশিয়ান ভাষা। হিন্দুস্তানিও বস্তুত দুটি স্ট্যান্ডার্ড ভাষা পদ্ধতি, আধুনিক মান্য হিন্দী এবং আধুনিক মান্য উর্দুর সংমিশ্রণে গঠিত একটি প্লুরোসেন্ট্রিক বা পলিসেন্ট্রিক ল্যাঙ্গুয়েজ।

যাই হোক, গোড়ার দিকে যাঁরা গজলকে উন্নীত হতে মদত যোগান তাঁরা কিন্তু প্রায় সকলেই ছিলেন দাক্ষিণাত্যের, অর্থাৎ দখিনি ভাষার কবি। যেমন হায়দরাবাদের কুতুব বংশের খ্যাতিমান অধীশ্বর সুলতান মহম্মদ কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১২), মৌলা ওজহী (১৭ শতকের গোড়ার দিকে), মৌলা নুসরতী, দায়েম গওয়াসি (উভয়েই ১৭ শতকের), ওয়লি মোহম্মদ ওয়লি (ওয়লি দখিনি; ১৬৬৭-১৭০৭) এবং সিরাজ অওরঙ্গাবাদী (১৭১৫-১৭৬৩)।

তিনটি লাক্ষণিক বৈশিষ্ট্য—স্থানীয় ভাষা ও শব্দ, উপমা তথা রূপকের সাজুয্য প্রয়োগ, এর দরুন দখিনি ভাষার ধরিত্রীপুত্র কবিরা কালক্রমে রাজ-অনুগ্রহ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের সুদূর দক্ষিণ ভারত অবধি বিস্তৃত হওয়াও দখিনি কবিতার জনগাহ্যতার আর একটি বড় কারণ। ওয়লি মোহম্মদ ওয়লি ওরফে ওয়লি দখিনি, যিনি ওয়লি গুজরাতি এবং ওয়লি অওরঙ্গাবাদী নামেও সমধিক খ্যাত, জন্মসূত্রে ছিলেন মহারাষ্ট্রের অওরঙ্গাবাদ নিবাসী। তিনি ছিলেন উর্দুর ধ্রুপদী ঘরানার কবি এবং তাঁকে বলা হয়েছে 'ফাদার অফ উর্দু পোয়েট্রি'। ওয়লির আগে অবধি দক্ষিণ এশিয়ায় উর্দু কবিতা এবং গজল লেখা হতো এবং তাতে সাদদি, জামী তথা রুক্কানি প্রমুখ ফার্সি পণ্ডিতদের ধরন-ধারণ ও শৈলীর অনুসৃতি ও পুনরাবৃত্তি এক ধরনের একঘেয়েমি এনে দিয়েছিল। ওয়লিই সেখানে প্রথম আনলেন বদল। তাঁর কবিতা দখিনির লাক্ষণিক আভায় আলোকিত। ওয়লি কেবল একটি বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাষাই ব্যবহার করেননি, উপরন্তু তাঁর কবিতায় ভারতীয় বিষয়, প্রতিমা এবং চিত্রকল্পের সমন্বিত ও সফল প্রয়োগ পরিলক্ষিত। ওয়লি ঘন-ঘন দিল্লি থেকে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ থেকে দিল্লি পাড়ি জমাতেন। দিল্লিতে বসবাসকালে তিনি দিল্লি বলয়ের কবিদের মজলিশে সেগুলি পাঠ করে শোনাতেন এবং দিল্লির কবিরা বিমুগ্ধ চিত্তে সেই শৈলী নিজেদের কবিতায় প্রয়োগ করার চেষ্টা করতেন। এভাবে দিল্লির উর্দু ভাষা ও কাব্যসাহিত্যে ওয়লির পরোক্ষ অবদান সংযোজিত হয়েছিল। ওয়লির কাব্যগ্রন্থ 'দিওয়ান' সেসময় দিল্লি বৃত্তে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং সমকালীন ফার্সি কবিরা তাঁর মতো করে কবিতা সৃষ্টির অনুশীলন আরম্ভ করেন। ওয়লি মোহম্মদ ওয়লির হাত ধরেই উর্দু গজলের সূচনা। যদি বলি ওয়লি অগ্রগামীর ভূমিকা পালন করেছিলেন বলেই পরবর্তীতে জৌক, সওদা তথা মীরের মতো শক্তিশালী কবির উদ্ভব সম্ভবপর হয়েছিল, তৃণমাত্র অতিরঞ্জন হবে না।

দিল্লির একগুচ্ছ কবি যাঁরা তদ্দণ্ডে আমির খুসরোর ধারা অনুসরণ করে সমকালে চিহ্নিত 'সবকে-হিন্দী' (অর্থাৎ ইন্ডয়ানাইজড ফার্সি) ভাষাতেই তাঁদের সিসৃক্ষা জারি রেখেছিলেন; ওয়লি মোহম্মদ ওয়লি তাঁদের খালিস উর্দুতে টেনে আনেন, যদিও তখন পর্যন্ত সেটি মূলত দখিনি নামেই পরিজ্ঞাত ছিল। অতঃপর গজলের এক নতুন উত্তরণ-পর্বের সূচনা ঘটে নর্দান প্লেনের, অর্থাৎ উত্তর সমভূমির কবিদের প্রযত্নে। অর্থাৎ দেহলভী এবং লখনভী ভাষার মাধ্যমে। এভাবে আমির খুসরো, যিনি গজলের ভ্রূণ সৃষ্টি করে তাকে হিন্দভী ভাষার গর্ভে লালন করেছিলেন, তাঁর সেই হিন্দভী ভাষাপ্রযুক্তি বিলুপ্ত হতে সময় লাগল সুদীর্ঘ তিনটি শতাব্দী। এরই সঙ্গে গজলের প্রথম যুগটির পরিসমাপ্তি ঘটল ঠিকই, কিন্তু ঐ ভস্মস্তূপ থেকেই ঘটল গজলের জীবনের অপেক্ষাকটত বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর-একটি অধ্যায়ের সূচনা। এই নতুন যুগের ভগীরথ দিল্লির স্বনামধন্য শায়র মির্জা মুহম্মদ রফি 'সওদা' (১৭১৩-১৭৮১), যিনি মূলত গজল ও কাশিদার জন্য প্রসিদ্ধি হাসিল করলেও মসনভী, মর্সিয়া, তর্জীহবন্দ, মুখম্মস, রুবাই, হিজো এবং কাতাতেও অনুরূপ পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু দিল্লি হয়ে উঠেছিল আজমাদ শাহ আবদালি এবং নাদির শাহর খুনি উল্লাসমঞ্চ। একাধারে আক্রমণ, লুণ্ঠন ও দাওয়াত যুদ্ধের নিরবচ্ছিন্ন নামতা। এর ফলে দিল্লি বৃত্তের বেশির ভাস কবি সেখান থেকে সরে এসে শরণ

নিয়েছিলেন অওধ দরবারে, অর্থাৎ লখনউয়ে। স্বভাবতই, তাঁদের সৃজনশীলতায় দেহলভীর ছাল খসে লখনভীর নির্যাস চুইতে শুরু করেছিল।

এর প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মীর মুজম্মদ তকী মীর (১৭২৩-১৮১০), যিনি একাধারে দিল্লি আর লখনউয়ের সর্বাগ্রগণ্য শায়র হিশেবে পরিগণিত ছিলেন। জন্মেছিলেন আগ্রায়, উদিত ও প্রদীপ্ত হয়েছিলেন দিল্লিতে, কিন্তু আবদালির দিল্লি আক্রমণের পর চলে আসেন লখনউ এবং আসাফ-উদ-দৌলার দরবারেই কাটিয়ে দেন বাকিটা জীবন, এমনকি অন্তশয্যাও গ্রহণ করেন লখনউয়ে। খাজা মীর দর্দ (১৭২০-১৭৮৫) ছিলেন নকশবাদী-মুজাদ্দাদি সুফি সন্ত। জন্ম দিল্লিতে। তিনি নিজস্ব শায়রানা ও সুফিয়ানা প্রতিভা রক্তসূত্রে পিতা ফার্সির গণ্যমান্য কবি খাজা মুহম্মদ নাসিরের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এবং, যে-কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, দিল্লি সেসময় আবদালি আর মারাঠাদের হামলায় ছারখার হয়ে গেছিল ঠিকই, এবং মীর ও সওদার মতো বড় মাপের কবিরা দিল্লি থেকে সরে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন লখনউয়ে; কিন্তু খাজা মীর দর্দ কখনও দিল্লি পরিত্যাগ করেননি। প্রসঙ্গত এও উল্লেখ থাক, মীর, সওদা এবং দর্দ না জন্মালে উর্দু অথবা উর্দু শায়রীর দুনিয়া এতখানি বিসারিত হতে পারত না। ভালো কথা। সারস্বত ক্ষেত্রে 'উর্দু' নামটিকে কয়েনড বা মুদ্রিত করেছিলেন গুলাম হামদানি মাসহাফি (১৭৫১-১৮৪৪)। তৎপূর্বে উর্দু পরিজ্ঞাত ছিল 'জবান-এ-উর্দু' নামে, যেটি সাধারণভাবে হিন্দুস্তানি, হিন্দভী, হিন্দী, দখিনি বা রেখতা নামেই চালু ছিল এবং যার সম্মিলিত ডাকনাম ছিল লশকরি জবান, অথবা নিছক 'লশকরি'। সমকালে আরও দুই মহীরূহ সদৃশ শায়রের অবদানও আমরা বিস্মৃত হতে পারি না—মোমিন আর গালিব, যাঁদের পুণ্যস্পর্শে ইতিহাসের দরবারে উর্দুর তাজপোশি সমাধা হয়েছিল। দুজনেই ছিলেন দিল্লির কবি। মোমিন খান মোমিন (১৮০০-১৮৫১) পেশায় ছিলেন হাকিম, কিন্তু তাঁর মননবিশ্বটি দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিকতার। জন্মসূত্রে ছিলেন কাশ্মিরী। বংশগত পেশা ছিল উনানি চিকিৎসা। মোমিন পরবর্তী জীবনে শায়র হিশেবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি কবিতায় ফার্সি শৈলী এবং তখল্লুসের সাজুয্য প্রয়োগের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। মির্জা অসদউল্লাহ বেগ খান (১৭৯৭-১৮৬৯) মূলত তাঁর ছদ্মনাম 'গালিব' এবং 'অসদ' নামেই সবিশেষ বিখ্যাত। মির্জা গালিবের জন্ম তৎকালীন অকবরাবাদ বা আধুনিক আগ্রায়। কিন্তু তাঁর কবিপ্রতিভার সমগ্র বিচ্ছুরণ ঘটে দিল্লিতে। ফার্সি ও তুর্কি ভাষায় সুদক্ষ হলেও তাঁর সৃষ্টিকর্ম সবই উর্দুতে। মাত্র এগারো বছর বয়সেই গালিবের কাব্যযাত্রার সূচনা ঘটেছিল এবং তেরো বছর বয়স থেকে তিনি দিল্লিতে বসবাস শুরু করে নিহস্ব কাব্যপ্রতিভা আদিগন্ত বিস্তৃত করেন। তিনি ছিলেন মুঘল দরবারে সর্বোৎকৃষ্ট কবি। গজল, কাশিদা, রুবাই, কিতা এবং মার্সিয়ায় ছিলেন সমান সিদ্ধহস্ত। অধিকন্তু, উর্দু শায়রী ও গজলের দুনিয়ায় মীরের পর গালিবই সেই অভ্রংলিহ চূড়া যা থেকে বিগলিত হয়েছে শত-শতকের উপজীব্য অমৃত রসের নিরবচ্ছিন্ন সুধা, যার সেবনে কেবলমাত্র পাঠক ও শ্রোতার মনের তৃষ্ঞাই নিবৃত হয় না, ভাষারও বাচ্চাদানি উপর্যুপরি স্ফীত হয়।

গালিব ছিলেন বেপরিমাপ মদিরাসক্ত, প্রডিগাল এবং তথালথিত কাফির বা নাস্তিক। তদ্দণ্ডে তাঁর সমীপকালীন মৌলানা আলতাফ হুসেন হালি (১৮৩৭-১৯১৪) ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর আর-এক প্রখ্যাত শায়র। জন্ম উত্তর-পশ্চিমা প্রান্ত বা আধুনিক হরিয়ানার ঐতিহাসিক শহর পানিপতে, এবং প্রয়াণও সেখানেই। বাল্যবয়সেই পিতা-মাতার মৃত্যুর দরুন পড়াশোনার গুটি অচিরেই কেঁচে যায়। কিন্তু ধর্মের প্রতি পরম নিষ্ঠাবান, পাক্কা মুসলমান এবং পাখণ্ডীদের কড়া সমালোচক। তবুও তিনি ঐ কাফের গালিবের প্রতি ছিলেন একান্ত সশ্রদ্ধচিত্ত। 'য়্যাদগার-এ-গালিব' নামে গালিবের জীবনীও লিখেছিলেন। যদিও তিনি তাঁর 'মকদাম-এ-শায়রী'র জন্যই সমধিক বিখ্যাত। নবজাগরণের অগ্রনায়ক এবং ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন হালি, এবং পরবর্তী কালে, ১৮৬০ থেকে তিনি আমৃত্যু সক্রিয় থেকেছেন শের-ও-শায়রীর দুনিয়ায়। সমীপকালীন উর্দু সাহিত্যের প্রচল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন তাঁর সাহিত্য, কিন্তু পাঠকের কাছে তাঁর গজল, নজম, রুবাই এবং মার্সিয়ার সমাদর কম ছিল না। উপরন্তু বিশ শতকের গোড়ার দিকে হালির সুযোগ্য নেতৃত্বেই উর্দু গজলের সমুচিত উন্নতি ঘটেছিল। গজলের উন্নয়ন প্রকল্পে অবশ্য সমকালীন শেখ

মুহম্মদ ইব্রাহিম জৌকের (১৭৯০-১৮৫৪) অবদানও কম নয়। তিনিও গালিবের সমকক্ষ এক প্রকাণ্ড দরবারি কবি। মুঘল দরবারে বিশিষ্ট কবি হিশেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন মাত্র উনিশ বছর বয়সেই। জৌকের আর-এক পরিচয়, তিনি ছিলেন আখেরি মুঘল বাদশাহ বাহাদুর শাহ জফরের (১৭৭৫-১৮৬২) উস্তাদ বা গুরু। জৌকের জন্ম দিল্লিতে। কাব্যক্ষেত্রে তাঁর মূল বিষয় ছিল প্রেম। জৌকের গজল আজও সমাদরে গ্রহণ করে থাকেন পাঠসমগুলী। পর্যায়ক্রমে দাগ দেহলভী (১৮৩১-১৯০৫) নামটিও উচ্চার্য। পুরো নাম নবাব মির্জা খান দাগ দেহলভী। জন্ম পুরানী দিল্লির চাঁদনি চৌকে। পিতা নবাব সামসুদ্দীন আহমদ খান ছিলেন যুগপৎ লোহারু এবং ঠিরোজপুর ঝিরকার শাসক এবং মাতা ওয়াজির খানুম দিল্লিবাসী এক জহুরির কন্যা। দাগের বয়স যখন সবে চার, এবং মায়ের চৌঁত্রিশ, গভর্নরের এজেন্ট উইলিয়াম ফ্রেজারের হত্যা-ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার দরুন সামসুদ্দীনের ফাঁসি হয়। অতঃপর দিল্লির শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের ওয়ারিস মুঘল ক্রাউন প্রিন্স মির্জা মুহম্মদ ফাকরুর সঙ্গে মায়ের নিকাহ্ হলে দাগেরও সৌভাগ্যের তোরণ বারদিগর খুলে যায়। দিল্লির লাল কেল্লা থেকে তিনি উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন এবং পাশাপাশী শের ও শায়রীর দুনিয়াতেও তাঁর আসন পাকা হয়ে যায়। পুরানী দিল্লিই ছিল দাগের সৃষ্টিপরিসর, যদিও তিনি হায়দরাবাদেও জীবনের শেষ অংশটি বাহিত করেন। মৃত্যুও ঘটে হায়দরাবাদে। গজল, কাশিদা, মুখম্মসের দরুন যশস্বী হয়েছিলেন। 'গুলজার-এ-দাগ' এবং 'দিওয়ান-এ-দাগ' বইদুটির জন্য তিনি আজও স্মর্তব্য। রোমান্টিক ও সেনসুয়াস লেখনীতে দাগের জুড়ি ছিল না। আচ্ছা, বাহাদুর শাহর বারম্বার জিগির যখন এলো, জাফরের গজল নিয়ে খাস কথাও রয়েছে। সেটা পরে বলা হবে।

অবশেষে এলো বিংশ শতক। উনিশ শতকী বিশ্বাসের কেল্লা চুরমার হলো বিশ শতকী বাস্তবানুভূতিতে। প্লাটোনিক প্রেম আর ভাবালুতার জোলো মনোভূমি নিমেষে বদলে গেল ধূ ধূ মরুস্থলে। স্বপ্ন ও কল্পনার গজদন্তমিনার ভেঙে গেছে, পড়ে আছে নিছক স্মৃতির চুনসুরকি। বস্তুত, বিদায়মান উনিশ শতকী প্রাণনে ফুটেছিল ব্যক্তিত্ব বিকাশ, যা চূর্ণ হলো বিশ শতকী রাষ্ট্রিক অখণ্ডতায়। মধ্যবিত্ত ও বিধ্বস্ত কবি-শায়রদের মনেও তীব্র উচাটন ও অস্থিরতা। তাঁরা পড়লেন মহা ফাঁপরে, প্রশ্নের বেষ্টনে। পরাধীনতা, বঞ্চনা ও নির্যাতনের বোঝ অসহ্য হয়ে উঠছে। জাগছে চেতনার দিগ্বাহী চোরাস্রোত। প্রসুপ্ত আক্রোশ ও দ্রোহ দাবাগ্নির মতো ধিকিয়ে ধিকিয়ে ফুঁসে উঠছে কেবল। দিকে দিকে লৌহকপাট ভাঙার আকুলতা ও গণজাগরণের জোয়ার। এবার তাঁদের, কবি-শায়ীদের পালা। গজল লিখিয়েদের মধ্যে, যাঁরা ছিলেন অগ্রভাগে, তাঁদের মননে ও সৃজনে দানা বাঁধল জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতার আকাঙ্খা, প্রগতিবাদ, প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ। প্রসঙ্গত এখানে নথি হতে পারে কীভাবে গজলকাররা সমকালীন বিপ্লবকামী প্রগ্রেসিভ রাইটার্স মুভমেন্টে জড়িয়ে পড়েছিলেন, যার দরুন গজলবিশ্বে তিনটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রথমটি অবশ্যই কালচারাল ল্যান্ডস্কেপে এলো নতুন জোয়ার যা ভারতীয় মিশ্রসংস্কৃতিকে আরও মজবুত হতে মদত যোগালো। দ্বিতীয়ত, উর্দু গজলের ধ্রুপদী অন্বেষনের বাতায়ন খুলে রূপক, প্রতীক এবং চিত্রকল্পে এলো নতুনতর অভিব্যক্তি। এবং, তৃতীয়ত, বিশ্বভুবনে জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে চতুরায়তনিক আবিষ্কার গজলকারদের মধ্যে গড়ে তুলল নিও-ক্লাসিসিস্ট, প্রগ্রেসিভ, মডার্নিস্ট এবং পোস্ট-মডার্নিস্টদের এক অফুরন্ত কাতার।

প্রসঙ্গত এখানে আমি স্যার সৈয়দ আহমদ খানের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করব, বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালেই যিনি বলেছিলেন, 'হিন্দুজ অ্যান্ড মুসলিমস আর টু আইজ অফ দ্য বিউটিফুল ব্রাইড দ্যাট ইজ হিন্দুস্তান।' এই সজাগ ও বেবাক উচ্চারণ বিশ শতকের। কিন্তু সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) ছিলেন উনিশ শতকের প্রখ্যাত ইস্লামিক প্র্যাগমাটিস্ট, ধর্মসংস্কারক, দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ। ইনিই আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। রাজনৈতিক মঞ্চে খান সাহেব ছিলেন সেসময়কার সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা। প্রকৃত ইসলাম ও মুসলিম দরদী হয়েও যে তিনি হিন্দু-মুসলিম ভ্রাতৃত্বের পক্ষপাতি ছিলেন, তা ছিল তাঁর আস্থা ও বিচক্ষণতার

পরিচায়ক। উর্দু গজল লিখিয়েদের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের আকাঙ্খা, কিছুটা-হলেও, তিনিই চাগিয়েছিলেন। মুসলিম ভাবের জগতে এহেন মস্ত মাপের মনবদল কিংবা বাঁকবদল ইতিপূর্বে দেখা যায়নি।

এতদসত্বেও, যখনই আমরা 'উর্দু গজল' শব্দ দুটি একত্রে উচ্চারণ করি, আমাদের মনে আরও কিছু শব্দের হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়—কমনীয়তা, মননশীলতা, এক সংগুপ্ত বা পুশিদা রহস্যের অনুভূতি, ভাবনার ঘনত্ব, কাঠামোগত বা স্বরলিপির বাঁধন ও অভিপ্রায়, আবিষ্ট কল্পনা, সহজাত সুরময়তা, এবং অর্থের প্রোচ্ছ সৌন্দর্য। গজলের দুই পংক্তিবিশিষ্ট প্রতিটি শের পাঠকের মনে এক-একটি কাল্পনিক ছবি এঁকে চলে, যা মূলত প্রেম,—আস্তিত্বিক ও সর্বজনীন, উভয়ত। গজলের দুনিয়া কল্পনা আর রূপকের খড়কাঠি দিয়েই গড়া। সিংহভাগ উর্দু শায়রের গজলে এই মূলগত বৈশিষ্ট অবশ্য বিশ শতকেও অক্ষুণ্ণ থেকেছে। কেননা, এই বৈশিষ্ট্যই তার প্রাণশক্তি।

গজল, যার সূচনা আরবে, এবং যেটি লালিত হয় ফার্সি ভাষার ক্রোড়ে, পাশাপাশি পশতু বেলুচি ইত্যাদি ভাষা সমূহেও এর রেওয়াজ চলে আসছিল। কিন্তু এর পূর্ণ বিকাশ ঘটল ভারতে এসে। ভারতীয় সাহিত্য ও সংগীতে পারস্য প্রভাব সংক্রমিত হওয়ার পরেই ভারতীয় মিশ্রসংস্কৃতির প্রযত্নে গজলের তাজপোশি সাঙ্গ হয়। গজল খুবই ত্বরান্বিত চালে উর্দুর সহায়ক পাঞ্জাবি, সিন্ধি, সরাইকি এবং বেলুচি সহ পার্শ্ববর্তী কাশ্মিরী প্রভৃতি ভাষাতেও আপ্যায়ন পেতে শুরু করে। ক্রমে ক্রমে গজল বাংলা, গুজরাতি, মারাঠি, ওড়িয়া, তেলুগু তথা কন্নড় ভাষাতেও নিজস্ব গাদি হাসিল করে। পাঞ্জাবি ভাষায় গজলের প্রবর্তক শাহ মুরাদ এবং মৌলা বকাশ কুস্তা। বিশিষ্ট পাঞ্জাবি কবি মোহন সিং পরবর্তী কালে নিজেকে একজন সফল গজলকার হিশেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু শিবকুমার বাতালভির আগে পাঞ্জাবি গজল জনপ্রিয়তার চূড়া ছুঁতে পারেনি। পরবর্তী কালে রাজিন্দর পাল সিং ওরফে সাদা আমবলভীর মতো জনপ্রিয় কবিও গজলের দরুন সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পাঞ্জাবি ভাষায় অন্যান্য উল্লেখজনক গজলকারদের মধ্যে ইন্দ্রজিৎ হংসপুরী, ড. জগতার, ড. সুরজিৎ পটার, অজাইব চিতরকার, রণধীর সিং চাঁদ, গুরভজন গিল, তখৎ সিং, চানন গোবিন্দপুরী, দীপক জয়তোই, জশবন্ত জাফর, ত্রিলোক সিং আনন্দ, সুখবিন্দী অমৃত এবং নতুনদের মধ্যে সুরজিৎ জজ, বিবেক বিবেক, জসবিন্দর, বরজিন্দর চৌহান, কবিন্দর চাঁদ প্রমুখ উল্লেখ্য।

মারাঠি ভাষায় প্রথম গজলকার অমৃত রায়। তাঁর 'জগব্যাপকা হরীলা নাহী কসে মহণাবে' ('কীভাবে বিশ্বব্যাপী হরি না বলি') কবিতাটি ১৭২৯ সনে লেখা, এবং এটিই মারাঠি ভাষার প্রথম গজল হিশেবে স্বীকৃত। অতঃপর প্রখ্যাত কবি মোরপন্ত ওরফে মোরেশ্বর রামচন্দ্র পারদকর (১৭২৯-১৭৯৪) মারাঠির শ্রেষ্ঠ গজলকার রূপে গণ্য হন। পরবর্তী কালে মাধব জুলিয়ান ওরফে মাধব ত্রিম্বক পটবর্ধন (১৮৯৪-১৯৯৯), যিনি বম্বে ইউনিভার্সিটির মারাঠি সাহিত্যের প্রথম ডি-লিট, ফার্সি ও ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন, অসংখ্য গজল লিখেছেন। মাধবই মারাঠি গজল নিয়ে প্রথম গজল-আন্দোলন শুরু করেছিলেন, ১৯২৫-১৯৩৪ কালাবধিতে। দ্বিতীয় গজল আন্দোলন ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত চলে, যার প্রবর্তক ছিলেন সুরেশ ভাট। পরে ভট্টের অনুপ্রেরণায় তৃতীয় মারাঠি গজল আন্দোলনের সূত্রপাত ১৯৯৭ সালে, যার নেতৃত্বে ছিলেন ড. সুরেশচন্দ্র নদকরনী। এই অভিনব আন্দোলনের জেরে মারাঠি গজল আরও সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পুনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. অবিনাশ সাঙ্গেলকরের সভাপতিত্বে ১২ জানুয়ারি ২০১৭ 'মারাঠি গজল গ্লোবাল কমিউনিকেশন' নামে একটি সেমিনারও আয়োজিত হয়েছিল। মারাঠি গজলকারদের মধ্যে ডি এন গাঙ্গান, অনন্ত নান্দুকর, সন্দীপ মালভী, শ্রকৃষ্ণ রাউত, সতীশ দারাদে, ড. রাম পণ্ডিত, লক্ষ্মণ খাওয়ার, গোবিন্দ নায়েক, বিদ্যাধর ব্রহ্মে, প্রকাশ মোড়, প্রফুল্ল শাহ, জয়দীপ ভিঘেন, ড. রবিপাল ভরশঙ্কর প্রমুখের নামও উল্লেখযোগ্য।

কাশ্মিরী ভাষায় হমদম কাশ্মিরী, নসিম উল হক কাশ্মিরী, শাজিয়া বশির প্রমুখের গজল যথেষ্ট মননসমৃদ্ধ ও জনপ্রিয়। গুজরাতি গজল লিখিয়েদের মধ্যে কৈলাশ পণ্ডিত, সাইফ পালানপুরী, মেহুল, হেমং জোশী, মনহুর

উধাস, জিরো পালানপুরী, শেখাদম আবুওয়ালা, আদিল মনসুরি, রিশ মানিয়ার প্রমুখের নামযশ হাসিল হয়েছে।

বাংলায় গজল রচনার পথিকৃৎ অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪)। আইন প্র্যাকটিস সূত্রে উত্তর ভারতের লখনউ শহরে বসবাসকালে তিনি সেখানকার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে মিশে গিয়ে হিন্দুস্তানি গীতিপদ্ধতিকে রপ্ত করেছিলেন। এই সূত্রেই তিনি গজলের এই বিশিষ্ট ধারার সঙ্গে পরিচিত হন এবং বাংলায় গজলের বনেদ রচনা করেন। অতঃপর নজরুল ইসলামের হাতে বাংলা গজল বিশিষ্ট রূপ লাভ করে এবং তাঁর মাধ্যমেই বঙ্গদেশে গজল সবিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নজরুলের পরে মনিরউদ্দিন ইউসুফ বেশ কিছু গজল লিখলেও বাঙলায় এ নিয়ে আর তেমন উল্লেখজনক চর্চা হয়নি।এইচ এস শিবপ্রকাশ এবং আরও কতিপয় কন্নড় কবি গজল-লেখক হিশেবেই সমধিক পরিচিত। এছাড়া, বর্ষীয়ান ও বলিষ্ঠ কবি আগা শাহিদ আলি থেকে শুরু করে উঠতি কবি মাজ বিন বিলাল, আশিয়া জহুর প্রমুখ এই জঁরকে ইংরেজি ভাষাতেও প্রবিষ্ট করে সমৃদ্ধ করে চলেছেন। তেলুগুতে এসময় ড. গজল শ্রীনিবাসের গজল গানগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয়। নেপালি ও সিংহলি ভাষায়ও গজল লেখার প্রচেষ্টা দুর্লক্ষ্য নয়।

গজলের জাদু হিন্দী সিনেমার জগতে সেঁধ মেরেছিল শতেক বছর আগেই, ভারতীয় সিনেমার প্রায় জন্মলগ্নেই, যা ছিল একান্ত স্বাভাবিক। কেননা গজলের অভিনব ও বিস্ময়কর দুনিয়ায় রয়েছে একাধারে সৌন্দর্যের ঐন্দ্রজালিক রূপক ব্যঞ্জনা, বাস্তবতা, পরাবাস্তবতা এবং সাংগিতিক সুরময়তা। এই চতুর্বিধ লাক্ষণিক কারণেই সেকাল থেকে একাল অবধি হিন্দী ছবির জগতে গীতকার, সুরকার তথা গায়ক-গায়িকাদের কাছে গজলের সম্মানীয় আসনটি আনুপূর্ব লোভনীয় থেকেছে এবং তার ধুরন্ধর প্রয়োগের মুন্সিয়ানাও তাঁরা দেখিয়েছেন। হিন্দী ছবিতে একদিকে যেমন মির্জা গালিব, মীর তকী মীর, দাগ, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, জোশ মলিহাবাদী, ইকবাল, ফিরাক গোরখপুরী, জাঁ নিসার আখতার, কৈফ ভোপালী, সাহির লুধিয়ানভি, মজরুহ সুলতানপুরী, শাহরিয়ার, মুজতর খৈরাবাদী, কৈফি আজমী, নাসির কাজমী, শকীল বদায়ুনী, আহমদ ফরাজ, মহেন্দ্র সিং বেদী, রাজ ইলাহাবাদী, হসরত মোহানী, নিদা ফাজলী, জিগর মুরাদাবাদী, হসন কমাল, গুলজার, জাভেদ আখতার প্রমুখের মতো বলিষ্ঠ ও স্বনামধন্য শায়ররা একের পর এক অদ্ভুত সুন্দর সুন্দর গজল উপহার দিয়েছেন, তেমনি আজকের স্বল্পনামা লিরিসিস্টরাও নিজেদের পরিচিতি বৃদ্ধির জন্য পরিশ্রম করে চলেছেন। অন্যদিকে, গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে, বেগম আখতার, কমলা ঝরিয়া, কুন্দনলাল সায়গল, নূরজাহাঁ, মেহেদি হসন, উস্তাদ আমানত আলি খান, উস্তাদ নুসরৎ ফতেহ আলি খান, ফরিদা খানুম, শোভা গুরটু, মহম্মদ রফি, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, গুলাম আলি, জগজিৎ সিং, পংকজ উধাস, পিনাজ মাসানী, ভূপেন্দ্র, মুন্নি বেগম, ইকবাল বানো, আগা শাহিদ আলি, টিনা সানি, তালাৎ আজিজ এবং এমনি আরও অসংখ্য উঁচুদরের শিল্পী গোড়া থেকেই হিন্দী ছবিতে গজল গেয়ে নিজেদের এক-একটি স্বতন্ত্র আসন গড়ে তুলেছেন। এঁদের মধ্যে কারো-কারো গায়কী নিয়ে যথাস্থানে আলোচনা করব।

গজলের মুক্তি

কবিতা কী? এই অস্বস্তিকর প্রশ্নটা তুলে পাঠককে বিব্রত করার ইচ্ছে আমার নেই। কেউ দিতে পেরেছে আজ অবধি এর উত্তর? তাই ঋষিরা বলে গেছেন, কাব্য হচ্ছে ব্রহ্ম স্বাদ সহোদর অনুচ্ছিষ্ট। অর্থাৎ কারও মুখ দিয়ে এর সংজ্ঞা উচ্চারিত হয়ে এঁটো হয়ে যায়নি। কবিতা কী, এর সঠিক জবাব দিয়েছিলেন জীবনানন্দ দাশ—‘কবিতা অনেকরকম’। আমি লিখছি সেই অনেক রকমের এক রকম নিয়ে। গজল নিয়ে। গজল কী? এ প্রশ্ন আরও অস্বস্তিকর। গজল মানেই কবিতা, কিন্তু সব কবিতাই গজল নয়। তা ঠিক কী ধরনের, এক কথায় সেটা বোঝানোর চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। এক প্রেমিক তার প্রিয়তমার উদ্দেশে যা বলেছিলেন, সেই কথাটা প্রাথমিক পর্যায়ে বলা যায়—‘তোমারি উপমা প্রিয়ে তুমি এ মহিমমণ্ডলে!’

কিন্তু এতে আলোচকের দায়িত্ব ফুরিয়ে যায় না। জন্মান্ধের কাছে হাতির আকার মুলোও হতে পারে, কুলোও হতে পারে। তাই সংজ্ঞাটা আবশ্যিক। আর, সেটা নির্ধারণ করাই সম্ভবত বুদ্ধি-ক্ষমতার সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা। মোটামুটি একটা জেনাসের নির্ধারণ করা যায় বটে, কিন্তু যাকে বলে ডিফারেনশিয়া বা বৈশেষিক লক্ষণ সেটা নির্দেশ করাই এক মহা সমস্যা। এতে সাফল্যের মাত্রা যে পরিমাণে বেশি, সেই পরিমাণেই বুদ্ধির নৈয়ায়িক সামর্থ্য। অব্যাপ্তি আর অতিব্যাপ্তিকে পরিহার করতে নৈয়ায়িক বুদ্ধির প্রয়োজন আরও বেশি। অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি, এই দুই দোষের মাঝখানে সংজ্ঞাটি আলগা হয়ে ফুলে থাকে। ফলত, পুরো সংজ্ঞাটি মৃদু মোলায়েম আর পাণ্ডুবর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। তাতে বিষয়বস্তু, প্রকরণ এবং অন্যান্য সম্পৃক্ত তথ্য সম্পর্কে একটা ধারণা মেলে বটে, কিন্তু তার সামগ্রিক পরিচয় অনুপস্থিত থেকে যেতে বাধ্য। একদিকে প্রজাতির প্রত্যেক ব্যক্তিটিতে অবিরোধে প্রবিষ্ঠ হবে, অন্যদিকে জাতির সেই বিশেষ প্রজাতিটি পৃথক হবে—সেখানেই তো সংজ্ঞার সার্থকতা। পণ্ডিত প্রদত্ত গজলের পরিভাষায় বর্তমান প্রাবন্ধিকের সংশয় কিছুতেই কাটতে চায় না। গজলের সংজ্ঞা নিরূপণে ও স্বরূপ-বিচারে উর্দুর আলংকারিকের কতটুকু সফলতা পেয়েছেন তার পর্যালোচনার মাধ্যমে সেই সংশয়ের কারণ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

গজল গবেষিকা মাজদা অসদ বলেছেন, গজলের জন্ম আরবি কাশিদা থেকে।[১] গোড়ার দিকে আরব দেশে গজলকে ‘কাশিদা’ বলা হত। কাশিদা অর্থাৎ কারও শৌর্যের গুণগান করা। দাদরা গাওয়ার আগে যেমন শের পাঠ করা হয়, তেমনি কাশিদা গাওয়ার আগে কড়ি বাঁধার রীতি ছিল। মাজদা একেই গজল আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আজকের দিনে কাশিদা আর গজলে তফাত বিস্তর। কাশিদা হল এক ধরনের বর্ণনামূলক ক্ষুদ্র কবিতা, আর গজল একটি বিশেষ ছন্দের নাম।

প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ অনিল বিশ্বাস একসময় গজল নিয়ে খুব সিরিয়াস কাজ করেছিলেন। তাঁর কাছে ঐসময় গজলের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে জানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন তা-ও মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। অনিলবাবুর মতে, গজল শব্দটির ব্যুৎপত্তি আরব দেশে।আরবি অভিধানগত এর অর্থ ‘অলংকরণ’। এ-কথা অনস্বীকার্য যে গজলের একটি লক্ষণ হল অলম করা।ভাব বা বিষয়ের অলংকার (যথেষ্টীকরণ) গজলের একটি শর্ত। কিন্তু সেটাই সব নয়।

গজলকার পশুপতিনাথ ব্যাকুলের মতে গজল ফারসি শব্দ।[২] ব্যাকুলজি সম্ভবত ‘গজালা’ শব্দের সঙ্গে গজলকে গুলিয়ে ফেলেছেন। ফারসি গজালা শব্দের অর্থ মৃগনয়নী বা মৃগশাবক। জনাব মহম্মদ মুস্তফা খাঁ উর্দু-হিন্দী অভিধানে গজলের প্রতিশব্দ দিয়েছেন, ‘বাজনান গুফতগু করদ্যান’। অর্থাৎ নারীর সঙ্গে কথা বলা। সংজ্ঞাটি বেশ বিভ্রান্তিকর। কেননা, নারী—যাকে পরিভাষায় প্রধান উপাদান ধরা হয়েছে—সে কোন জাতীয়া, তা বলা হয়নি। বাংলা আর হিন্দীতে ‘নারী’ ও ‘স্ত্রী’ সাধারণ শব্দ।সমস্ত স্ত্রীজাতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। হিন্দীতে

স্ত্রীজাতির নারী, মহিলা, ঔরত, রমণী, বধূ, ললনা, অঙ্গনা, কামিনী, ঘোষিৎ, অবলা, বনিতা ইত্যাদি নানা প্রতিশব্দ রয়েছে। এগুলির মধ্যে কোন শ্রেণীর নারীর সঙ্গে কথা বলা গজলের বৈশিষ্ট্য, তার ইঙ্গিত এই সংজ্ঞায় অনুপস্থিত। কথা বলার বিষয়টাই বা কী, তারও কোনো উল্লেখ নেই। যদি ধরে নিই বিষয়ের কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নেই, তবে এটাও মেনে নিতে হবে যে গজলে কোনো নিরন্তর বা পৌনঃপুনিক চিন্তনপ্রক্রিয়ও নেই।

গজলের ফারসি সংজ্ঞা হল, 'সুখন অজ জনান (বা অজমাশুক) গুফতন'—অর্থাৎ সুন্দরী রমণী সম্পর্কে কথা বলা। পক্ষান্তরে, আশিক (প্রেমিক) ও মাশুকের (প্রেমিকা) প্রেমালাপকেই গজল বলা হয়। প্রেমালাপের ভিত্তি শুধু ইশক হকীকী নয়, ইশক মত্যজিও বটে।অর্থাৎ গজলের দুটি ঘর—একটি মিলনের, অন্যটি বিরহের। মাঝখানে পর্দা টাঙানো, সামান্য বাতাসেই দুলে দুলে ওঠে—একবার এ-ঘর একবার ও-ঘর।

ওপরের সংজ্ঞাগুলির কোনোটিতেই ছন্দের কথা উল্লেখ করা হয়নি। অথচ গজল একটি ছন্দ-বিশেষ। দ্বিতীয়ত, এইসব সংজ্ঞায় পারিভাষিকদের ব্যক্তিগত অনুভূতিই প্রাধান্য পেয়েছে। সর্বোপরি প্রশ্ন জাগে, ফারসি থেকে আরম্ভ করে উর্দু এবং আজ হিন্দী, মারাঠি, সিন্ধী, পাঞ্জাবি, গুজরাটি, বাংলা প্রভৃতি ভাষার সিঁড়ি বেয়ে গজল যেখানে উঠে এসেছে, সেখানে দাঁড়িয়ে বিচার করলে এইসব ব্যাখ্যা বাতিল হয়ে যায় না কি? সংজ্ঞাগুলি দেখে মনে হয়, গজল মানেই রোমান্টিকতা, প্রণয়।গজল মানেই সুরা, আঙুরফল, খর্জুরবীথি, শিরিণচাঁদ ইত্যাদি। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেই এইসব সংজ্ঞা ভ্রান্ত বলে গণ্য হওয়া উচিত ছিল। কেননা সেই সময় যখন উর্দু শায়রীর গা থেকে শবাব-শরাব সাকী-জাম গুলো-গুলিস্তাঁ আর বুলবুলি-বিলাসের আঁশ ছাড়েনি, তখনও ফয়েজ মোহিউদ্দীন লুধিয়ানাভি হালি ইকবালের দল এক-একটি বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন রক্তমাখা গজলের জন্ম দিতে—যাতে জেগে উঠেছে মধ্যবিত্ত সমাজ, ঘোষিত হয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ, উচ্চারিত হয়েছে প্রতিকারের দাবি।

তাই বলছিলাম, গজলের সামগ্রিক পরিচয় এইসব সংজ্ঞায় অনুপস্থিত। প্রকৃত সংজ্ঞাটি খাড়া করার দায়িত্ব আমাদের। তা খাড়া করা তখনই সম্ভব হতে পারে, যখন আমরা গজলকে বুঝব, যখন জানব তার স্বরূপকে। শিল্প বিচারে কোনো পূর্বকল্পিত ধারণা সংস্কারমাত্র, যা সত্য-সন্ধানের অন্তরায়। সংজ্ঞা-নির্ধারণেও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

কাব্যের সামান্য ধর্ম মাইমেসিস বা অনুকরণ। প্রাক-অ্যারিস্টটলীয় যুগ থেকে অদ্যাবধি সারস্বত মহলে এ ধারণা অনড়। অনুকরণই কবির আর্ট ইমপালস। প্রশ্ন ওঠে, মহাকাব্য, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি জীবনের অনুকরণ হতে পারে। কিন্তু কবি যেখানে নিজের কথা বলেন সেক্ষেত্রে অনুকরণ কোথায়? জবাবে প্লেটোর মন্তব্য ধার করে বলা যায়, কবিতার উপকরণ জীবনের রূপ—ব্যক্তিচরিত্র, হৃদয়াবেগ ও ঘটনা।হৃদয়াবেগ কবির মাধ্যমে ব্যক্ত হলে তা অনুকরণ। কেন-না তাতে বিশেষ ভাবের একটা পরাদর্শক বা অ্যাকচুয়াল ফর্মে গড়া আঙ্গিকের অনুকৃতিই ব্যক্ত হয়। এই অর্থে গজলও কবিতা এবং তা অনুকরণ-বিশেষ। শাশ্বত সত্যেরই প্রকাশ। বাইরে থেকে যা 'সৃষ্টি' মনে হয়, ভেতরের দিক থেকে তা ইমিটেশন রূপ-রচনা।

গজল কবিমনের উপলব্ধির প্রকাশ। এর ছন্দ মূলত সুরের মুখাপেক্ষী। গানে রূপায়িত হয়েও তা অনন্য। বিষয়ের ক্ষেত্রে স্টাইলের দিক থেকেও সংগীত জগতে গজল একক ও নিঃসঙ্গ। এর প্রধান কারণ, গজলের স্রষ্টা এক মস্ত অনুকরণকারী জীব। মনস্তত্ত্বের দিক থেকেও গজল সৃষ্টির মূলে দুটি কারণ—অনুকরণ বৃত্তি ও সংগতিবোধ। তা মানবজীবনের সাধারণ বা ইউনিভারসাল সত্যকে ব্যক্ত করে। কলাকৈবল্যবাদীদের মতে, গজলের মূল লক্ষ্য আনন্দ-সৃষ্টি। কবিতা মাত্রেই, অ্যারিস্টটল অনুসরণে বলা যায়, মানুষের সর্বজনীন রূপটির প্রকাশ। তা জীবনকে আদর্শায়িত করে। আদর্শায়িত বা আইডিয়ালাইজ কথাটা দ্ব্যর্থক। প্রথমত, কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে তার চিরন্তন ও স্বরূপ ধর্মে প্রকাশ করা এবং দ্বিতীয়ত, লৌকিক সাদৃশ্য অক্ষুণ্ণ রেখে অনুরঞ্জনী মমতায় ভাবকে সৌন্দর্যায়িত করা তথা যুগপৎ উজ্জ্বল ও চিত্তাকর্ষক করে তোলা।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে গজলের লক্ষণ নির্ধারণে মনীষীরা বহুধা বিভক্ত। নানা মতবাদ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। বলা বাহুল্য, পারস্পরিক সাদৃশ্য এগুলির মধ্যে নেই। কিন্তু দুটি সিদ্ধান্তে সবাই একমত। প্রথমত, গজল সৃষ্টি হচ্ছে অনুভব, কল্পনা আর বুদ্ধির সমন্বয়ে এক যৌগিক মানসিক বৃত্তি। দ্বিতীয়ত, তা হল রস-রূপ-ভাবনার সমবায়—জীবন ও জগতের রস-রূপের অভিব্যক্তি। এ থেকে আমরা গজলের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রচয়িতার মনোভঙ্গি সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারি। এই মনোভঙ্গিকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায়, 'বিশেষ পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজনের চেষ্টা'। এতে ফুটে ওঠে গজলকারের সামাজিক বাসনা, কামনা তথা অভিযোজনের রূপটি।

তাবৎ শিল্পসৃষ্টির মূলে একটি প্রেরণা কাজ করে। সামাজিক প্রাণী হিশেবে গজল-স্রষ্টার মনে যে বাসনাই থাকুক, 'গজলকার' পদবাচ্য হন তখনই যখন তাঁর মধ্যে প্রকাশের আবেগ জাগে। আত্মোপলব্ধিকে বাইরে প্রকাশ করার ব্যাকুলতাই সৃজন প্রক্রিয়া। প্রকাশ-বিষয়কে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলাতেই গজলের সার্থকতা। আধুনিক গজলকারেরা প্রেরণা বলতে বোঝেন পরিশ্রমকে। এঁদের সার্থকতা পারিশ্রমিকে।

উদ্দেশ্য ও প্রেরণার মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট ভেদরেখা টানা সম্ভব নয়। এ দুটির তাৎপর্য অনেকের কাছেই এক ও অভিন্ন। কিন্তু কাব্যতত্ত্বে এদের সংজ্ঞা ভিন্ন ভিন্ন। কাজ করবার জন্যে কর্তার মধ্যে যে একটা চাপ অনুভূত হয়, সেটা প্রেরণা বা ইমপালস।আর উদ্দেশ্য বা পারপাস হল কর্তা ক্রিয়ার মাধুর্যে যে ইপ্সিত ক্ষমতা অর্জন করতে চান সেই ইপ্সিত ফল বা লক্ষ্য।[৩] গজল সৃষ্টির প্রেরণার কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। এখন বিবেচ্য তার উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য দু রকমের—শৈল্পিক ও সামাজিক। প্রথমটি হল বিষযবস্তুকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার ইচ্ছা এবং দ্বিতীয়টি, সুন্দর রূপ সৌন্দর্য সৃষ্টির দ্বারা মানুষের মনোতুষ্টি করার বাসনা। গজল শুধু সুন্দরের সাধনা নয়, শিব ও সত্যেরও সাধনা। প্রকাশ তার প্রথম সত্য, কিন্তু শেষ সত্য নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যের পথে' প্রবন্ধে সাহিত্য সম্পর্কে যে-কথা বলেছিলেন সেটাই গজল সম্পর্কে বলা যায়—গজলের আদিম সত্য হচ্ছে প্রকাশ মাত্র, কিন্তু তার পরিণাম সত্য হল ইন্দ্রিয়, মন এবং আত্মার সমষ্টিগত মানুষের প্রকাশ।

এটি অবশ্যি কলাকৈবল্যবাদীর বিশ্বাস। বহুদিন আগেই বেনিডেট্টো ক্রোচে 'Art is expression' বলে একটা মতবাদ প্রচার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তারই অনুসরণে বলেছেন, এক্সপ্রেশন হচ্ছে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্ত। এক্সপ্রেশনিজম কলা-কৈবল্যবাদেরই সমর্থক। ভিক্টর হুগো সেই ১৮১৯ সনে এর প্রচার শুরু করেছিলেন। এই মতবাদে বিশ্বাসী যাঁরা, তাঁরা কবিতার সার্থকতা খুঁজতে কবিত্বের বাইরে যেতে চাননি। অবশ্য, কলা হি কেবলম বলে লম্ফঝম্প করলেও, পরোক্ষত তাঁরা ফলাকাঙ্ক্ষা না করে পারেননি। এতেই ঘটেছে শিল্পের সামাজিক উপযোগিতার জয়। প্রসঙ্গত, আমরা দেখতে পাই কলাকৈবল্যবাদের প্রচারক হুগো ১৮৬৪ সনে স্বয়ং যোগ দিয়েছেন বিরোধী শিবিরে।

কিন্তু কলাকৈবল্যবাদের মৃত্যু ঘটেনি। ১৮৪৫ সনে তার যে ইতিহাস আনুষ্ঠানিক ভাবে আরম্ভ হয়েছিল, তার ধারা আজও অব্যাহত। ভিক্টর কুজাঁ সেই বছরেই 'I' art pour I 'art' অর্থাৎ 'শিল্প তো বিশুদ্ধ শিল্প' প্রবচনটি চালু করেন। ফরাসি দেশে গোতিয়ে, ফ্লবারট, বোদলেয়ার, ভার্লেন, ইংল্যান্ডের ওয়াল্টার পেটার, অসকার ওয়াইল্ড, ব্র্যাডলে, হুইসলার, ইতালির বেনিডেট্টো ক্রোচে এবং ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, নামদেব প্রমুখ এই মতবাদের সমর্থক হিসেবে পরিগণিত হতে পারেন।

ফিরাক গোরখপুরী বলেছেন, 'অদবের (সাহিত্য) কোনো মকসদ (লক্ষ্য) থাকে না'। তিনি মনে করতেন, 'All art is useless' উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অসকার ওয়াইল্ড যে-কথা বলেছিলেন, তার সঙ্গে বিশ শতকের ফিরাক গোরখপুরীর মন্তব্যের কোনো ফারাক নেই। কিন্তু এই উক্তির ওপর ভিত্তি করে ফিরাককে দায়িত্বজ্ঞানহীন, উন্নাসিক কিংবা বেপরোয়া শায়র হিসেবে চিহ্নিত করা ঠিক হবে না। কেননা, তিনি অত্যন্ত সতর্ক ও চিন্তাশীল শায়র। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'আমি যখন যা বলি সেটাই আমার বক্তব্যের সার ধরলে বিভ্রান্তিই সৃষ্টি হবে। আওয়াজ কখনও বলবার ওপর নির্ভর করে না, কণ্ঠ কখনও মনের অপেক্ষায়

থাকে না।শেরের ভেতর যেমন মৌন থাকে, গজলকারের কথার পিঠে তেমনি থাকে তাৎক্ষণিক উত্তেজনার ঝাপটা। মুখ হাঁ করিয়ে যা বলিয়ে নেয়, সেটাই কবিমনের সব নয়।[৪]

ফিরাককে ঠিক কলাকৈব্যলবাদী বলা যায় না। ওয়াইল্ডের মতো তিনিও যে শেষাবধি গরলামৃত-অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছেন, তার প্রমাণ আছে।বস্তুত যতই তিনি All art is useless বলে প্রচার করুন না কেন, শেষ পর্যন্ত শিল্পের ঔপযৌগিক মূল্যকে নাকচ করতে পারেননি। টি এস এলিয়টের মতো তিনিও বলেছেন, এই মন্তব্যটি হল more advertised than practised. যাঁরা একসময় কলাকৈবল্যবাদের উগ্র প্রচারক হিসেবে পরিচিত ছিলেন তাঁদের অনেকেই শেষ বয়সে কলাকৈবল্যবাদের শিবির ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন।ফিরাক তাঁদেরই একজন। ফ্লুবারট পরবর্তীকালে যে ভাষায় কলাকৈবল্যবাদের অসম্পূর্ণতা ব্যাখ্যা করেছিলেন, ঠিক সেই ভাষাতেই ফিরাক বলেছেন, আসলে চাই—an aesthetico-moral theory—the heart is inseparable from the intelligence. Those who have drawn a line between the two possessed neither.[৫]

'গজলের জন্য গজল' কথাটা যাঁরা চালাতে চান, তাঁরা নিছক দম্ভের প্রচারক।নিরলস প্রকাশ, নির্বিষয় প্রকাশ এ-যুগে অবান্তর—ভাববিলাস মাত্র। এ যুগে অসির চেয়ে মসি বড়ো। তাই যদি বলি 'গজলের পাথেয় গজল', তবে গজলকে ছোটো করা হয়। একথা ঠিক যে সৌন্দর্যসৃষ্টি গজলের একটি শর্ত, কিন্তু এর মূল উদ্দেশ্য 'সুফল' ফলানো। কোমতে বলেছেন, শিল্পের উদ্দেশ্য উন্নততর সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সহায় হওয়া। গজলেরও উদ্দেশ্য তাই হওয়া উচিত।রাসকিনকে অনুসরণ করে বলবো, গজলকে didactic to the people and that as their chief end হওয়া দরকার। এখন 'গজলের জন্য গজল' নিছক নিষ্ফলা ভাববাদী চিন্তা ব্যতিরেকে কিছুই নয়। তাই সাম্প্রতিক কবি গজলের বিষয়কে সমাজের বিষয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেন না, তার সামাজিক উপযোগিতার কথা ভুলতে পারেন না। জীবনের বিচিত্র ছবি যে গজলের পর্দায় ভেসে উঠেছে, সেখানে পরোক্ষত জীবনতত্ত্বের শিক্ষাও পরিবেশিত।

গজলের উদ্দেশ্য নিয়ে যে সমস্যা, তার উদ্ভব গজলের রূপ ও বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের ধোঁয়াটে ধারণা থেকে। এক দলের বক্তব্য, গজলের প্রকাশটাই শেষ কথা, বিষয় বা কনটেন্ট বলে কিছু নেই।পক্ষান্তরে, এঁরা মনে করেন, গজলের বিষয়টা ফালতু ব্যাপার—প্রকাশেই গজলের সার্থকতা। এ ধারণায় গজলের পতন অনিবার্য। কিন্তু এ ধারণায় বিশ্বাসী অনেক কবিই তো গজল লিখছেন, তাঁদের রচনা ব্যর্থ নয় কেন? এ প্রশ্নের জবাব সহজ। বস্তুত, তাঁরা যে গজলচর্চা করছেন তাতে প্রকাশের দাবিই পূরিত হচ্ছে। আর সেই প্রকাশ আসলে বিষয়েরই প্রকাশ। প্রকাশের সার্থকতা বিষয়ের প্রকাশেই নিহিত। ভাষান্তরে, গজলের প্রকাশ বিষয় নিরপেক্ষ কোনো নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব নয়।

গজলের বিষয়বস্তু কোনো সিদ্ধ বস্তু নয়। প্রকাশের মধ্যেই বিষয়বস্তু বা কনটেন্ট। এখানে তা অরূপ নয়। গজলে কোনো বিষয় নেই, আছে শুধু রূপ বা ফর্ম।রোমিও-জুলিয়েট, লায়লা-মজনু, শীরি-ফরাদের গল্পের কাঠামো মোটামুটি এক হলেও বিষয়ে ভিন্নতা আছে। স্রষ্টার আত্মসংস্কৃতির সঙ্গে মিশে কাহিনি বিশেষ ফর্ম পায়। প্রকাশের বিশিষ্টতাই আসল চরিত্র। প্রকাশ যত তীব্র, বিষয়ের অভিব্যক্তিও তেমনি তীব্রতা পায়। একেই বলে conquest of matter by form. রূপ বা ফর্ম যত বড়ো বিষয়ও তত বড়ো। সত্য ও শিবকে (progress of mind and improvement of morals) এড়িয়ে জীবনের গভীর রূপ বা মহান শিল্প কিংবা সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। অতএব গজলের উদ্দেশ্য যেমন আনন্দ বিতরণ, তেমনি তা জীবনসত্যেরও প্রকাশক।

গজলের ফর্ম কোনো ফালতু ব্যাপার নয়। রূপই আমাদের অহসাস ও অলফাজের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়। গজলকারের আত্মসংস্কৃতির সঙ্গে তার অনুভূতি মিলেমিশে যে রূপ-বৈশিষ্ট্য লাভ করে, পরিস্থিতি-কল্পনায়, চরিত্র-কল্পনায়, ভাবাভিব্যক্তিতে, চিন্তার ঐশ্বর্যে প্রকাশ যে বিশেষতা হাসিল করে, সেই খাস ফর্মই

গজলের বিষয়বস্তু। প্রখ্যাত হিন্দী কবি মুক্তিবোধ সম্ভবত এই প্রসঙ্গেই বলেছেন, 'রূপ নিজস্ব পরিস্থিতির কারণে তত্ত্বের ওপর অবলম্বিত থাকে এবং তত্ত্ব স্বপ্রকাশের প্রক্রিয়ায় রূপকে নির্ধারিত ও বিকশিত করে।'

কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে, গজলে তত্ত্বের প্রকাশ হয় কীভাবে? রূপ ব্যতিরেকে কোনো বস্তুকে দেখা সম্ভব? আমি মনে করি, সাহিত্য ও শিল্প কোথাও রূপের ভূমিকা গৌণ নয়। শিল্পের অর্থই হল রূপায়ণ, will to form. কৃতিকে যা শিল্প হিশেবে পরিচিত করে, তা রূপ বই তো নয়।যদি কোনো গজলকার ফর্মকে ধ্রুব ও নির্ণায়ক রূপে মানতে অস্বীকার করেন তবে কোন যুক্তিতে ধরে নেব যে তাঁরা যা কিছু লিখছেন, সবই গজল? ফর্ম ভিন্ন গজলকে চেনবার উপায় তবে কী? গজল শুধু বাইরের চেহারাতেই নয়, বিশেষ আন্তরিক সংরচনাতেও অন্যবিধ কাব্যরূপ থেকে স্বতন্ত্র। গজলের প্রাণ তার আন্তরিক সংগীত। যখন পাঠ করা হয়, তখনও স্বতন্ত্র ধ্বনি ও ব্যঞ্জনায় তা গীতিধর্মী।

ভাব ভিন্ন যেমন ভাষা আসে না, তেমনি ভাষা ভিন্ন ভাবও অসম্ভব।একেবারে কৃত্রিমতা বর্জিত কোনো শিল্প হয় না।যে-কোনো সৃষ্টিই সজাগ চিন্তা ও সচেতন ভাবের ফসল।ভাষা ব্যবহার তো বটেই।এই ভাষা মানুষের জন্মলব্ধ সংস্কার অথবা শারীরবৃত্তিয়-লব্ধ অভ্যাস নয়। চিন্তার সঙ্গে এর সম্পর্ক অচ্ছেদ্য।মানুষের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তার ভাষাও বদলায়।এই পরিবর্তন ধর্মকে লক্ষ করেই স্ট্যালিন বলেছিলেন, 'Whatever the thoughts that may arise in the mind of man, they can arise and exist only on the basis of the language materials, on the basis of language termology and phrases. Bare thought, free from the language material, free from the 'natural matter' of language does not exist[৬] একই কথার অনুরণন শুনি কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের লেখনী-মুখে 'যে কোনো একটি ভাষা মনে মনে আবৃত্তি করিয়াই চিন্তা করে—সেখানে ভাষা নাই, চিন্তাও নাই।' মোট কথা, চিন্তার বিকাশের সঙ্গে সংগতি রেখে ভাষা বিকশিত হয়। এই ভাষা একটা বিষয়মাত্র নয়। জ্ঞান জগতের সমস্ত বিষয়ের ভিত্তি।ভাষা আমাদেরকে রচনা করে।

গজলের ভাষাও স্থির কিংবা স্থিত নয়। তা বদলায়মান। সামাজিক ও মানসিক পরিবেশের অনুসরণে গজলের ভাষা বদলে যায়। এমনিতে গজলের ভাষা বলতে মূলত কথ্যভাষাকেই বোঝায়। কিন্তু রচনা যেহেতু লিপির মুখাপেক্ষী, লিপি যেহেতু বাঙ্ময় ধ্বনির দৃশ্যরূপ এবং লেখ্যভাষা যেহেতু কথ্যভাষার স্থায়ীরূপ—সুতরাং গজলে ব্যবহৃত ভাষাকে আক্ষরিক অর্থে মুখের ভাষা বলা যায় না। তা কথ্যভাষার চেয়ে আপাত স্বতন্ত্র এবং কিছুটা লিপি-আদর্শের অনুগত। এই কারণেই গেয় গজলের তুলনায় লেখ্য গজলের জনপ্রিয়তা ও প্রসারতা কম। কিন্তু লেখ্যভাষাই স্থায়ী, কথ্যভাষা অস্থায়ী। মুখের ভাব বা ভাষা যাতে কালের গণ্ডি ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের শ্রোতার কাছে পৌঁছোতে পারে, তারই জন্যে লিপির উদ্ভাবন। তাই গজলের ভাষা শুধু কর্ণস্পর্শী হলে চলবে না, তাকে মর্মস্পর্শীও হওয়া চাই। গজলের কাজই হল কাল থেকে প্রাণে পৌঁছানো।এটাই তার সাধনা। কানের দরজা পেরিয়ে মনের অলিন্দে যা প্রবেশ করে, তা-ই গজলের ভাব।

গজলের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে কবিদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও তার আসল উদ্দেশ্য সাধারণভাবে সত্যের সঙ্গে আনন্দের মিলনসাধন। যদিচ তাতে যুক্তিতর্কের কচকচানির প্রশ্রয় নেই, অথচ তা যুক্তিবর্জিত বিষয়ের লক্ষ্যহীন কল্পনা নয়। জনসন যেভাবে বলেছেন—It is the art of uniting pleasure with truth by calling imagination of the help of reason, সেইভাবে বলব, যুক্তির সাহায্যে কল্পনাকে আহ্বান করে সত্যের সঙ্গে আনন্দের একত্রীকরণের কলাই গজল। বলা বাহুল্য, এ-দেশে এই পাশ্চাত্য চিন্তা হালের আমদানি। তখনকার কবিরা মনে করতেন, গজলের আঁতুড়ঘর কল্পনা এবং কল্পনামূলক শিল্প কখনোই বিজ্ঞানমূলক হতে পারে না। তাঁরা প্রচার করতেন, গজল হল বিজ্ঞানের বিপরীত বস্তু, যার অন্বেষণ নিদারুণ সত্যের দিকে নয়, আনন্দের অভিমুখে। কিন্তু আনন্দ যদি সত্যের অনুসারী না হয় তবে তা বায়বীয় বা ক্ষণস্থায়ী হয় না কি? ইদানীন্তন গজলের মূল ভাবনা মোটেই অলীক অসত্যের ওপর অবলম্বিত নয়।কেননা, আজকের কবিরা জানেন, 'রূপ নাহি ধরা দেয়—বৃথা সে প্রয়াস।'

শায়রীর এক বিশেষ স্টাইল হল গজল। তার শেরের মধ্যস্থিত নিছক শব্দার্থের অতিরিক্ত কোনো তাৎপর্যের আভাস থাকে, অন্যান্য কাব্যশৈলীর তুলনায় বেশি নির্দিষ্ট ভাবে থরে থরে সাজানো থাকে গজলের শব্দসমূহ এবং শব্দসজ্জার সুষমায় গজল বিধিবদ্ধ ভাবপথ ছাড়িয়ে আনন্দের স্বর্গ রচনা করে। তাই ছন্নছাড়া কিছু শব্দকে পাশাপাশি বসিয়ে দিলে গজল হয় না। তার শব্দসাজ এমন হতে হবে যাতে শের-এ শব্দগুলির পৃথক অর্থের বাইরেও অর্থ-ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হতে পারে। এইজন্য শব্দচয়ন, শব্দসজ্জা, অলংকার ও ছন্দ যথেষ্ট কার্যকরী। গজল কেবলই শব্দের ধ্বনি নয়, শব্দপ্রয়োগের গুণপনাও বটে।—যা শায়রের সূক্ষ্মভাব, অনুভূতিকে পাঠকসাধারণের মনের ঘরে সহজেই পৌঁছে দেয় অথবা অচেতন বা অর্ধচেতন শ্রোতার অনুভূতির তন্ত্রীতে ঘা দিয়ে মনের মণিকোঠায় সুরেল অনুরণন সৃষ্টি করে।

অতএব গজল উদেশ্যমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনুদিষ্ট গজল নিরর্থ বিড়ম্বনা।গজলের আর্ট এমনই সুকুমার, তার কৌশল এমন চতুর, কথা এমনই মর্মস্পর্শী, ব্যাখ্যা এত সজীব, এত অসন্দিগ্ধ, আবেগ এমন গভীর, এমনই অখল যে তা মহৎ উদ্দেশ্যে রচিত না হলে ক্ষতির সম্ভাবনা। সুখের কথা, আধুনিক কবিদের মধ্যে এ সচেতনতা এসেছে। অনেক কবির গজলে কথকতার স্বচ্ছ প্রাঞ্জলতা তর্কের ঝঞ্ঝায় কোনও ক্রমেই আবিল নয়, গজলের আলোয়ায় পাঠককে ধর্মান্তরে টানবার কোনও চেষ্টাই নেই। ফলত আজকের গজলে ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয় ঐক্য, বিশ্ববন্ধুতা, যুদ্ধবিরোধী তত্ত্ব এবং ক্রিয়েটিভ মার্কসিজমের প্রসার ও প্রচারের দরজাও খুলে দিতে পারছে, এটি শুভ লক্ষণ। আমার বিশ্বাস, কাল-দরবার সেই জগলই বেঁচে থাকবে যা সচেতন প্রয়াসের ফসল এবং যাতে থাকবে যুগরোগের নির্ভুল নিদান।

ভাব আর ভাষা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। কেন-না 'ভাষা ও ভাব সম্বন্ধে কোনো রকম পূর্বসংস্কার পোষণীয় নয়, এবং আধুনিক তরুণ-তরুণীদের মতো তারাও মিলন-ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের হিতোপদেশ মানে না, বলে আবেগদৃষ্টিই যখন তাদের ধর্ম, তখন স্বয়ংবর প্রথার পুনঃপ্রচলন অত্যাবশ্যক। ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, আমাদের কপটতার ভয় দেখিয়ে তারা তাদের অভিষ্ট সিদ্ধ করেছে।'[৭] অতএব ভাব ও ভাষার কথা বাদ দিয়ে শুরু করা যেতে পারে ছন্দের আলোচনা।

গজলকারের কাছে প্রথম প্রশ্ন হল—কোন ছন্দে লিখব? ছন্দ মানে, তার মিল নয়।মিল হল অপেক্ষাকৃত নতুন অলংকার, কিন্তু ছন্দ অনাদি। কবির পক্ষে মাত্রাবিতরণ কীরকম হবে এবং মিসরা ও মিতলা কতদূর ছড়িয়ে পড়বে, এসব জানা সবচেয়ে জরুরি। ব্যক্তিগতভাবে বলে নিই, আমি ছন্দশাস্ত্রে পণ্ডিত নই। তা ছাড়া গজলের ছন্দ-প্রসঙ্গ এত এলায়িত যে তার খুঁটিনাটি চর্চা এখানে অসম্ভব।

সংক্ষেপে বলা যায়, আবেগের সঙ্গে ছন্দের সন্নিপাতে গজলের জন্ম। উপমা-সহযোগে বলতে পারি, ছন্দ ও আবেগ সাঁড়াশির মতো। দুটি হাতলের মিলন বা আকর্ষণেই তার কার্যকারিতা। আদিম মানুষ প্রথম যেদিন ভাষা শিখল, তারা বুঝল যে সেই বাক্যগুলিই অনায়াসে আমাদের মনে থাকে যেগুলির মধ্যে যতির কোনো ব্যতিক্রম নেই। মুখর আবেগ শৃঙ্খলিত হল যতিতে। সুকুমার সেনের ভাষায়, 'কথা বলিবার সময় মাঝে মাঝে শ্বাসাবেগ স্বতই শিথিল হইয়া আসে এবং নূতন করিয়া শ্বাস গ্রহণ করিতে হয়, তখন বাক্যে যে বিরাম হয় তাহাকে বলে যতি (pause, caesura)।[৮] ধ্বনি ও যতির এই শেকলই সম্ভবত ছন্দ। ছন্দের প্রধান লক্ষণই হল যতিচ্ছেদ। কিন্তু ছন্দশাস্ত্রের এই বিধিনিয়ম বোধহয় সর্বত্র সমান কার্যকর নয়। প্রসঙ্গত, প্রসিদ্ধ হিন্দি কবি ধূমিলের কবিতা পড়া যাক—

> 'এক সম্পূর্ণ স্ত্রী হোনে কে পহলে হী
> গর্ভাধান কী ক্রিয়া সে গুজরতে হুয়ে
> উসনে জানা কি প্যার
> ঘনী আবাদী ওয়ালী বস্তিয়োঁ মেঁ

মকান কী তলাশ হ্যায়।
লগাতার বারিশ সে ভীগতে হুয়ে
উসনে জানা কি হর লড়কী
তীসরে গর্ভপাত কে বাদ ধর্মশালা হো জাতী হ্যায়।'

এ-কবিতায় ব্যাকরণগত সংজ্ঞার সীমাসন্ধি কোথায়? অথচ এতেই রয়েছে অদৃশ্য সুরঝংকার। ধ্বনি ও যতির সুসম্বদ্ধ উদগার। ব্যাকরণ বই বন্ধ করে শুনলে তা ধরা পড়বে। তখন মানতেই হবে যে আলংকারিকের কঠিন গণিতসাপেক্ষ ছন্দ ব্যতিরেকেও কবিতা লেখা যায়। বস্তুত সুকুমারবাবুরা যাকে ছন্দ বলেন সেটা যান্ত্রিক কৌশল মাত্র। হিন্দির অনেক কবি ওই যন্ত্রকৌশলটা খুব ভালোভাবে রপ্ত করেছেন। তাঁরা আবার গজলও লিখছেন। কিন্তু আবেগের চৌবাচ্চা যেখানে শুকনো, সেখানে আস্বাদনের জন্যে ঘটি ডোবালে রসের জল উঠবে কেন? সনেটের কবি ত্রিলোচন শাস্ত্রীর গজল সংস্কৃতগন্ধী ভাষা আর সমাস-গুম্ফিত পদ ও তৎসম শব্দের ব্যবহারে ভারাক্রান্ত। যেমন 'প্রশংসা পরার্থানুসন্ধান কী হ্যায়', 'কহাঁ স্বার্থ কা রঙ...' ইত্যাদি। অন্যদিকে অতীন্দ্রিয় শ্রুতির কল্যাণে আমরা প্রচণ্ড রকমের গদ্যের মধ্যেও কখনও কখনও ছন্দোবদ্ধ কবিতার ধ্বনি শুনতে পাই। এই দুটি দিক নিয়ে চিন্তা করলে মনে হতে পারে, আবেগকে নিজের ছন্দ খুঁজে নিতে দেওয়াই প্রশস্ত। কোনও কোনও আধুনিক কবিতায় যতির কোনো সুনির্দিষ্ট স্থান নেই, কিন্তু চরণ বা চরণাংশের অর্থানুযায়ী শ্বাস নিয়মিত হয়। উদাহরণত—

'ওহ শোষণ কে সিংহদ্বার পর
প্রতিশোধ কী গজ টক্কর হ্যায়
ওহ অন্যায় কে রাস্তে মেঁ
এক বারুদী সুরংগ হ্যায়
ওহ অনির্ণয় কী স্থিতি মেঁ
এক উঠা হুয়া হাত হ্যায়
ওহ ভারতী অওর অজ্ঞেয়-কে সামনে
মুক্তিবোধ অওর
নিরালা হ্যায়
ওহ এলিয়ট অওর পাউণ্ড কে খিলাফ
নেরুদা অওর মায়কোভস্কী হ্যায়।'

কবি নরেন্দ্র বশিষ্ঠ এখানে যে ছন্দ ব্যবহার করেছেন তাতে যতির ব্যতিক্রম আছে, ধ্বনিও ভিন্ন-ভিন্নতর। সাধারণ কবিতার ক্ষেত্রে এ ছন্দের বিকল্প নেই। কিন্তু গজলে তেমন নয়। এখানে নির্দিষ্ট অক্ষরের পরে শ্বাসের বিরাম অনিবার্য। গজল ছন্দ একটা স্বয়ম্ভর নিয়মের নিবিড় বন্ধনে নিটোল। কবিতায় যেমন ছন্দ মাত্রেই আবেগের পদাঙ্কে চলতে পারে, গজলকার তেমন আবেগের তাড়নায় ছন্দের বাঁধন ছিঁড়তে পারেন না। এ ছন্দের বিবর্তন ঘটেছে ঠিক কথা, কিন্তু সব ছন্দোবদ্ধ হয়ে চলে—এক ও পাশাপাশি। গজলের লক্ষণ যেহেতু তার গতিময়তা, সুতরাং ছন্দের নিয়ম এখানে আরও কঠোর—

'খুশক পত্তা সহী প্যয়রোঁ মে ন ডালো মুঝকো।
অওর কুছ দের হথেলী পে সঁভালো মুঝকো।।
আজ কে দওর মেঁ দম তোড় রহা হ্যায় কিরদার।
জল্দ অহসাস কে মলবে সে নিকালো মুঝকো।।
অওর কুছ দের অগর ঘর মেঁ উজালা চাহো।
শমআ কা আখিরী টুকড়া হুঁ জলা লো মুঝকো।।'

জকি আরিক সিদ্দিকীর এই গজলটিতে মনোযোগ দেওয়া যাক। এর প্রতিটি শেরের প্রথম পংক্তিগুলি একে অপরের চেয়ে পৃথক। কিন্তু দ্বিতীয় পংক্তিগুলি নয়।প্রত্যেকটি দ্বিতীয় পংক্তির শেষ পদ 'মুঝকো'। এতে শুধু লালিত্য আর প্রবহমানতাই রক্ষা পায়নি, উপরন্তু গান অথবা পাঠ ব্যাপারেও সুবিধে। প্রতিটি শেরের প্রথম পঙক্তিগুলি আবৃত্তির সময় দু-বার করে এবং তার লয় আপাত বিলম্বিত করতে হয়। বিপরীতে, দ্বিতীয় পংক্তিগুলি একবারই এবং দ্রুত উচ্চার্য।

পাঠ্য গজলও সুরনির্ভর। তান-মান-তাল সংগীতের যেমন, গজলেরও তেমনি বিশিষ্ট গুণ।তাই শেরের অক্ষরবৃদ্ধি শ্রবণে ব্যাঘাত ঘটায় না। গজলের প্রথম পাদার্ধে বর্ণবৃদ্ধির সঙ্গে ছান্দসিকের কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু দ্বিতীয় পাদার্ধে ছন্দের ঠাট অটুট। এই বিধিবদ্ধ সংকীর্ণতার বেড়াজাল ডিঙিয়ে আবেগের আতিশয্য উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর। তবুও, এই স্বয়ংবহ ছন্দ-বাঁধন ছিঁড়ে কোনো কোনো কবি গজলকে কেন প্রথাসিদ্ধ ছাঁচে ঢালতে অসম্মত, তার উত্তরানুসন্ধান আবশ্যিক। প্রথমত, আজকের গজলে বিচিত্র ও বিচিত্রতর বিষয়ের সমাবেশ ঘটেছে, বিধিবদ্ধ সরু গলির মধ্যে গেগুলিকে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয় বলে তাঁরা মনে করছেন। তাদের চাই খেয়ালি আবহাওয়া, প্রশস্ত পরিসর। ভাষা ও আবেগের স্বচ্ছন্দ বিচরণ ক্ষেত্র। তাঁদের মতে, প্রশস্ততা ও স্বাচ্ছন্দ্য গতানুগতিক ছন্দোবদ্ধতায় দুর্লভ। বুড়ো ছন্দের শাসন মানতে তাঁরা নারাজ। ভাষার ঝোঁক যেমন সরলতার দিকে, ছন্দের ঝোঁক তেমনি বিস্তৃতির দিকে।বহু আধুনিক কবি তাই গাণিতিক সূত্রের প্রতিবাদে সোচ্চার।

এঁদের দাবিকে ষোলো আনা নির্ভুল বলে উল্লেখ করেছেন সমালোচক খুর্শীদ আলম খাঁ। উপরন্তু তিনি এঁদের প্রতি নিজের অনুমোদনকে জোরদার করতে ত্রিলোচন শাস্ত্রীর একটি গজলের উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

'প্রবল জলবাত পা কর সিন্ধু দুস্তর হোতা জাতা হ্যয়,
কঠিন সংঘর্ষ জীবন কা কঠিনতর হোতা জাতা হ্যয়।
কমাতা এক থা পরিবার পুরা চয়ন করতা থা,
অকেলে কা জীবন অব তো দুভর হোতা জাতা হ্যয়।
'ত্রিলোচন' তুম গজল মেঁ খুব আয়ে বাত বন আঈ,
নয়ে জীবন কা স্বর অব গান কা স্বর হোতা জাতা হ্যয়।'

এবং দেখিয়েছেন যে, এতে ছন্দের শাসন অক্ষরে অক্ষরে অনুপালিত হয়েছে কিন্তু তা শ্রোতার মনে গুঞ্জরন ঘটাতে পারে না। খাঁ সাহেব বলেছেন—যা শ্রোতাকে আবেগে আপ্লুত করতে পারে না, যা শুনে বুকে গুঞ্জরন ঘটে না, সে গজলের দাম কী? এখানেই আসে নতুনের প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। খাঁ সাহেবের বক্তব্য—গজল এমনই এক লোভনীয় ও আবেগপ্রবণ কাব্যশৈলী, যাকে বিশেষ কোনো ফর্মের গণ্ডিতে বেঁধে রাখা অন্যায়।

এ দাবির পুরোপুরি অনুমোদন আমার পক্ষে অসম্ভব। তাতে গজলের মিউজের অবমাননা হবে। যাঁরা গতানুগতিকতার বিরোধিতা করছেন তাঁদের 'গজল' সিদ্ধির চূড়ান্ত সীমাস্বর্গে পৌঁছাতে পেরেছে কি? পারেনি। তাঁদের সাম্প্রতিক কাব্যচর্চার নমুনা দেখলে বোঝা যায় তাঁদের ব্যর্থতা। পক্ষান্তরে অ্যান্টি-ফর্মিস্ট কবিদের দাবিমতো তাঁদের সমগ্র রচনাকর্ম তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও গজল-সংগঠনে সাফল্য, ভাষার যথার্থ ব্যবহার, নতুন শব্দ নির্মাণ ও প্রয়োগের কুশলতা কিছুই মেলে না। মিতলা-মিলের নিয়ম অনুসৃত না হলে এবং ছন্দরহিত গজলের নামে কিন্তু ছন্নছাড়া শব্দের পৌনপুনিক ব্যবহারে গজল হয় না। বস্তুত, মিতলা-মিলের গূঢ় শৃঙ্খলের মোচন তখনই বাঞ্ছনীয়, যখন কোনও উপায় ও ভাবের বৈকল্পিক বিন্যাসে সেই প্রতিসাম্য হবে সুগঠিত।

গজলের বাঞ্ছিত সহজতার পেছনে রয়েছে নতুন কবির অপ্রাকৃত আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা পূরিত হলে গজলের পতন অনিবার্য। কিন্তু যে-হারে তাঁদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে, ভয় হয়, তাতে হয়তো একদিন গজলের মাত্রাগণনাই উঠে যাবে। তখন গজল হয়ে দাঁড়াবে ডিসকো প্যাটার্নের এক হালকা জিনিস। বস্তুত, ছন্দ ছাড়া

গজল নৈব নৈব। ছন্দের জ্ঞান যে-কবির হয়নি, গজলের মহাপ্রাসাদে তার প্রবেশ দুরাশা মাত্র। গজলের একটা নির্দেশ আছে। নির্দেশিকাটি হল তার ব্যাকরণ—ছন্দ। যা হারালে পথভোলা হবার আশঙ্কা। এটি অস্বীকার করে যাঁরা দুর্গম পথে পা বাড়াতে সাহসী হয়েছেন তাঁদের বোঝা উচিত, যে বিশিষ্ট ছন্দের বলে গজল কাব্যরাজ্যে রাজতনয়ার সম্মান পেয়েছে তাকে নিয়ে এলোমেলো ব্যবহারে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি।প্রকৃত গজলকারের অগ্নিপরীক্ষার শুরু এখানেই। তাঁকে বুঝতে হবে, যে সীমায়িত গণ্ডি তিনি পেয়েছেন তার মধ্যেই তাঁর বিচরণ। তাঁকে ওই সংকীর্ণতাকে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করেই আধুনিকতার সীমারেখায় পৌঁছোতে হবে।

গজলের মুক্তি ছন্দমুক্তিতে নয়। এ সত্য অনেকে অস্বীকার করলেও, কার্যত অগ্রাহ্য করতে পারেননি। উদাহরণত, সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালা', যিনি বলেছিলেন 'ছন্দের শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াতেই কাব্যের মুক্তি', তিনিও নিজের 'বেলা' কাব্যগ্রন্থের গজলগুলিতে ফারসি ছন্দের অনুশাসন না মেনে পারেননি। অনেকের ধারণা, মুক্তছন্দের অর্থ রূপ বা ছন্দানুশাসনের মুক্তি। বস্তুত, তা প্রাচীন ছন্দানুশাসন থেকে বেরিয়ে আসা এবং নতুন রূপানুসন্ধানেরই নামান্তর, ছন্দমুক্তি নয়। ক্বচিৎ তা প্রাচীন ছন্দেরই আধুনিকীকরণ। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্বয়ং নিরালাজী। এই নবীনতাই কবিতার অন্বিতি। আমি বলব, লয় আর সংরচনার লয়াত্মক চেতনা ব্যতীত গজল হয় না।

অনুবাদের প্রশ্নটা এখানেই বিবেচ্য। যা-কিছুই প্রাচীন, তার সঙ্গে আধুনিক জীবন ও দেশকালের ব্যবধান স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু ব্যবধান অনতিক্রম্য নয়। প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের যে যোগসূত্র, অনুবাদই তার স্বর্ণসেতু। গালিব, মীর বা ফয়েজের সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের যে সংলগ্নতা—এটা সম্ভব ছিল না যদি-না আমাদের জীবনের সঙ্গে তাঁরা এমনভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যেতেন। শ্রেষ্ঠ রচনামাত্রেই অনুবাদের মুখাপেক্ষী। তারই প্ররোচনায় আমরা যুগে যুগে সেগুলিকে বয়ে নিয়ে এসে 'ক্লাসিক' সংজ্ঞা দিই। আজকের সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রতিবেশেও তাই মীর-গালিবের সংলগ্নতা নিবার্য হয়ে যায়নি।

অনুবাদের অনুবাদও বাঞ্ছনীয়। ভাষা যেহেতু একটি নিত্যসাধন ও পরিবর্তনধর্মী বস্তু এবং ভাষাই যেহেতু সাহিত্যের বাহন, সুতরাং কোনো একটি অনুবাদ একসময় উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হলেও পরবর্তী কালে তা পর্যাপ্ত থাকে না। আজ যে ভাষা সরল, ভবিষ্যতে সেই ভাষাই দুর্বোধ্য হয়ে উঠতে পারে। নতুন অনুবাদই পারে সরলতর ভাষার মাধ্যমে প্রাচীনকে সজীব ও সমকালীন সাহিত্যের অংশ করে তুলতে।প্রত্যেকটি যুগ ভাষার যে বিশেষ ভঙ্গিকে নিয়ে এগোয়, তার সঙ্গে গাঁটছাড়া না বাঁধলে প্রাচীনের পুনরুজ্জীবন ঘটানো যায় না।

সুন্দরী মেয়েরা নাকি বিশ্বস্ত হয় না, যদি হয় তবে সে সুন্দরীই নয়। এইরকম একটা প্রবচন শুনতে পাই। গজলের অনুবাদ সম্পর্কেও অনেকে এই প্রবচনটা চালাতে চান। সত্যিই কি তাই? সুন্দর ও বিশ্বস্ত অনুবাদ কি এমনই অসম্ভব? প্রশ্নটা অমূলক নয়। সাধারণ কবিতায় এ-ধারণা ভ্রান্ত, কিন্তু গজলের বেলায় যুক্তিযুক্ত। সাধারণ কবিতার অনুবাদ মূলানুগ করতে গেলে মূলের রস পাওয়া যাবে না বলে যাঁদের ধারণা, আমি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে পারি ঢাকা বাংলা আকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত অলবিরূণীর বঙ্গানুবাদ কিংবা সুধীন্দ্রনাথ-বুদ্ধদেব কৃত কালিদাস-অনুবাদ; এমনকি, শুভম চক্রবর্তীর 'শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাষ্টক ও অন্যান্য কবিতা'। এইসব তর্জমা কেবলমাত্র মূল কাব্যের প্রতিনিধিত্বই করেনি, রচয়িতা ও অনুবাদকের ব্যক্তিত্বের পরিচয়বাহী হয়েছে।

আসলে, ভাষাকে আমরা জন্ম দিই না, ভাষাই আমাদেরকে রচনা করে।ভাষা সহচরী হয়ে, সহধর্মিণীর মতো আমাদের জীবনের 'ঋত' পূরণ করে। ভাষা সেই আত্মজা, যে আমাদের 'আত্মসম্ভবা অভিব্যক্তিকে' সার্থক করে। অনেকের ধারণা, সৃজনশীল লেখকের পক্ষে অনুবাদ অকর্তব্য। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে অনুবাদ মৌলিক রচনার চেয়েও অধিক সমাবেশী সৃজনাত্মক প্রতিভার কাজ। সেখানে দুটি ভাষার রচনাভঙ্গির সঙ্গে

অনুবাদককে একাত্ম হতে হয়। মৌল লেখকের সমপরিমাণ শৈল্পিক ক্ষমতা এবং সৃজনশীল কল্পনা ছাড়া অনুবাদ 'ভাষিক রূপান্তর' মাত্র। ভাষা শাড়ি পালটানোর মতো স্থূল বা বাহ্যিক ব্যাপার নয়।তা যদি হত, তাহলে অনুবাদের কাজ কমপিউটার যন্ত্রই স্বচ্ছন্দে করতে পারত। বস্তুত, অনুবাদ সৃজন-ব্যাপার এবং তা অনুবাদকের কাছে চ্যালেঞ্জ ছাড়া কিছু নয়। অন্যের লেখার মধ্যে তিনি নিজের সৃষ্টিকে খোঁজেন। এ-কাজে ব্যক্তিগত আস্বাদনের স্থান অনেকখানি এবং তাতে ব্যক্তিগত আনন্দের অবাধ খেয়ালি রূপটাই ধরা পড়ে। অনুবাদকের ব্যক্তিগত আস্বাদন থেকে উদ্ভূত অনুবাদে মূল স্রষ্টার ব্যক্তিকে ছোঁয়া যায়।

কিন্তু এখানেই গজল-অনুবাদকের সীমাবদ্ধতা। মূল রচনাকার যেখানে স্বতন্ত্র, অনুবাদক সেখানে পরতন্ত্র। যে অভিজ্ঞতা বা যন্ত্রণা নিজের নয়, অপরের, তাকে আত্মসাৎ করে ভাষান্তরে প্রকাশ করতে গেলে তা প্রমাণিত হবে কি? ভাষানুবাদের মূল্য আছে। একটি গজল যখন অন্য ভাষায় রূপান্তরিত হয় তখন তা নিজের সমস্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 'ইথস'কে বহন করে আনে। মূলের আঙ্কিক ও অখণ্ড পরিপূর্ণতা নিয়েই তা আসে। অনুবাদের একটা নির্বিবাদ শর্তই হল, তাতে মূলের জীবন্ত ও সংবেদিত বিম্ব যেন সংপ্রেষিত হয়। প্রকৃত অনুবাদে মূলের যাবৎ প্রাণশক্তি ও সজীবতা তার অন্তর্নিহিত প্রতীকী-ব্যবস্থায় ও ফ্যানটাসি-উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে।

হুবহু অনুবাদে মূলের স্বাদ দুর্লভ।তাতে 'ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি শুধু ব্যঙ্গ করে, ধ্বনির কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে'। ভালো অনুবাদক শুধু মূলের ওপর নির্ভর করেন না। যেটুকু ভাষা তিনি পান সেটুকুই তাঁর পুঁজি নয়। তিনি স্বয়ং ভাষা তৈরি করেন। কেন-না তিনি জানেন, অনুবাদ যে ভাষায় করা হচ্ছে সেই ভাষারই লেখ্য ও কথ্যশৈলীতে তা জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে, অন্য ভাষার শৈলীতে নয়। তর্জমার অর্থই হল পরের জিনিসকে আপন করে নেওয়া।

কিন্তু, এই শর্তের পূরণে গজলের অনুবাদ সম্ভব নয়। গজলের অনুবাদ সুন্দর হলে তার প্রামাণিকতায় সন্দেহ জাগে এবং তা প্রামাণিক হলে কখনোই সুন্দর হয় না। রুবাই-কতএ-নগমা প্রভৃতি শৈলীর কবিতা অনুবাদ একাধারে সুন্দর ও বিশ্বস্ত হতে পারে, কিন্তু গজলের বেলায় তা হয় না। কবিতা ও শের ভিন্ন। ফিরাকের ভাষায়, 'যা মনকে ছুঁয়ে যায় তা শের, এবং কবিতা লেখা হয় যোগীর ধ্যান ভাঙানোর জন্য।' যদিচ দুটিতেই কবিসত্তা স্বয়ং দীপ্যমান, অথচ আধার-ভেদে ভাব-ভঙ্গি ও আঙ্গিক তথা শব্দগঠনের দরুন প্রকাশে কিছু কিছু নিজস্ব বিশেষতা দেখা দেয়-যাকে নাকতোলা করা যায় না। কবিতার আক্ষরিক অনুবাদে মূলের রস পাওয়া যায় না, আবার গজলের ভাবানুবাদেও সেই রস দুর্লভ। অনেক প্রথিতযশা কবি গালিব, মীর, ইকবাল প্রমুখের গজল তর্জমা করেছেন, সেগুলির বেশির ভাগই ভাবানুবাদ হওয়ার দরুন মূলানুগ (ছন্দের দিক থেকে) হতে পারেনি। ফলত সেই অনূদিত বস্তুগুলিকে গজল না বলে কবিতা বলাই বাঞ্ছনীয়। দেশকাল ও পারস্পরিক সংলগ্নতা রক্ষার জন্যে এই ধরনের ভাবানুবাদের প্রয়োজন আছে স্বীকার করি, কিন্তু তাতে ব্যাকরণটা থেকে যায় দাসীর মতো পিছিয়ে।

গজলের ফর্মের একটা অপরিহার্য লক্ষণই হল এই সংকীর্ণতা। চৈতন্যধারাকে আতলস্বচ্ছ রাখতে হলে তাতে খাল কেটে বাইরের জল ঢোকানো যায় না। জনাব মুমতাজুর্রশীদ সাহেব লিখেছেন, 'গজল এমনই এক নজম, যার প্রতিটি শের স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অন্য শেরের ভাব থেকে ভিন্ন।'[৯] অর্থাৎ গজল কেবলমাত্র দুটি পঙক্তির মধ্যে লেখা হয়। দুটি পঙক্তির ডোরে যে সুরভিত পুষ্পের মালা গাঁথা হয় তাকে কাব্যিক ভাষায় বলতে পারি 'রদীফোকাফিয়া'। কাফিয়া শব্দটির অর্থ ছন্দমিল, আর যে শব্দসমষ্টি সমগ্র গজলটিতে এঁটে থাকে তাকে বলে রদীফ। বলতে কি, রদীফ আর কাফিয়া বাদ দিয়ে আর যাই হোক, গজল হয় না।রদীফ ও কাফিয়ার যুগ্ম মিলনে গজল এমনই এক লিরিক, যার প্রতিটি শের স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বকীয়তায় উজ্জ্বল।

এখনকার কিছু কবি গজলকে এই প্রথাসিদ্ধ ছাঁচে ঢালতে সম্মত নন।কিন্তু তাঁরা যে স্টাইলে অভ্যস্ত হতে চাইছেন, সেটাকে 'নতুন' বলা যায় না। অনুমানত আটশো বছর আগে ফারসি ভাষায় গজলের জন্ম। আদি

পর্বে যখন গজলের বিষয় ছিল শুধুই প্রেম, দ্রাক্ষাজাত, মদ ও মৌমাছি, সেই সময় রমাণি, সাদী, হিকমত প্রমুখের গজলে থাকত মাত্র দুটি পংক্তি বা মিসরা। প্রসঙ্গ হত একটাই। শায়রের আত্মতৃপ্তিতে তার বিস্তারপর্বের পরিসমাপ্তি ঘটত, কেননা গজল আগে শায়রের, পরে অন্যের। প্রতীক ব্যবহার ছিল না, বস্তু শুধুই বস্তু। ছিল দার্শনিক তত্ত্বের অভাব। তাই একাধিক শেরের প্রয়োজনও ছিল না।

পরবর্তী কালে এই আঙ্গিক অব্যাহত থাকেনি বটে, কিন্তু ভাবের দিকেও কোনও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়নি বহুকাল। গজলে একাধিক শেরের ব্যবহার তখন থেকেই। কিন্তু প্রসঙ্গ ছিল এক ও অভিন্ন। একই ভাব ঘুরেফিরে আসত। তাকে টেনে বড়ো করা হত নিছক কারিকুরি দিয়ে। সেটায় খুব একটা ফলশ্রুতি ঘটত না। কেননা কালোয়াতির ঘোরপ্যাঁচে মূল বক্তব্যটাই চাপা পড়ে যেত। এইসময় হাফিজ সিরাজীর আবির্ভাব ফারসি গজলের ক্ষেত্রে আশীর্বাদ সিদ্ধ হয়েছে। তাঁর গজলেই প্রথম শব্দ আর অভিব্যক্তিতে দুটি বিশিষ্ট রূপ ফুটে উঠেছে। তিনি কাব্যপ্রকরণেও আনলেন অভিনবত্ব। একই গজলে দুই বা ততোধিক প্রসঙ্গ এল, অথচ গজলের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রইল। 'আপাত বিষম প্রসঙ্গ জুড়ে এক অপূর্ব সামঞ্জস্য পৌঁছোল—গজলে এ জিনিস হাফিজের আগে ছিল না। কোনো প্রসঙ্গ পুরোপুরি আনারও দরকার নেই। খণ্ডভাবে আনলেও তা সমগ্রের অঙ্গীভূত হবে। অভ্যস্ত শ্রোতাদের স্মৃতিতে বহুশ্রুত কবিতার সঞ্চিত ভাণ্ডার থাকায় হাফিজের এই নতুন রীতির গজল রসগ্রহণে ব্যাঘাত ঘটেনি। ল্যাজ টানতেই মাথা এসে গেছে।'[১০]

এই আনুকূল্যের ফলে, হাফিজ নতুন ফর্মের বোঝা স্বচ্ছন্দে চাপিয়ে দিতে পেরেছিলেন তাঁর উত্তরসাধকদের রথের মাথায়। সেই রথ যেখানে এসে থেমেছে সেখান থেকেই শুরু হয়েছে ভারতীয় গজলের উত্থানপর্ব। আমির খুসরোর জমানা থেকে শুরু হয়েছে গজলে ভিন্ন ভিন্ন চরণে একই কথা বিভিন্ন ভাবে ও সুরে একাধিক শেরের ব্যবহার। প্রথম শেরের দুটি মিসরাতে হামকাফিয়া হয়। এটিকে বলা হয় শেরে-মিতলা। পরের শেরগুলিতে অন্য মিসরাগুলিও এক-একটি হামকাফিয়া রচনা করে। গজলের শেষ শেরটিকে বলা হয় মকতা, যাতে শায়র নিজের মুখসর নাম (Take Name) কিংবা তখল্লুস বা মূল বক্তব্য প্রকাশ করেন। যেমন

> 'উও কৈস অব জিসে মজনু পুকারতে হ্যাঁয় ফরাজ
> তেরী তরহ্ কোঈ দিওয়ানা ঘর সে নিকলা থা।'

শেরটি একবার পড়েই আমরা বলে দিতে পারব এর রচয়িতা আহমদ ফরাজ। এ ধরনের ভণিতার কারণেই শ' শ' বছর আগে লেখা গজলেও কবি-শনাক্ত করা সহজ। একটি গজলে একাধিক মিতলা হতে পারে, কিন্তু মকতা নয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ফর্মের নামে এত টেকনিক্যাল ঝামেলার দরকার কী? বরং স্রষ্টা নিজেই সেইসব বন্দিশগুলিকে ভেঙে ফেলুন, যেগুলি ফর্মের নামে জটিলতা সৃষ্টি করছে। এর জবাবে গজলকার ধনঞ্জয় বর্মা বলেছেন—'আমরাও ফর্মালজিমের অন্ধ অনুগামী নই।তার জানিবদার না-হওয়াই আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক। কিন্তু গজলের ফর্ম কোনও তুচ্ছ অনুষঙ্গ বা ফালতু ব্যাপার নয়। গজলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্তই হল প্রচলিত গতে অহসাস ও অলফাজ (অনুভূতি ও ভাবনা) ব্যক্ত করা। গজলের আসরে শ্রোতার মনে যে স্বর্গীয় ভাব উদ্রিক্ত হয় তা গজলের পক্ষেই সম্ভব। তার এক-একটি শেরে সৌন্দর্যের গাঁট থেকে অপূর্ব রূপচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয়, সুগন্ধী পুষ্পের সুবাসে ভরে যায় মন, নির্মোচন ঘটে স্বর্গীয় অনুভূতির।'[১১]

একথা স্বীকার করব যে গজল মূলত লিরিক এবং তাতে বাড়তি শব্দ ও ইঙ্গিতময় ভাষার আপাত উদ্ভটতা, আঙ্গিকের দুরূহতা তথা মর্মময়তার পার্থক্য যত কম থাকবে ততই ভালো। এরই সঙ্গে ফ্রস্টের উক্তি ধার করে দাবি জানাব—ঝরাপাতা, শুকনো পাতা সরিয়ে দাও, যাতে স্বচ্ছ জল আসতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে গজলের ফর্মকেই অগ্রাহ্য করব। বস্তুত, গজলের গঠন এত পুষ্ট ও দৃঢ় যে অপরাপর কাব্যশৈলী অভিব্যক্তির তীব্রতা নিয়ে সেই সীমা পর্যন্ত এগোতে পারেনি, যেখানে গজলের স্বচ্ছন্দ বিচরণ। এতে যে ভিন্ন

ভিন্ন শের থাকে সেগুলি নিজেদের মধ্যেই সম্পূর্ণ সংবেদনের সংবাহক। অর্থাৎ প্রতিটি শের স্ব-নির্ভর। তারা অনুভূতি ও চেতনাকে নিজের মধ্যে গুছিয়ে রাখার সমতা রাখে।যেমন ফিরাক বলেছেন, 'গজলের প্রতিটি শের নিজেদের মধ্যে এক-একটি দুনিয়া। তারা বড়ো কথাকে ন্যূনতম শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করতে সক্ষম।'

পুনরুক্তি হোক, তবু বলব, গজলের প্রতিটি শের রচনাচাতুর্যের গুণে এক-একটি সংসার। এখানেই স্বীকৃতি পায় তার শিল্পের অন্তর্নিহিত প্রসরণশীলতার গুরুত্ব। গজলের শিল্প, কথ্যকে যুগপৎ বাঁধন ও স্থিতিস্থাপকতা—দুই-ই প্রদান করে। নানা রঙের লাচ্ছি ক্রমে খুলে যেতে থাকে, যার সেই ছোট্ট সংসার এমনভাবে বিস্তার লাভ করে, যা গজলের শিল্পে বক্তব্যের প্রসরণশীলতারই চমৎকার। ফিরাক গোরখপুরীর ভাষায়—'গজলের প্রতিটি শেরে এমন একটা জাদু থাকে যে জীবনের অনেক পরিস্থিতিতে, বিভিন্ন প্রসঙ্গে ও অবকাশে, বিষয়ে ও ব্যবহারে খাপ খেয়ে যায়।'[১২] আধুনিক গজলের ক্ষেত্রে নানা অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনার সঙ্গে সমকালীন রাজনীতির জটিল প্রভাব, তত্ত্ব ও তথ্যের প্রাচুর্যের সঙ্গে বোধ ও বুদ্ধির বিচিত্র জটিলতার সহাবস্থান বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দেশ ও মানুষের ইতিহাসগত অস্তিত্বে যে অবস্থান্তর তর্কাতীত সত্য, গজলের প্রবহমান সত্তায়ও তা সমাক্রান্ত সত্য। এ হচ্ছে মনের বদল, মননের আদান-প্রদান, বাচনভঙ্গির মিথষ্ক্রিয়া।

বর্তমান প্রাবন্ধিকের এ মন্তব্যে কেউ যদি স্ববিরোধ বা বিরোধাভাস লক্ষ করে থাকেন, তাঁর সঙ্গে বিবাদে নামব না। বরং বলব, সেই অন্তর্বিরোধটা গজলেরই শক্তি এবং এই শক্তির ওপর নির্ভর করেই জীবনের অন্তর্বিরোধসমূহ ব্যক্ত করার ব্যাপারে গজল সম্ভাবনাময়। গজল পাঠের সময় মনকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে এবং সমস্ত নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে দিলে মনের গভীরতম বেদনা বা উপলব্ধি চেতনার উপরিভাগে ভেসে উঠবে। হয়তো এই কারণেই চেতনার অন্তর্লোকে অবতরণ করা আধুনিক গজলকারদের পক্ষে সহজ হয়েছে। মানসিক চেতনা প্রকাশের প্রকৃষ্টতম মাধ্যম হল গজল এবং মীর, গালিব, ইকবাল, হালি, ফিরাক, ফয়েজের গজলে যার সন্ধান একেবারে দুর্লক্ষ্য নয়। কেননা কবিতার জন্ম 'from a strong personal need, rather than from any thorough understanding of any ideology.'

গজলের পারম্পরিক সংস্কারে কল্পনার রং এমনই চড়া যে তা থেকে অব্যহতি পেতে কোনো কবির আকাঙ্খা নেই। এমনিতে, প্রসরণশীলতা হল গজলের মেজাজ, যার সংবেদনশীলতাকে বজায় রাখতে স্থিতিস্থাপকতা একটি জরুরি শর্ত। কিন্তু গজলের প্রধানতম বিশেষত্ব কল্পনা ও দ্রবণশীলতা। কল্পনা দোষের নয়, কাল্পনিকতা দোষের। আর দরদভরা দ্রবণশীলতা তো কোনো কালেই অনাদৃত নয়। কেননা আমাদের ভেতরতর সমস্ত অনুভূতির মধ্যে দরদ বা বেদনার স্থান সর্বাগ্রে। দরদের সঙ্গে গজলের হার্দ্যতা সর্বকালের। যে-সব গজল আমরা তৃপ্তিহীনভাবে আবৃত্তি করে যাই সেগুলির মূল ভাবই হল বেদনাবোধ। অন্তরের গভীরতম বেদনা বা উপলব্ধি চেতনার উপরিভাগে উঠে আসে বলেই এই ধরনের শের রচিত হয়েছে—

> 'ফিক্র মোমিন কী, অদা দাগ কী, গালিব কা বয়াঁ
> জোক কা রঙে-সুখন হো তো গজল হোতী হ্যয়।'

আজকের বহু প্রতিষ্ঠিত গজলগোর 'কবি হয়ে ওঠা'র ইতিহাস অন্বেষণ করলে জানা যাবে, তাঁদের প্রত্যেকেই একটি সম্ভাবনাময় শৈলী হিসেবে গজলকে ব্যবহার করেছেন। মনের বেদনা যখন ছাপিয়ে উঠতে চেয়েছে তখনই তাঁরা গজলে আশ্রয় নিয়েছেন। দুষ্যন্ত কুমার যখন বলেন, 'আধুনিক কবিতার বাগজাল ও একঘেয়েমিতায় অতিষ্ঠ হয়ে আমি গজলে আশ্রয় নিয়েছি'[১৩] তখন বুঝতে হবে তিনি গজলের প্রসরণশীলতার গুরুত্ব বুঝেছিলেন। এবং তিনি যখন বলেন, 'আমি নিজের যন্ত্রণাকে—সেই সুদুঃসহ বেদনাকে, যাতে আমার বুক ফেটে যায়—প্রকাশ করতে এবং অধিকাধিক সততা ও সমগ্রতা সহ বহুসংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে গজল লিখেছি', তখনও ধরতে হবে তিনি গজলের মেজাজ-গত সেই দ্রবণশীলতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন।

যাঁরা মনে করেন কবিতার সামাজিক দায়িত্ব নেই, তারা এই চিন্তায় আত্মতুষ্টি প্রকাশ করেন যে আধুনিক কবিতার পাঠক কম হলেও তাদের সংখ্যায় হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই। কিন্তু গজলের ক্ষেত্রে এই যুক্তি অমান্য। গজলের পাঠক বাড়ছে এবং গজলের মূল ভাবধারা—বেদনা ও হৃদয়বোধ অটুট থাকলে, ভবিষ্যতে পাঠক বাড়বে এটা নিশ্চিত। পাঠক সবসময় স্বসময়ের ও স্বহৃদয়ে মুখপাত্র খোঁজে, যে আয়নার কাজ করবে। গজল সেই আয়না। সব গজলকারই যে জনগণের জন্যে লেখেন—এটা বাড়িয়ে বলা। 'সকলের জন্যে লেখা' সবাই পড়ে না। বরং বলা উচিত গজলের ব্যক্তি প্রকাশিত হলে পাঠকের ব্যক্তি হয়ে ওঠে বলেই তার কদর।

তাই প্রশ্ন ওঠে, কে আগে?—গজল না গজলকার? গজলটি যখন আমাদের শ্রদ্ধা কেড়ে নেয় তখন তার প্রশংসা লাভ করেন অবশ্যই স্রষ্টা, গজলকার। অথচ এ-কথা সত্য যে, গজলকার ছিলেন বলেই গজল এল, যা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। গজলে যে বিশেষ কিছু একটা থাকে সেটা কী? সেটা পারসেপশন, কান আর চোখ দিয়েই আমরা গজল বুঝি। বিপরীতে বলা যায়, গজল ছিল, ছিল বলেই কবির সৃষ্টি-বেদনা এবং কবি তাকে ভ্রূণ থেকে অবয়বে রূপান্তরিত করলেন বলেই তিনি স্রষ্টা। অন্যপক্ষে গজলকারের পক্ষাবলম্বন করে বলব—

> 'জাতককে নিয়ে সবাই মেতে থাকলে জননী রাগ করে না
> বৃষ্টিকে নিয়ে সবাই মাতলে মেঘ অভিমান করে না।'

গজলের নিয়তি গজল নিজেই খুঁজে নিয়েছে। আজ যখন সাধারণ কবিতার পাঠক ডোডো পাখির মতো অবলুপ্তির পথে, তখন গজলের সম্ভাবনা আমাদের আশা জাগায়। উর্দু ও হিন্দী ভাষার অনেক কবিই সাধারণ কবিতা, নঈ কবিতা, নজম, রুবাই, দোঁহা, ছপ্পয়ের পুষ্করিণী ছেড়ে চলে আসছেন গজলের বহবতী নদীতে। দুষ্যন্ত কুমারের ভাষায়—'কৃত্রিম আধুনিকতা কবিতাকে সাধারণ পাঠকের কাছ থেকে ক্রমে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। কবিতা নিরন্তর সেলফ-আইডেনটিটি খুঁজেই চলেছে। তাই কবিরা দলে দলে গজলের দরবারে ধর্ণা দিচ্ছেন। পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ যাতে সহজ ও অটুট হয়, তাই এই ধর্না।'[১৪]

আবার পূর্ব-প্রসঙ্গে ফিরে আসি। গজলের জটিল নির্মাণভূমির ইতিহাস আলোচনার মধ্যে দিয়ে গজলের 'উৎস' সম্পর্কে কিছু তথ্য জানানো সম্ভব হয়েছে বলে ধরে নিতে পারি। কিন্তু ফর্মালিজমের এই কচকচিতে তার 'ব্যাকরণ' সম্পর্কে একটা ধারণা মিললেও, গজলের সংজ্ঞা জানা যায়নি। বস্তুত, সত্যি সত্যিই গজলের কোনো সংজ্ঞা আছে কি না, তা-ও জানা যায়নি। সাহিত্যের বহমান ধারাতে যে নিরন্তর পরিবর্তন ঘটে চলেছে—তাতে কোনো সাহিত্য প্রকরণের যথাযথ সংজ্ঞা স্থিত হতে পারে না বলে আমার বিশ্বাস। কাব্যশাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে গজলের কোনো নিশ্চিত ছান্দিক ছাঁচ কখনও ছিল না, এখনও নেই। এক মুহূর্ত এর দাঁড়াবার অবকাশ নেই। যার গতি এমনই তীব্র যে কোনো একটি সংজ্ঞা প্রদত্ত হলে, পরক্ষণেই তার আমূলপ্রোথিত ভিতটুকু নড়ে যায়। আসলে, গজল একটি কাব্যশৈলী, 'উক্তিপরক' ধরনের গীতিশৈলী। কবিতার 'অর্থ' যেমন নিশ্চল নির্দিষ্ট পদার্থ নয়, গজলও তেমনি একটা বেগ, গতির বেগ—যা কাব্যশব্দসমূহকে আমাদের কাছে হাজির করে আবার হাওয়ার মতো উড়িয়ে দেয়। আমাদের মন দূর থেকে দূরে চলতে থাকে। কবির দায়িত্ব যেখানে শেষ, আমরা সেখানে থামতে পারি না। গজল এমনই এক অবিশ্লেষ্য বস্তু যা ব্যক্তের মধ্যে অব্যক্তকে, বস্তুর মধ্যে অনির্বচনীয়কে ধারণ করে পাঠকের অভিনিবেশ দাবি করে। স্রষ্টার গল্পটি ফুরোলেও পাঠকের কাছে নটে গাছটি সহজে মুড়োয় না।

এমন অবিশ্লেষ্য ও জটিল জিনিশের কোনো একটি সর্বমান্য সংজ্ঞা নির্ধারণ সম্ভব নয়। একুশ শতকে দাঁড়িয়ে যদি বলি গজল মানেই 'নারী-পুরুষের প্রেমালাপ' বা 'রমণীর সঙ্গে বার্তালাপ', তাহলে আমি ক্ষমারও অযোগ্য। যদি বলি 'গজল হল আত্ম-জিজ্ঞাসা, আত্মচেতনা এবং আত্মঅভিজ্ঞানের সন্ধানী আলো ফেলার যন্ত্র' কিংবা যদি বলা হয়, 'গজল হল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামী হাতিয়ার,' তা হবে ব্যক্তিগত উপলব্ধির প্রকাশ। সংজ্ঞা যতই 'ব্যাপক' হোক তা সংকীর্ণ হতে বাধ্য। গজলের গজলত্ব তার সুনিপুণ নির্মিতিতে—অনন্য

রূপবন্ধে, অনুপম রসৈকভাবনায়। গজল এমনই অনন্য, স্বতন্ত্র ও অভিনব যে, কোনো একটি সংজ্ঞার শেকলে বেঁধে তাকে সীমায়িত করা সম্ভব নয়।

উর্দু গজল

পুনরুক্তি হবে, তবু বর্তমান অধ্যায়ের সূচনায় গোপীচাঁদ নারঙ্গের কথাটাই রিপিট করতে হচ্ছে 'The ghazal is a marvel of the magnetic dynamism of *husn o i'shq* (beauty and live) in highly charged metaphoric idiom. It is a celebration of love and freedom in an ambience of pure ecstasy and unremitting joy as well profound capacity for enduring pain and suffering. The ghazal is the soul of Urdu poetry and the play of creativity at its peak.'[১৫]

উর্দু কাব্যসাহিত্য এক বিরাট মহীরূহ। তার শাখা-প্রশাখাগুলিকে পল্লবিত করেছে গজল, কাশিদা, রুবাই, নজম, মসনবি, মর্সিয়া, গজল প্রভৃতি বিভিন্ন শৈলী। গজলই এদের মধ্যে সবচেয়ে ফ্রেশ বা তাজা। তাজা হলেও আদৌ নবজাত বা কচি নয়। উর্দু শায়রির সর্বাপেক্ষা অনুপম ও নিটোল শৈলী বললেও অত্যুক্তি হয় না। পারস্য দেশে গজলের জন্ম ঘটেছে ঠিক কথা, কিন্তু একে সুন্দর ও সুঠাম অলঙ্কার দিয়ে সালঙ্করা করেছেন ভারতবর্ষের উর্দু কবিরাই।[১৬] গজল আজ উর্দু কাব্যসাহিত্যের আত্মা রূপে পরিজ্ঞাত এবং উর্দু কবি-শায়রদের মননবিশ্বে সরাসরি শীর্ষে তার অবস্থান। উর্দু অদবের গুলবাগিচায় সবচেয়ে নাজনীন ফুলটির নামই গজল।

উর্দু গজলের উদ্ভবকালটিকে চিহ্নিত করা অতিশয় দুরূহ। ভাষা হিশেবে পরিগণিত হবার[১৭] অনেক আগে থেকেই উর্দুতে গজল লেখা হচ্ছে, কিন্তু ঠিক কখন থেকে তার প্রামাণিক হদিশ দেওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তবে, এ কথা অবশ্যই উল্লেখ্য যে গজলের সূচনা পারস্যের 'কাশিদা' থেকে, যা কালক্রমে 'গজলে' রূপান্তরিত হয়। আব্বাসীয় জমানায় আরবীয় সংস্কৃতি ফার্সি সংস্কৃতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল। কাব্যসাহিত্যে, বিশেষত কাশিদায় সেই প্রভাব সুদূরপ্রসারী বদল আনতে সহায়ক হয়েছিল। ফার্সি ভাষায় তখন এক বিশেষ ছন্দে কবিতা লেখা হতো, তারই নাম গজল। এর বিষয় ছিল প্রেম ও সৌন্দর্য, যা আরবীয় শায়রদের অতি সহজেই আকৃষ্ট করেছিল। তাঁরা ঐ ছন্দ ব্যবহার করলেন কাশিদায় এবং তারই মোহে পড়ল রাউর-সম্প্রদায়।[১৮] পেশাগত ভাবে গাইয়ে হওয়ার দরুন কাশিদাকে তারা গান হিশেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে অর্জিত হয় এর জনপ্রিয়তা। গানগুলিতে এমন জাদু ছিল যা শুনলে শ্রোতার মন কখনও ভক্তিতে বিগলিত, কখনও করুণায় আদ্র, কখনও-বা উৎসাহে উদ্দীপ্ত, আবার কখনও হয়ত বেদনায় দ্রাবিত হয়ে উঠত। আরবীয় ধর্মপ্রচারক কবিরা ঐ গানকেই বয়ে আনলেন ভারতবর্ষে।

আরবে উৎপত্তি হলেও ফার্সি ভাষায় এই বিশেষ জঁরটির যথাযথ বিকাশ ঘটে। যদিও জন্মলগ্নে এই ভ্রূণটির নাম ছিল 'কাসিদা' বা 'কাশিদা'। কাশিদার শাব্দিক অর্থ এমব্র্যাসি বা হেম স্টিচ। বাংলায় যাকে বলে, ঝুলপি-সেলাই; আর হিন্দীতে কাপড়ে বেল-বুটি বসানোর কাজ, যেমন 'কসিদা কাঢ়না'। অথচ এখানে যে অর্থে 'কাশিদা', তার সঙ্গে সূচীকর্ম বা বোনাবুনির কোনো যোগ নেই। আরবি শব্দ 'কাসাদ' থেকে এর উৎপত্তি। কাসিদা একটি পুংলিঙ্গবিশিষ্ট বিশেষ্য পদ এবং এটি শায়রির এমন একটি জঁর বা রূপ, যার মাধ্যমে কারও প্রশস্তি বা প্রশংসা করা হয়। মূলত বাদশা-শাহেনশাদের প্রশস্তি গাওয়ার জন্যই লেখ্য-মাধ্যমে এর স্ফুরণ ঘটেছিল। এর সঙ্গে ঈশ্বরের স্তুতি গাওয়ার কোনও যোগ নেই। ইসলাম আগমনের বহু আগে থেকেই আরবে কাসিদা লেখা ও গাওয়া হতো। গোড়ার দিকে ফার্সি-উর্দু কাসিদা লেখা হতো সতেরো চরণে, যাতে থাকত প্রশংসা, নিন্দা অথবা উপদেশের ভাব। কাসিদা লেখকদের বলা হতো 'কাসিদাগো' আর যাঁরা কাসিদা পাঠ

করতেন, তাঁরা ছিলেন 'কাসিদাখাঁ'। গোড়ার দিকে ইমাম গজালী, মৌলানা জালালুদ্দিন রুমী, হাফিজ সিরাজী, ফারুখউদ্দিন আত্তার, হাকিম শানাঈ প্রমুখ এই নবপ্রসূত জঁরটির অনুশীলন করে বেশ সুনাম অর্জন করেন।

সেটা হিজরীর নবম শতক। ভারতবর্ষের ধর্মভূমিতে তখন সুফিমতের[১৯] জল সপ-সপ করছে। বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের চিন্তাধারা মিলেছে সুফিবাদে। এ ধর্ম কোনও মুদ্রাঙ্কিত মতবাদ নয়, তা অনাদিকালের, আত্মজ্ঞান উপলব্ধির আশ্রয়। সুফিসাধকেরা সেই ঈশ্বরের উপাসক নন যে থাকে মসজিদে মন্দিরে গির্জায়। ঈশ্বরকে এঁরা 'প্রিয়তমা' রূপে বরণ করেছেন। বস্তুত, কোরানের ওপর ভর করে, ভারতীয় ও গ্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে গাঁঠছড়া বেঁধে এঁরা এক নতুন ইসলামিক সমাজের ভগীরথ হতে চেয়েছিলেন। ফলে বেধেছিল শরিয়তী চিন্তার সঙ্গে সংঘাত। ঠিক এই পৃষ্ঠভূমিতে সংস্কৃতির আসরে গজলের অনুপ্রবেশ ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। সংস্কৃতি যেহেতু ধর্মেরও একটি বাহন, তাই গজলকে সুফি প্রভাব থেকে অচ্ছুৎ রাখা সম্ভব হয়নি। সুফিবাদীরাই গজলকে সাহিত্যিক রূপ প্রদান করেন।

ভারতবর্ষে এত-এত ভাষা থাকতে শুধুমাত্র উর্দুর গুলবাগিচাতেই কেন এমন বিপুল পরিমাণ গজলের ফুল ফুটেছে? জবাব ঢুঁড়তে গিয়ে আমরা পাচ্ছি, তখন এদেশে প্রধান কথ্যভাষা ছিল খড়ীবোলি। খড়ী থেকেই সাহিত্যিক হিন্দী আর উর্দুর জন্ম। হিন্দী কাব্যজগতে তখন কবিত্ত, সবৈয়া, সোরঠা, দোহা প্রভৃতি ছন্দ সুপ্রতিষ্ঠিত। হিন্দী তার সেই সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে ভুলতে পারেনি বহুকাল। বিশেষত, অওধি ও ব্রজভাষা কাব্যসাহিত্য এমন সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল যে তার মায়া কাটিয়ে ওঠা একরকম দুষ্করই ছিল, অধিকন্তু অসম্ভব। তাই পুরাতনী ভাষা ও ধারার ছন্দকে পাশ কাটিয়ে হিন্দী এই নতুন কাব্যরীতি বা ছন্দকে আবাহন জানাতে পারেনি। আর উর্দু যেহেতু তখনও তেমন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেনি, তাই গজল পেলো তার কাছে উষ্ণ আমন্ত্রণ। শুধু আমন্ত্রণ বললে ভুল হবে; বলা উচিত, উর্দু নিজস্ব সাম্রাজ্যের পঞ্চাশ শতাংশই ছেড়ে দিল গজলের অধিকারে।

আর-একটি লেজুড়-প্রশ্ন পাঠকের মনে জাগতে পারে। যে, উর্দুতে এত-এত অপরূপ ছন্দ থাকতে শেষাবধি গজলই কেন এমন মঞ্জরিত হয়ে উঠল! রুবাই, নজম, মসনবী, কাশিদা ইত্যাদির তুলনায়, বরং সবচেয়ে বেশি ঐতিহাসিক মর্যাদা গজলের ভাগ্যেই জুটল কীভাবে? এর একটা বড়ো কারণ, গজল পারস্য দেশেও জনপ্রিয় কাব্যরূপ হিশেবে পরিগণিত ছিল আগে থেকেই। সে দেশে খাজা হাফিজ সিরাজীর (১৩২৫-১৩৯০) নামডাক গজলেরই জন্য। আনুমানিক ১৩৩০ খৃস্টাব্দে হাফিজ ইরানের সাংস্কৃতিক রাজধানী সিরাজ শহরে জন্মেছিলেন। ইসলামিক রাষ্ট্র হওয়া সত্বে সিরাজ ছিল কবিদেরই শহর, পুষ্পবাগিচার শহর, ফুল আর কোয়েলের শহর, আর মদের শহর। হয়ত এই সেই অমোঘ কারণ, যার দরুন সত্তর বছর বয়স অবধি হাফিজ নিরন্তর ও অসংখ্য গজল লিখতে পেরেছিলেন। এমনকি, তাঁর গজলে বঙ্গদেশেরও উল্লেখ মেলে : 'সুদূর ভারতের তোতাপাখি', 'রূপসী বাঙলায় আনা পারসি মিঠাই' ইত্যাদি।[২০] পারস্যের সময়টা ছিল অপরিমেয় উত্তপ্ত, অশান্ত ও কঠিন। লাঠালাঠি, রক্তারক্তি লেগেই থাকত। বাকবিতণ্ডা আর রাষ্ট্রদ্রোহের দরুণ রাজারাজড়ারা কেউই গুছিয়ে রাজপাট চালাতে পারেননি। সংঘাত আর বিসংবাদ হাফিজের চক্ষুশীল ছিল। তাঁর অন্বিষ্ট ছিল সত্য, সততা ও ঐক্য। সিসৃক্ষায় সেই আকাঙ্খাকে টেনে এনে তিনি তাঁর কবিতাকে দিয়েছেন স্বতন্ত্র দীপ্তি। দ্ব্যর্থকতা, পাশাপাশি সমান্তরাল প্রয়োগ, অনুপ্রাস, উপমা, রূপক ইত্যাদির মধ্যে বিশেষ জোর দিয়েছেন দ্ব্যর্থকতায়। তাঁর কবিতায় ও গজলে রহস্যময় প্রেম ও ভক্তির সমন্বয়, যা মূলত সুফিবাদের অন্যতম স্তম্ভ। এছাড়া তাঁর মধ্যে ছিল লোকশ্রুতি আর লৌকিক প্রবাদের প্রতি অগাধ আনুগত্য। হাফিজের গজলগুলি আকারে ছোটো এবং গীতোপযোগী। 'ইশকে'র পাশাপাশি 'শরাব'ও তাঁর উপজীব্য। বলা যায় পারস্যে গজলের রাজত্বই শুরু হয়েছিল হাফিজ সিরাজী থেকে। ইতিপূর্বে সে-দেশে খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে লেখ্য-গজল প্রথম তার প্রায় নিখুঁত রূপটি খুঁজে পেয়েছিল সমকালের আর-এক প্রকাণ্ড ইরানী কবি শেখ সাদীর মাধ্যমে। পরবর্তী কালে হাফিজ সিরাজী তাকে ভিন্ন ছাঁচে গড়ে নিয়ে প্রায় অসাধ্য সাধন

করেছেন। পারস্যের মানুষ যখন শ্লোক-দোহার দেশে, অর্থাৎ ভারতের ভূমিতে পদার্পণ করল তখন খুঁজে পেলো তার উপযুক্ত উর্বরা জমি।

উর্দু কাব্যসাহিত্যে গজল সর্বাপেক্ষা বেশি বিকশিত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ, নজম কিংবা কাশিদায় যে-কথা বলতে খরচ হয় বিশ-পঁচিশ লাইন, তা গজলের মাত্র একটি শেরেই ব্যক্ত করা অতি সহজসিদ্ধ। গজলের দুনিয়া এমন এক সুউচ্চ চূড়া যার নাগাল পাওয়া উর্দুর অন্য কোনো কাব্যশৈলীর পক্ষে অসম্ভব। ওয়লি দখিনির (১৬৬৭-১৭০৭) ভাষায় : 'বিন নিঁদ উন আঁখিয়োঁ কো পকড় কৌন সকেগা?' বাংলায় বলব, 'গগন নহিলে তোমায় ধরিত কেবা?' এ উপমাও বিন্দুমাত্র অসংগত হবে না যে গজল এমনই এক ব্যারোমিটার যাতে উর্দু কাব্য-পরিমণ্ডলের সব ক'টি মেজাজ ও ঋতুচক্রের খুঁটিনাটি ধরা পড়ে।

বস্তুত, ভারতীয় সাহিত্যরাজ্যে গজলের সংবৃত্তি বা সূচনা এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে যখন এই উপমহাদেশে ভাষা ও সাহিত্য তথা সংস্কৃতি ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক রাহুর যাদুটোনায় হয়ে পড়েছিল একুনে মোহাচ্ছন্ন। গজল সেই জীয়নকাঠি যা মানুষের প্রাণনে নিষেক করল নতুন আস্তিত্বিক চেতনা, প্রেমময় দৃষ্টি এবং অন্তঃস্যন্দী মানবতার তরস্বান তোড়।

খানিক পেছনে ফিরে যাই। ইতিহাসের যে-লগ্নে ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন ও আগ্রাসন শুরু হয়েছিল এবং যার ফলস্বরূপ এই উপমহাদেশে কম্পোজিট কালচারের সূচনা, সেই একই কালপটে আমরা হিন্দু ভক্তি আন্দোলনের মূর্তিটিকে অদূরে দণ্ডায়মান দেখতে পাই, যা ক্রমশ ভারতীয় হিন্দু মানসে বাসাও বাঁধতে শুরু করেছিল। ভারতীয় বহুত্ববাদী ও সমন্বয়ী ঐতিহ্যের এক প্রোজ্জ্বল প্রকাশ আমরা দেখতে পাই ভক্তি ও সুফি আন্দোলনের মধ্যে। দুটি আন্দোলনই বেশ কয়েক শতাব্দী জুড়ে সৃষ্টিশীল কবি, চিন্তাবিদ এবং ভারতীয় আম জনতাকে প্রভাবিত করে রেখেছিল এবং উভয়েরই একটি সর্বভারতীয় চরিত্র ছিল।

যদিও সুফি মতবাদের উদ্ভব আরবে, কিন্তু এর জন্মলগ্নেই এই মতাদর্শের ওপর যোগ, উপনিষদ ও বৌদ্ধ ধর্ম এবং বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক প্রস্তাবের গভীর প্রভাব পড়েছিল। ভারতে খৃষ্টীয় নবম-দশম শতকে ইসলাম ধর্মের অভ্যন্তরে যে প্রগতিশীল আন্দোলন শুরু হয়েছিল, সেটিই ছিল এখানকার সুফি আন্দোলন। যারা সুফ বা পশমের বস্ত্র পরিধান করে, তারাই সুফি। অর্থাৎ সুফি শব্দটির সঙ্গে 'সাফা' বা 'শুচিতা' অথবা 'পবিত্রতা'র কোনো যোগ নেই। সুফিদের মধ্যে মতাদর্শ ও তত্বগত বৈভিন্ন্যের দরুন তাঁদের পারস্পরিক বিরোধও ছিল। ভারতে সুলতানি সাম্রাজ্য পত্তনের ফলে মুসলিমদের মধ্যে ভোগবিলাস তথা ঐশ্বর্যে দাপ ও উন্মাদনা তথা নৈতিক অধঃপতন চাগিয়ে উঠলে কতিপয় ধর্মপ্রাণ মুসলমান সুফি আন্দোলনের সূত্রপাত করেন এবং গোঁড়া মুসলমানদের উষ্মা ও রোষের কোপে পড়েন। গোঁড়ারা সুফিদের সরাসরি ইসলাম-বিরোধী দাগা দিয়েছিলেন। ফলে সুফিরা আন্দোলন থেকে সরে গিয়ে জনৈক পীর বা শেখের অধীনে নিজস্ব ধর্মমঠ গড়ে তুলে নির্জনে ধর্মচর্চা শুরু করেন এবং তাঁরা হয়ে ওঠেন ফকির বা দরবেশ।

সুফিদের মূল তত্ব হলো, প্রেম ও ভক্তিই ঈশ্বরলাভের একমাত্র পথ। এঁরা কোনও বিপ্লবের প্রত্যাশা করেননি, কেবল বিশ্বাস করতেন এমন এক দিন আসবে যেদিন আল্লাহ স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে ইসলামের আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। ভারতবর্ষে বিখ্যাত সুফি সন্তদের মধ্যে গোড়ার দিকে, অর্থাৎ একাদশ শতকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন শাহ রুমি, নথর শা, গনজ বকশ প্রমুখ। রুমি বাঙলায় এসেছিলেন ১০৫৩ সালে। ময়মনসিংহের নেত্রকোণায় তাঁর মকবরা আছে। শেষোক্ত জনকে অনেকে ভারতের প্রথম সুফি সাধক বলে মান্য করেন। ভারতের দাক্ষিণাত্যে সুফি মতবাদ নিয়ে যান নথর শা। চেন্নাইয়ের ত্রিচিনপল্লীতে তাঁর সমাধিভূমি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। দ্বাদশ শতক থেকে ভারতবর্ষে সুফি সন্তদের ঢেউ আছড়ে পড়ে। আসমুদ্রহিমাচল সুফি সাধকরা ছড়িয়ে পড়েন। যাঁরা এই সময় ভারতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন চিশতি ও সুরাবর্দি সম্প্রদায়। ভারতবর্ষে সুফিদের প্রধানত তিনটি সম্প্রদায় প্রভাবশালী ছিল—দিল্লি ও দোয়াব অঞ্চলে চিশতি; সিন্ধু, পাঞ্জাব ও মুলতানে সুরাবর্দি; এবং বিহারে ফিরদৌসি। এছাড়া আরও একটি

সম্প্রদায় গড়ে ওঠে, সেটি হলো মদানি সম্প্রদায়। চিশতি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা খাজা মইনউদ্দিন চিশতি, যিনি তিনি মহম্মদ ঘুরির সময়ে মধ্য এশিয়া থেকে ভারতবর্ষে আসেন এবং আজমিরে বসবাস শুরু করেন। চিশতি সাধকদের মধ্যে নিজামউদ্দিন আউলিয়ার নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত কবি আমির খুসরো এবং ইতিহাসবিদ জিয়াউদ্দিন বরানি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। সুরাবর্দি সম্প্রদায়ের সুফিরা পাঞ্জাব, মুলতান ও বাঙলায় প্রভাবশালী ছিলেন। এঁদের মধ্যে শিহাবউদ্দিন সুরাবর্দি ও হামিদউদ্দিন নাগরি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই সম্প্রদায়ের সুফিরা চিশতিদের মতো কৃচ্ছ্রসাধনে বিশ্বাসী ছিলেন না, এঁরা এমনকি রাষ্ট্রের অধীনে ধর্মীয় উচ্চপদও গ্রহণ করতেন। এই তিন-চারটি ধারা ব্যতিরেকে সুফিদের আরও কতিপয় উল্লেখযোগ্য ধারা ছিল, এবং কতকগুলি এখনও বিদ্যমান। একাদশ শতকে বাগদাদের সৈয়দ আবদুল কাদির প্রতিষ্ঠা করেন কাদেরিয়া সম্প্রদায়। চতুর্দশ শতাব্দে উদ্ভব হয় বদিউদ্দিন শাল মদারের নেতৃত্বে মদারি সম্প্রদায়। পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে তুর্কিস্তানের খাজা বাহাউদ্দিন নক্কশ বনদ গঠন করেন নকশাবন্দি সম্প্রদায়।

সুফি আর ভক্তি মতবাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ সাদৃশ্য থাকলেও ভক্তি আন্দোলন আসলে সুফি আন্দোলনের চেয়েও প্রাচীন। উপনিষদে এর দার্শনিক ও তাত্বিক লক্ষণ সমূহের প্রতিপাদন রয়েছে। ভক্তি আন্দোলন বস্তুত হিন্দুদের সংস্কারবাদী আন্দোলন। ঈশ্বরে অগাধ ভক্তি, মানুষের ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, যাবতীয় ধর্মের সমানতার প্রচার তথা জাতি ও কর্মকাণ্ডের ভর্ৎসনা করা হয়েছে। বাস্তবত, ভক্তি আন্দোলনের প্রবর্তন দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ুতে, সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দের মাঝামাঝি সময়ে, যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল নায়ন্মার তথা আলওয়ার গোষ্ঠীদ্বয়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও মনোমালিন্য দূরীভূত করা। কথিত আছে, এই আন্দোলনের প্রথম প্রচারক নাকি শঙ্করাচার্য। ধর্মভিত্তিক হলেও, ভক্তি আন্দোলন অচিরেই গণচরিত্র অর্জন করেছিল। এই চরিত্র অর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল সংগীত তথা সহায়ক বাদ্যযন্ত্র। ধর্মপ্রচারক সন্তদের অধিকাংশই ছিলেন কবি ও গায়ক।

পরবর্তীকালে ভারতে ইসলাম ধর্ম প্রসারের ফলে হিন্দু ধর্ম ও সমাজে উদ্বেগ ও অস্থিরতা দেখা দিলে এই আন্দোলন পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মুসলিম শাসকেরা গদি জাঁকিয়ে বসলে হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম বরণের ব্যাপক হিড়িক দেখা দেয়। ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ধর্মান্তরিত মুসলমান। যদিও এই ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়া হিন্দুধর্মের অস্তিত্ব কখনোই বিপন্ন করেনি, তবু এটি হিন্দুদের উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছিল। আত্মরক্ষা ও সমালোচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। কিন্তু হিন্দু ধর্মনেতারা অন্ধ ছিলেন না। তাঁরা নিজেদের ধর্ম ও সমাজের কিছু কিছু কুপ্রথা ও রীতিনীতির বিরোধীই ছিলেন। অন্যদিকে ইসলামের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভ্রাতৃত্ববোধও তাঁদের চোখ এড়ায়নি। ফলে হিন্দু নেতাদের একটি শ্রেণী উদারনৈতিক ধর্ম আন্দোলনের সূচনা করেন। শতাব্দীব্যাপী বিভিন্ন ধর্ম প্রচারক জনগণের মধ্যে প্রেম, মৈত্রী ও ভক্তির বাণী প্রচার করতে শুরু করেন। সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে ভক্তিবাদের পূর্ণবিকাশ ঘটেছিল। অর্থাৎ ভক্তিবাদের আদর্শ সুলতানি সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের আগেই উত্থান ঘটেছিল। তবে ইসলামের সংস্পর্শে আসার দরুন ভক্তিবাদ এক নতুন মাত্র পায়। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে ভক্তিবাদের প্রসার তার সাক্ষ্য দেয়। বিভিন্ন ধর্মপ্রচারক এই শুভকর্মে জড়িয়ে পড়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে রামানন্দ, নামদেব, কবীর, গুরুনানক, শ্রীচৈতন্য, মহন্ত শঙ্করদেব, বল্লভাচার্য, মীরাবাঈ, দাদু প্রমুখের নাম সবিশেষ উচ্চার্য।

যে-কথা আগেও বলেছি, 'উর্দু' নামকরণের আগে, এবং পরেও, এই ভাষা স্থানবৈভিন্ন্যে নানান উপনামে চিহ্নিত ছিল। হিন্দী আর উর্দুর সংমিশ্রণ ঘটেছিল যেসব জায়গায় সেখানে এটি হিন্দুয়ী, হিঁদয়ী, হিন্দভী, জবান-এ-হিন্দ, জবান-এ-হিন্দুস্তান, হিন্দুস্তানী বোলি, রেখতা ও হিন্দী নামে পরিচিত ছিল; যা পরবর্তীতে দক্ষিণ ভারতে চিহ্নিত হয় জবান-এ-দখিনি, গুজরাতে জবান-এ-গুজারি, এবং দিল্লিতে জবান-এ-দেহলভী, তথা সমগ্র দিল্লি পরিমণ্ডলে সরাসরি উর্দু নামেই ছিল পরিচিত। বস্তুত উর্দু একটি ইন্দো-আর্য ভাষা যার উৎসমূলে রয়েছে দিল্লির জনবুলি বা ডায়লেক্ট পশ্চিমা হিন্দী। ঐ হিন্দী-উর্দু আবার খড়িবোলি নামেও সমধিক

খ্যাত। সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, ভাষার রয়েছে দুটি স্রোতধারা। কথাটি আগেও বলেছি। প্রথমটি প্লুরিসেন্ট্রিক বা পলিসেন্ট্রিক, যা আসলে একাধিক ভাষার সংমিশ্রণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ চাইনিজ, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, জারমান, কোরিয়ান, পোর্তুগিজ, স্প্যানিশ এবং তামিল। দ্বিতীয়টি মোনোসেন্ট্রিক ল্যাঙ্গুয়েজ, যার দৃষ্টান্তে স্থান পায় জাপানিজ ও রাশিয়ান ভাষা। হিন্দুস্তানীও বস্তুত দুটি স্ট্যান্ডার্ড ভাষাপদ্ধতি, আধুনিক মান্য হিন্দী এবং আধুনিক মান্য উর্দুর সংমিশ্রণে গঠিত একটি প্লুরিসেন্ট্রিক বা পলিসেন্ট্রিক ল্যাঙ্গুয়েজ।

যাই হোক, বাদশাহী আমলেই উর্দু গজলের প্রকৃত তাজপোশি সাঙ্গ হয়। হিজরীর নবম শতকে গুজরাট আর দাক্ষিণাত্যে গজলের ভ্রূণটি সাহিত্যের অন্তঃকুটিকে সংবৃত্তি লাভ করে। ভারতে এর বাহক উর্দুভাষী সুফিকবিরা একে সুন্দর ও সুঠাম কাব্যরূপ প্রদান করে একে পরিপুষ্ট করেছিলেন। বলতে পারি বাদশাহী আমলটাই ছিল রুমানিয়ৎ গজলের প্রতিপত্তির যুগ। বাদশাহরা গজলেরও বাদশা ছিলেন। সুরা, সাকি আর গজল—এই ছিল বাদশাহী ঠাটের লক্ষণ। তখনকার মাইনর ঘড়ি জন্ম দিয়েছিল একটি মেজর টাইমকে। যদিচ অতি অর্বাচীন কিছু ক্রিটিক বামনোচিত অপচেষ্টায় শিল্পের সেই অমোঘ মহাকালের মধ্যেও ঘুণ আবিষ্কার করে আত্মতুষ্টির স্বাদ উপভোগ করেন।

'তুজ লব কী সিফৎ লালে বদকশাঁ সুঁ কহুঙ্গা
জাদু হ্যয় তেরে নয়ন গজলা সুঁ কহুঙ্গা।'

ওয়লি দখিনীর এই শেরের মায়াও শেষাবধি বাদশাহী গজলের 'চক্রান্ত' ঢেকে রাখতে পারেনি উনিশ-বিশ শতকীয় সমালোচকদের কাছে। দরবারী গজলকে 'নীম ওহশী' অর্থাৎ অর্দ্ধসত্য কাব্যরূপ অবধি বলতে দ্বিধা করেন নি কলীম উল্লাহ। আবার অনেকে বাদশাহী গজলকে মুমূর্ষু সামন্তসমাজের অঙ্গ হিশেবে চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে বিষোদগারণ করেছেন। এঁদের দাবি অনেকটা অনুমোদন সাপেক্ষ। বাদশাহী গজল যে সামন্তবাদের প্রশস্তি রচনা করেছে তার প্রমাণই হলো সেইসব বাদশারা, যাঁরা গজলকে নিছক ব্যক্তিগত বিনোদনের সস্তা উপকরণ হিশেবে ব্যবহার করেছিলেন।

কিন্তু সমস্ত বাদশাই যে এমত মনোভাবের ছিলেন, বা, সমস্ত বাদশাহী গজলই সামন্তপন্থী—এ অপবাদ মেনে নেওয়া যায় না। বাদশারা বাঈজী আর গজল-ঠুংরির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন ঠিক কথা, কিন্তু গজলের কাছ থেকে শায়রদের একাধিপত্য কেড়ে নেননি। যে মুঘলরা একদা হামলাবাজের বেশে এসেছিল, তারাই একসময় 'ভারতীয়' বলে নিজেদের পরিচয় জাহির করেছে। সুফিকবিদের অনেকেই শরিয়তী ইসলামের খড়গাঘাতে বলি হয়েছিলেন, একমাত্র মুঘল সম্রাটদের বশংবদ ও বেতনভুক দরবারী কবিরাই আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা যা-কিছুই লিখেছেন সবই সামন্তবাদী, এ-অভিযোগ অতিশয় অযৌক্তিক। কতিপয় সমালোচক মীর-গালিবের মত কাব্য-মহীরূহদেরও বর্জনের জন্য কম্বুক কণ্ঠে দাবি জানিয়েছিলেন, তা একেবারেই হাস্যকর। এঁরা যে নির্দিষ্ট যুগের মাপকাঠিতে গজলকে বিচার করছেন, সে-যুগেই তো মীর গালিব জিগর য়্যাগানা প্রমুখ নিজ-নিজ সৃষ্টিকে ভিন্ন-ভিন্ন সুরব্যঞ্জনায় পরিস্ফুট করে তুলেছিলেন, এতদাবস্থায় এই অভিযোগ আদৌ ধোপে টেকে? এ-কথা ঠিক যে গজলের জন্ম সামন্তযুগের প্রথমার্ধে, কিন্তু সে-যুগেও সামন্ত-প্রভাব-বহির্ভূত এবং সামন্তবিরোধী গজলও অজস্র লেখা হয়েছে।

আধুনিক উর্দু গজল নিয়েও সমালোচকদের মধ্যে ক্ষোভ আছে। হিন্দীভাষার যুগনায়ক আচার্য পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন একদা বলেছিলেন : 'উর্দু গজল আরব-ইরানীয় তহজীবের প্রতীক। তাতে বীরের উপমা দেওয়া হয় রুস্তম, সোহরাব, অফ্রসিয়াবকে; কখনও ভীম-অর্জুনের উল্লেখ দেখতে পাই না। উর্দু গজলে নদী মানেই আরব-মেসোপটেমিয়ার নদী, গঙ্গ-যমুনা নয়। সেখানে ফুল মানে নার্গিস। পাখি মানে বুলবুল, ভারতের ময়ূর নয়। ওরা লখনউকে ইরানের অশবাঁ বানাতে চায়।'[২১] এটি ছিদ্রান্বেষী দ্রষ্টার কথা। মুসলিম ভারতবিজেতারা 'হিন্দুয়ানাইজড' হননি বলে ট্যান্ডনজীর এই ক্ষোভ।

কিন্তু হিন্দুত্বপ্রাপ্তির সঙ্গে গজলের এইসব প্রতীকী শব্দ ব্যবহারের কোনো যোগসূত্র আছে বলে মনে হয় না। মুসলমানেরা এ দেশে এসেছিল তাদের একটি উন্নততর সভ্যতাকে সঙ্গে নিয়েই। থেকেছে তারই

ক্রোড়ে। এবং তারা 'আমরাও ভারতীয়' বলে যতই ঘোষণা করুক 'বিলায়েৎ'-চিন্তা (স্বাদেশিকতা) ততই তাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। তুর্কি, আফগান, মোগল, পারসিক—কোনো মুসলিম শাসকই নিজেদের বিলায়েতি রীতি-সংস্কার বা ধর্ম-ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করে হিন্দুত্ব গ্রহণের পক্ষপাতি ছিলেন না। 'মুসলিম বিজেতারা হিন্দু সংস্কৃতি বা সভ্যতা সম্পর্কে প্রশংসাসূচক মনোভাব পোষণ করতেন না। তাঁদের হিন্দুত্বপ্রাপ্তির প্রশ্ন তো একেবারেই উদ্ভট।'[২২] ট্যান্ডনজীর ধারণা ইসলমা ও বিলায়েৎ অবচেতনারই প্রকাশ ঘটেছে উর্দু গজলে, সাকী শরাব জাম গুলোগুলিস্তাঁ রেগিস্তান উট কাফেলা খর্জুরবীথি আঙুর শিরিণচাঁদ নওয়াজ সওগাত প্রভৃতি প্রতীক সমূহের মাধ্যমে। এই কারণে উর্দু গজলকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন : 'রাষ্ট্রবিরোধী'। এতদসত্বেও, সেই ট্যান্ডন সাহেবই যখন বলেন, 'আমি উর্দু গজল ভালোবাসি', তখন জানতে ইচ্ছে করে এই 'রাষ্ট্র-বিরোধী' কাব্যশৈলীতে এমন কী কুসুমাসব আছে যা তাঁর ভালো লাগে!!

উর্দু গজল যে রাষ্ট্রবিরোধী বা হিন্দুবিদ্বেষী নয়, তার অজস্র প্রমাণের মধ্যে একটি এখানে উদাহৃত করছি। পাঠকের সম্ভবত জানা আছে, হালি আর ইকবাল ছিলেন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উপাসক। হিন্দু-মুসলমানের বিচ্ছিন্নতার বেদনা রূপ পেয়েছে হালির এই কবিতায়,—

'অয় বতন অয় মেরে বহিশতে বরীঁ
ক্যা হুয়ে তেরে আসমাঁ ঔ জমীঁ
রাত অওর দিন কা উও সমাঁ ন রহা
উও জমীঁ অওর আসমাঁ ন রহা।'

এর পরেও যাঁরা উর্দু গজলের স্বাদেশিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করেন তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিই স্যর ইকবালের সেই বিখ্যাত পংক্তি : 'সারে জহাঁ সে অচ্ছা হিন্দোস্তাঁ হমারা'। যাঁরা উর্দু গজলকে আরব-ইরানের সাংস্কৃতিক প্রতীক বলে চিহ্নিত করতে চান তাঁদের জ্ঞাতার্থে বিখ্যাত শায়র নজীরের একটি কৃষ্ণলীলা বর্ণনার উদ্ধৃতি তুলে ধরি—

'য়্যারী সুনো য়ে দধি কে লুটৈয়া কা বালপন
ঔ মধুপুরী নগর কে রসইয়া কা বালপন,
মোহনস্বরূপ নৃত্য করইয়া কা বালপন
ক্যা-ক্যা কহুঁ ম্যঁয় কৃষ্ণ-কনহইয়া কা বালপন।'

বস্তুত, উর্দু গজল ভারতবর্ষের খিলাফৎ কখনো করেনি। পরিবর্তন সাহিত্য-শিল্পের প্রাকৃতিক ধর্ম। গজলেও এই প্রকৃতি বিদ্যমান। উর্দু গজলের ক্ষেত্রে দেশীয়-অন্তর্দেশীয় চেতনা সহ রাজনৈতিক প্রভাব, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তত্ববোধ, বিচিত্র মানসিক জটিলতার সহাবস্থান দুর্লক্ষ্য নয়। পলাশীর যুদ্ধ, ক্রিপসের আগমন, দেশবিভাগ, গান্ধী হত্যা, ইন্দিরা-রাজীব হত্যা, কৃষক-মজদুর আন্দোলন—ইত্যাদি সমস্ত ঘটনার ছবিই গজলে ফুটেছে। এগুলিকে 'রাষ্ট্রবিরোধী' বলে বহিষ্কারের দাবি শুধু অযৌক্তিকই নয়, অপরাধও।

শায়রে-আজম ফিরাক গোরখপুরী উর্দু গজলের জগৎকে বলেছেন : 'সদা বহার সদা সোহাগের দুনিয়া'। গজলসম্রাট প্রাচীন বা গোড়ার দিকের গজলের রূপক ও কল্পনা প্রবণতাকে লক্ষ্য করেই হয়ত এই মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু আজকের গজল-বিশ্বে নিছক সদা স্ফূর্তি সদা বসন্ত নেই। আছে জীবনের জীবনের রুক্ষতাও—নদীনালা, খেতখামার, আছে শোষণবিরোধী স্লোগানও। এ যুগের গজল শুধুই ইশক (প্রেম) আর হুসনের (রূপ) তহজীব নয়। বিশ শতকের উর্দু সাহিত্যে ফিরাকের যে স্থান, সেখান থেকে কেউ ব্যক্তিগত অভীপ্সায় তাঁকে চ্যুত করতে করতে পারবে না। তাই সম্রাটের আসনে বসে তিনি যে আশ্চর্য সুন্দর ভাষায় গজলের কপালে কলঙ্কের কৃষ্ণতিলক এঁকে দিয়েছিলেন, তা আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত করে বইকি! কিন্তু সত্য চির-সমুজ্জ্বল। তার আলোকস্পর্শে সম্রাটের উক্তির তলায় পূজার ফুল চিরকাল দলিত মথিত হয়ে পড়ে থাকতে পারে না। বস্তুত, যে বিচিত্রমুখী গজল উর্দু সাহিত্যকে গতিমুক্ত করেছে, যার প্রাণরসে সে অভাবিত সমৃদ্ধিতে পূর্ণ বিকশিত হয়েছে, সেই সাহিত্যের ধারায় তাকে সম্বর্ধিত না করে উপায় নেই।

যাই হোক। আমরা আবার মূল আলোচনায় ফিরে আসি।গোড়ার দিকে যাঁরা গজলকে উন্নীত হতে মদত যোগান তাঁরা কিন্তু প্রায় সকলেই ছিলেন দাক্ষিণাত্যের, অর্থাৎ দখিনি ভাষার কবি। যেমন হায়দরাবাদের কুতুব বংশের খ্যাতিমান অধীশ্বর সুলতান মহম্মদ কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১২), মোলা ওজহী (১৭ শতকের গোড়ার দিকে), মৌলা নুসরতী, দায়েম গওয়াসি (উভয়েই ১৭ শতকের), ওয়লি মোহম্মদ ওয়লি (ওয়লি দখিনি; ১৬৬৭-১৭০৭) এবং সিরাজ অওরঙ্গাবাদী (১৭১৫-১৭৬৩)।

দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজদরবারে মুহম্মদ কুলি কুতুব শাহ, মুহম্মদ কুতুবশাহ, আবদুল্লাহ কুতুবশাহ, আলি আদিলশাহ সানি প্রমুখ প্রাচীনতম গজলকার হিশেবে অভিনন্দিত। মুহম্মদ কুলি কুতুব শাহ ছিলেন দক্ষিণ ভারতের গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী বংশের পঞ্চম সুলতান। তিনি তাঁর শাসনকালে (১৫৮০-১৬১১) হায়দরাবাদ শহর এবং সুপ্রসিদ্ধ চারমিনার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ভাইপো ও জামাতা সুলতান মুহম্মদ কুতুব শাহ কুতুবরাজবংশের অধীন গোলকুণ্ডার ষষ্ঠতম শাসক (১৬১১-১৬২৫) ছিলেন। তাঁর পুত্র আবদুল্লা কুতুবশাহ (১৬২৬-১৬৭২) ছিলেন পরবর্তী শাসক। কুলি কুতুব শাহ আরবি, ফার্সি ও তেলুগু ভাষার পণ্ডিত ছিলেন। উর্দু, ফার্সি ও তেলুগু ভাষায় তিনি অসংখ্য কবিতা রচনা করে 'সাহেব-এ-দিওয়ান' খেতাবের মালিক হন। ফার্সি-উর্দু কবিতার প্রচলিত ধারায় নতুন সংবেদনা নিয়োগ তাঁরই কীর্তি। তবে কুলি কুতুবশাহ উর্দু গজলের প্রবর্তক কিনা বলা দুরূহ। বহু পণ্ডিত তাঁর ভাষাকে 'দখিনি হিন্দীর অমর কবি' বলার পক্ষপাতি। কিন্তু জ্ঞাত গজলকারদের মধ্যে তিনি যে সবচেয়ে প্রাচীন তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর কবিতায় মেলে সহজ ও স্বাভাবিক ভাব। ভাষাও অত্যন্ত সহজ সরল। তাঁর ভাষায় দেশজ শব্দের প্রাধান্য থাকায় অনেকে তাঁকে হিন্দীকবি বলে চিহ্নিত করেছেন। একশ্রেণীর সমালোচক তাঁকে আদিরসের কবি বলেছেন, আবার তাঁর গীতধর্মী কবিতায় অশ্লীলতারও হদিশ পেয়েছেন। তৎকালীন গজলের সাংগীতিক রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচিত হবার উপায় নেই। কিন্তু গানের স্তর অতিক্রম করে সাহিত্যরাজ্যে গজলে এলে কুলি কুতুবশাহর আদিমরস বা অশ্লীলতার আরোহ বোধকরি তেমন উচ্চগ্রামের নয়। নরনারীর প্রেম ও যৌনবিলাসের কথা যে তাঁর গজলে শালীনতার সীমা লংঘন করেনি তা বলছি না, বরং সেখানে স্থূল রুচির পরিচয় অতিমাত্রায় প্রকট। তথাচ, অশ্লীলতা-কলঙ্কের বাইরে শুচিস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার যে প্লাবন তাঁর শায়রিতে উচ্চকিত, তার তুলনা তৎকালীন উর্দু সাহিত্যে বিরল। হিন্দীরঙে রঞ্জিত তাঁর একটি গজল উদাহৃত করছি :

'তু প্যারী ইশক ভী তেরা প্যারা
লগয়া হ্যয় বহুত তুজ জো দিল হমারা।
সখি কুছ ভী সমঝ তু দিল মেঁ অপনে
কিত্তা মিন্নত করে আশিক বেচারা।।
ছবিলী সোঁ লগয়া হ্যয় মন হমারা
কি উস বিন নই হমেঁ য়ক পল করারা।
বসন্ত খেলেঁ ইশক কে আ প্যারা
তুমহেঁ হ্যয় চাঁদ ম্যঁয় হুঁ জো সিতারা।।'

কুলি কুতুবশাহর কবিতায় সুফি মতাদর্শেরও চিহ্ন দুর্লক্ষ্য নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে, তাঁর গজল গানে আদিরসের ছোঁয়া নেই, বরং রয়েছে পবিত্র শুচিতা। এটি বিরহের আর্তি, মিলনের আকুতি। সেই সঙ্গে একটি উদাসভাব সুরের মধ্যে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ছে। সমস্ত লালসা ছাপিয়ে আধ্যাত্মিক ভাব স্বয়ং উদ্দীপিত। আসলে, লালসার ভাব এমন স্থায়ী হতে পারে না যে নিছক তাকে অবলম্বন করে শত শত বছর পরেও একটি সাহিত্য বেঁচে থাকতে পারে। কুলি কুতুবশাহর আর একটি বিখ্যাত গজলের প্রথম দুটি শের এরকম :

'পিয়া বাজ প্যায়ালা পিয়া জায়ে না,
পিয়া বাজ য়ক তিল জিয়া জায়ে না।
কহতে পিয়া বিন সবুরী করুঁ,

কহয়্যা জায়ে অম্মা কিয়া জায়ে না।।'

যেমন পারেনি মুহম্মদ কুতুবশাহ ও আবদুল্লাহ কুতুবশাহর গজল। অনেকের মতে এঁদের গজলেও আধ্যাত্মিকতা আছে। কিন্তু আমি এঁদের যে-ক'টি রচনা পড়েছি, কোথাও সেই ছাপ খুঁজে পাইনি। মোটা ভজনের ঢঙে লেখা বা স্থূল আদিরসের ক্ষুদ্রাকৃতি রচনাকে 'গজল' বলব কোন যুক্তিতে? এঁদের কলমে শুচিস্নিগ্ধ মাধুর্যের অমৃতধারায় গজলের দেহ সিক্ত না হয়ে আরব্যরজনীর তত্বগন্ধী স্থূলত্ব সন্নিবেশিত দেখতে পাই। দৃষ্টান্ত দেওয়া থেকে বিরত থাকলাম। বরং দাক্ষিণাত্যের তৎকালীন দরবারী কবি মুল্লা ওজহী (মৃত্যু ১৬৫৯) আমদের অভিনিবেশ দাবি করেন। মোল্লা ওজহীর গজলের বিষয়—অপ্রাকৃত প্রেম ও জ্বালা, যা পাঠকের বুকে গভীর আঁচড় কেটে দেয় :

''জিস য়্যার কো ম্যঁয় মংতী হুঁ য়্যার ওহ কহাঁ হ্যয়
সরসোঁ সকী চল জাতী বলে ঠার কহাঁ হ্যয়।
দিল রাত মেঁ থে ছীন লেকর নাট গয়া হ্যয়
উও য়্যার দগাবাজ ঘুঁটে মার কহাঁ হ্যয়।
আশিক তো মুজ এ্যয়সে সকী লাখোঁ হ্যঁয় লেকিন
মাশুক সে ইস দওর মেঁ ইস সার কহাঁ হ্যয়।'

মুল্লা ওজহীর সমীপকালীন কবি মুল্লা গওয়াসি। তখনকার দক্ষিণী দরবার সমূহে অন্যতম আকর্ষণ ছিল এই দুই কবির গজলের প্রতিযোগিতা। একজন চাপান গাইতেন, অন্যজন উতোর। এই আরোহন-অবরোহণের ব্যাপারটা অনেকটা বাংলা কবিগানের মতো। ওজহী ও গওয়াসির মধ্যে এই ধরনের সওয়াল-জবাব চলত। গওয়াসি সেই সময় সবচেয়ে সফল, সিদ্ধহস্ত, সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ কবি রূপে চিহ্নিত ছিলেন। তিনি মূলত কাশিদার কবি, কিন্তু গজলেও অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন—

'ইশক কী আগ মেঁ জলকর খাক হোনা
ইশকবাজী মেঁ চাক-চাক হোনা,
খান হোনা তো সচ হ্যয় আখির কো
খাক ন হুয়ে বীচ খাক হোনা।
উস সজ্জন কী বিসাল কী খাতির
আরজু দিল মেঁ লাক-লাক হোনা,
হ্যয় গওয়াসি য়ো আশিকানা গজল
য়ো গজল সুনে দর্দনাক হোনা।'

পরবর্তী কালে দাক্ষিণাত্যে বিখ্যাত হন কবি নুসরতী দখিনী, হিন্দী গীতে নারীর যে রূপ ও স্বরূপ, নুসরতী তাকেই নিয়ে এসেছেন গজলে :

'বিরহী কে নস মেঁ গম জলতা হুঁ শমা নমনে
দিখলা মিয়া দরস এয় খাতর জমালী।
চন্দ্রবদন কহিয়া তো কভী মুঁ সঁভালো বোল
সূরজমুখী কহয়্যা তো কহী য়্যুঁ ন বাত জমালী।'

দখিনি হিন্দীর ঐ সময়ের অন্যান্য বিশিষ্ট গজলকারের মধ্যে আবদুল রজ্জাক মুনশি, মুহম্মদ হুসৈনি মুজ্জঅম, খাস খাঁ, বাবা শাহ হুসৈনী, মীরাঁ ইয়াকুব, গোহরী, মির্জা দাউদ, সিরাজ অওরঙ্গাবাদী প্রমুখের নাম উল্লেখ্য।

দক্ষিণী গজল রাজাশ্রয়ে পল্লবিত হয়েছে। তাই এর ওপর দরবারী সংস্কৃতির ছাপ খুব স্পষ্ট। দাক্ষিণাত্যের কবিদের মধ্যে প্রাজ্ঞ থেকে চতুর, ঋষি থেকে মনীষী, বাদশা থেকে ফকির সমস্ত ধরনের বুদ্ধিমত্তর সমস্ত স্তরই পরিলক্ষিত। সকলের গজলেই বর্ণিতব্য বিষয় প্রেম ও প্রিয়তমা। কিন্তু শিল্পদৃষ্টিতে অভিনন্দিত হবার

মতো সৃষ্টি অল্পই আছে। তবে, আরও একজনের নাম না করলে দখিনি গজলের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তিনি হলেন ওয়লি মোহম্মদ ওয়লি ওরফে ওয়লি দখিনি (১৬৬৭-১৭০৭)। বলে রাখি, তিনটি লাক্ষণিক বৈশিষ্ট্য—স্থানীয় ভাষা ও শব্দ, উপমা তথা রূপকের সাজুয্য প্রয়োগ, এর দরুন দখিনি ভাষার ধরিত্রপুত্র কবিরা কালক্রমে রাজ-অনুগ্রহ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের সুদূর দক্ষিণ ভারত অবধি বিস্তৃত হওয়াও দখিনি কবিতার জনগ্রাহ্যতার আর একটি বড়ো কারণ। ওয়লি মহম্মদ ওয়লি ওরফে ওয়লি দখিনি, যিনি ওয়লি গুজরাতি এবং ওয়লি অওরঙ্গাবাদী নামেও সমধিক খ্যাত, জন্মসূত্রে ছিলেন মহারাষ্ট্রের অওরাঙ্গাবাদ নিবাসী। তিনি ছিলেন উর্দুর ধ্রুপদী ঘরানার কবি এবং তাঁকে বলা হতো 'ফাদার অফ উর্দু পোয়েট্রি'। ওয়লির আগে অবধি দক্ষিণ এশিয়ার উর্দু কবিতা এবং গজল ফার্সীতে রচিত হতো এবং তাতে সাদদি, জামী তথা রুক্কানি প্রমুখ ফার্সি পণ্ডিতদের ধরন-ধারণ ও শৈলী অনুসৃত ও পুনরাবৃত্তি একধরনের একঘেয়েমি এনে দিয়েছিল। ওয়লিই সেখানে প্রথম আনলেন বদল। তাঁর কবিতা দখিনির লাক্ষণিক আভায় আলোকিত। ওয়লি কেবল একটি বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাষাই ব্যবহার করেননি, উপরন্তু তাঁর কবিতায় ভারতীয় বিষয়, প্রতিমা এবৎ চিত্রকল্পের সমন্বিত ও সফল প্রয়োগ পরিলক্ষিত। ওয়লি ঘন-ঘন দিল্লি থেকে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ থেকে দিল্লি পাড়ি জমাতেন। দিল্লিতে বসবাসকালে তিনি দিল্লি বলয়ের কবিদের মজলিশে সেগুলি পাঠ করে শোনাতেন এবং দিল্লির কবিরা বিমুগ্ধ চিত্তে সেই শৈলী নিজেদের কবিতায় প্রয়োগ করার চেষ্টা করতেন। এভাবে, দিল্লির উর্দু ভাষা ও কাব্যসাহিত্যে ওয়লির পরোক্ষ অবদান সংযোজিত হয়েছিল। ওয়লির কাব্যগ্রন্থ 'দিওয়ান' সেসময় দিল্লি বৃত্তে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং এবং সমকালীন ফার্সি কবিরা তাঁর মতো কবিতা সৃষ্টির অনুশীলন আরম্ভ করেন। ওয়লি মহম্মদ ওয়লির হাত ধরেই উর্দু গজলের প্রকৃত সূচনা। যদি বলি ওয়লি অগ্রগামীর ভূমিকা পালন করেছিলেন বলেই পরবর্তীতে জৌক, সওদা তথা মীরের মতো শক্তিশালী কবির উদভব সম্ভবপর হয়েছিল, তৃণমাত্র অতিরঞ্জন হবে না।

দিল্লির একগুচ্ছ কবি যাঁরা তখনও আমির খুসরোর ধারানুসরণ করে সমকালে চিহ্নিত 'সবকে-হিন্দী' (অর্থাউ ইন্ডিয়ানাইজড ফার্সি) ভাষাতেই তাঁদের সিসৃক্ষা জারি রেখেছিলেন; ওয়লি মহম্মদ আলি তাঁদের খালিস উর্দুতে টেনে আনেন, যদিও তখন পর্যন্ত সেটি মূলত দখিনি নামেই পরিজ্ঞাত ছিল। অতঃপর গজলের এক নতুন উত্তরণ-পর্বের সূচনা ঘটে নর্দান প্লেনে, অর্থাৎ উত্তর সমভূমির কবিদের প্রযত্নে। অর্থাৎ দেহলভী এবং লখনভী ভাষার মাধ্যমে। এভাবে আমির খুসরো, যিনি গজলের ভ্রূণ সৃষ্টি করে তাকে হিন্দভী ভাষার গর্ভে লালিত করেছিলেন, তাঁর সেই হিন্দভী ভাষাপ্রযুক্তির মোহজাল বিলুপ্ত হতে সময় লাগল সুদীর্ঘ তিনটি শতাব্দী। এরই সঙ্গে গজলের প্রথম যুগটির পরিসমাপ্তি ঘটল ঠিকই, কিন্তু এর পরপরই গজলের জীবনের অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর-একটি অধ্যায়ের সূচনা ঘটল। সেই নয়াল যুগের প্রবর্তক ওয়লি দখিনী।

হিন্দীতে একটি বাগধারা চালু আছে—'শ্রীগণেশ করা'। কথাটি 'সূচনা' অর্থে ব্যবহৃত। হিন্দু পরিবারে কোনো কাজ শুরু করার আগে গণেশপুজোর রীতি আছে। গণেশ তাদের কাছে 'মঙ্গল ও সিদ্ধির জনক' বলে সকল দেবতার আগে পূজিত হন। উর্দুতে একেই বলেছে বিসমিল্লাহ বা মহরত। উর্দু গজলের আলোচনার শুরুতে তাই কুলি কুতুব শাহ ও সহ দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য ভিত্তিপ্রস্তর সমূহের পুজো অনিবার্য ছিল। কিন্তু যাকে বলে প্রকৃত সূচনা, সেটা ঘটেছে দিল্লি দরবারে। সে-গজল আত্মপ্রকাশ করেছে দাক্ষিণাত্যের শায়র ওয়লি মোহম্মদ ওয়লি ওরফে ওয়লি দখিনীর হাতে। গঙ্গার জন্ম নাকি বিষ্ণুর দেহ থেকে এবং তাকে ব্রহ্মলোক থেকে ভূতলে আনয়ন করেছিলেন দিলীপরাজার পুত্র ভগীরথ। উর্দু গজলের ভগীরথ ওয়লি দখিনী। গুজরাত ও দক্ষিণ ভারতের সংকীর্ণ পরিসর থেকে গজলের উত্তরণ ঘটেছে দিল্লি ও উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। এদিক থেকে ওয়লি একটি সেতুর কাজ করেছেন। তিনি শুধু উর্দু গজলের সফল ভগীরথই নন, বর্ষীয়ান প্রতিপালকও। তাঁর প্রয়াণ ১৭০৭ সনে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাশিদা, মসনবী, কতএ, নজম,

রুবাই ইত্যাদি রচনার পাশাপাশি তিনি সমান কিংবা অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্ব সহকারে উর্দু সাহিত্যের এই নবীন শৈলীর চর্চা করেছেন এবং তাঁকে সাবালকত্ব প্রদান করেছেন।

তো, গজলের দ্বিতীয় যুগের সূচনা ঘটেছে ওয়লি দখিনীর হাতে। তাঁর নামের পেছনে 'দখিনী' কথাটা জুড়ে আছে নিছক দাক্ষিণাত্যে জন্ম বলে। কিন্তু গজলকার হিশেবে দক্ষিণের সঙ্গে তাঁর যোগ অতি সামান্য। তিনি মূলত দিল্লির কবি। দিল্লি দরবারেই অতিবাহিত হয়েছে গজলের স্বর্ণযুগ। লেখা বাহুল্য, এই স্বর্ণযুগ 'ইশকিয়া শায়রি'র যুগ। যে উর্দু কাব্যসাহিত্যের চোদ্দো আনাই গড়ে উঠেছে মোহব্বতকে কেন্দ্র করে, তারই পরিক্রমা হয়েছে এই যুগে। যাঁদের লেখনী এই দিকটা তুলে ধরেছে তাঁরা হলেন ওয়লি, মুবারক, মজহর, ওয়াকিফ, অসর, দাগ, শেফতা, মীর, গালিব, মোমিন, জাফর, নিজামী প্রমুখ।

উনিশ শতক ছিল একটি ঘটনাবহুল যুগ, যার ফলসমষ্টিতে সৃষ্ট হয়েছিল বাঙলার পুনরুজ্জীবন। কিন্তু তার প্রস্তুতিপর্ব হিশেবে চিহ্নিত আঠারো শতকও কম ঘটনাবহুল ছিল না। সে-ইতিহাস চিহ্নিত হয়ে আছে দুটি বৃহৎ ঘটনার দ্বারা—মুঘল সাম্রাজ্যের পতন এবং বৃটিশ শক্তির প্রসার। এর আগে-পরে অসংখ্য ছোটোবড়ো ঘটনার ঘনঘটা আঠারো শতককে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছে। যেমন, পানিপথের লড়াই, নাদির শাহর কৎল-এ-আম, কর্ণাটের যুদ্ধ, মীর জাফরের মসনদপ্রাপ্তি, বাঙলায় ইংরেজদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তার, বর্গী-হাঙ্গামা, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, কোম্পানির দেওয়ানি সনদ লাভ, ক্লাইভের দ্বৈতশাসন, ইঙ্গ-মারাঠা লাঠালাঠি, নর্থের রেগুলেটিং অ্যাক্ট, চার্টার অ্যাক্ট, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইত্যাদি। বাইরের ঘটনার আবর্তে যে মানস-রসায়ন হয় তারাই পরিচায়ক সাহিত্য। ওয়লি দখিনীর কাব্য এর উর্দ্ধে থাকেনি। তাঁর শায়রীও দেশকালের প্রতিনিধিত্ব করেছে।

কিন্তু ওয়লির খ্যাতি প্রেমের গজলের জন্য। বলা বাহুল্য, তা দেশকালের বাইরে নয়। মানুষের মনের এই সূক্ষ্মতম প্রবৃত্তির এমন নির্মল প্রকাশ ইতিপূর্বের কোনো লেখনীতে ঘটেনি :

'ওয়লি উস গৌহরে-কানে-হয়া কা বাহ ক্যা কহনা
মেরে ঘর ইস তরহ আওয়ে হ্যয় জ্যোঁ সীনে মেঁ রাজ আয়ে।'

উর্দু গজলের নবজ বা ধমনীই হলো এই ধরনের ইশকিয়া শের। ওয়লির সুফিয়ানা রঙ তাকে আরও গভীর ও নিবিড় করেছে। এই নিবিড়তা ভাষায় নয়, ভাবে। ভাষাবিচারে তিনি গজলে লঘু তরল অর্ধনাটকীয় ভঙ্গির পক্ষপাতি। হৃদয়াবেগ যেটুকু, তাও সংযত। গজলে তিনি গাঢ়বদ্ধ, কিন্তু আতিশয্য-বর্জিত। নিচের গজলাংশটি তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এখানে ছন্দে কলাচাতুর্য সহ হৃদয়মাধুর্য মিলেমিশে একাকার :

'দেখা হর সুবহ তুজ রুখাসর কা
হ্যয় মুতালা মুতলউল অনওয়ার কা
মোহ কে সীনে উপর অয় শমা রো
দাগ হ্যয় তুঝ হুসন কী ঝলকার কা।'

কিন্তু কিংবা, আর একটি পড়া যাক—

'জিসে ইশক কা তীর কারী লগে
উসে জিন্দগী ক্যুঁ ন ভারী লগে
ন ছোড়ে মোহব্বত দম-এ-মর্গ তক
জিসে য়্যার-এ-জানী সুঁ য়্যারী লগে
ন হোওয়ে উসে জগ মেঁ হরগিজ করার
জিসে ইশক কী বে-করারী লগে
হর ইক ওয়ক্ত মুঝ আশিক-এ-পাক কুঁ
প্যারে তিরী বাত প্যারী লগে
'ওয়লি' কুঁ কহে তু অগর য়ক বচন

রকীবাঁ কে দিল মেঁ কটারী লগে'

কুলি কুতুবশাহ থেকে গজলের যে প্রবাহ চলে আসছিল তা ওয়লিতে এসে একটি স্থির বিন্দুতে পরিণতি পেলো। সেই বিন্দুর নাম প্রেম। গজলের সেই উদ্ভিদ প্রেমের সলিলে সিঞ্চিত হয়ে ক্রমে ক্রমে পল্লবিত হয়ে উঠল। কিন্তু প্রেমের যে একটা আলাদা বা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষা আছে তা ওয়লির গজলে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। শুধু ওয়লি কেন, মীরের আগে অবধি সমগ্র উর্দুসাহিত্যে তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও সেই ভাষা-ব্যবহারে সাফল্য বা কুশলতা কিছুই মেলে না।

কিন্তু বিকাশের স্তর বহুবিধ। তা অবহেলার নয়। ওয়লির সমসাময়িক সদরুদ্দিন খান ওরফে ফয়েজ দেহলভীর (১৬৯০-১৭৩৭) কথাই ধরা যাক। এঁর গজলকে আঁকড়ে ছিল ওয়লির কাব্যনির্মাণ ও চিত্রকল্পের গৎ। তবুও স্বাতন্ত্র্য অস্পষ্ট নয়। এই স্বাতন্ত্র্য মানসিক তারতম্যে, গভীরতর চিন্তনে। ফয়েজের গজলের বিষয় লৌকিক সৌন্দর্য ও ভৌতপ্রেম। ভাষা সরল, শান্ত অথচ গতিশীল। সরাসরি কথ্য :

'তিরী গালি মুঝ দিল কো প্যারী লগে
দুয়া মেরী তুঝ মন মেঁ ভারী লগে
তদী কদ্র-এ-আশিক কী বুঝ সজন
কিসী সাথ অগর তুঝ কুঁ য়্যারী লগে
ভুলা দেওয়ে ওহ সীঁ এ্যশ-ও-আরাম সব
জিসে জুলফ সীঁ বে-করারী লগে
নহীঁ তুঝ সা অওর শোখ এয় মন হিরন
তিরী বাত দিল কো ন্যারী লগে ...
... ওহী কদ্র 'ফায়েজ' কী জানে বহুত
জিসে ইশক কা জখম কারী লগে'

এই যে গতিময়তা, তা অস্থির অথবা সঞ্চরমাণ। কাব্য যেখানে ইতিহাস ও সমাজের অন্তঃপাতী ও নিগূঢ় নির্যাস, কবির ভাষা সেখানে সেতুর সঙ্গে উপমায়িত। এখানে আমরা যদি যুগ-প্রতিনিধি গজলকারদের রচনা নিয়ে আলোচনা করি তাহলে গজলের ভাষিক-ক্রমোন্নতি ও বিবর্তনের ছবিটিও ধরা পড়বে। এঁদের মধ্যে প্রথমেই উচ্চার্য আবরু শাহ মুবারক দেহলভীর (১৬৮৫-১৭৩৩) নাম। মুবারকের গজলও প্রেমমূলক। ভাষা ঠিক প্রেমের নয়, কেননা তাতে বেদনা থাকলেও তা শ্রদ্ধা-মিশেল :

'তু জন্নত কী পরী হ্যয় তুঝে ম্যঁয় ক্যয়সে পাউঁ
জিন্দগী বসর জায়ে তেরী হী খুরবট মেঁ।'

অথবা—

'আজ য়্যারোঁ কো মুবারক হো কি সুবহ-এ-ইদ হ্যয়
রাগ হ্যয় ময় হ্যয় চমন হ্যয় দিলরুবা হ্যয় দীদ হ্যয়।'

নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও দরদ এই যুগের প্রথমার্দ্ধের গজলের বিশিষ্ট লক্ষণ। শ্রদ্ধায় দেবীপূজা হয়, মানবীপূজা হয় কি? আর দরদ বা সহানুভূতিতেও প্রেমের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত পূরিত হয় না। তাই ইশকিয়া গজলের কথা উঠতেই আমরা মীর ও গালিবের নামই প্রথম উচ্চারণ করি। তৎপূর্বের অজস্র অবিরল সৃষ্টি-সমুচ্চয়ের একটি ভাষণান্তরে অন্য একটির পুনরাবৃত্তি ব্যতিরেকে কিছু না। এই সুদীর্ঘ কালাবধিতে প্রেমের গজল-সাহিত্য যতখানি উন্নীত হয়েছে, একা মীরের অবদান-পরম্পরায় তদাপেক্ষা ঢের বেশিদূর এগিয়ে গেছে। মজহর দেহলভীর একটি মিসরা ঋণ নিয়ে বলতে পারি : 'হর রঙ লায়ে লেকিন সব বেরঙ হো গয়ে।'

তবে প্রেমের মুক্তির আকুতি পাখনা ঝাড়তে শুরু করেছিল এর পরপরই। গজলের প্রধান বিষয় প্রেম ও প্রেয়সীর প্রতিমা গড়ার কাজ খানিক ঢিমেচালে হলেও শুরু হয়ে গেছিল। উর্দু গজলের ইতিহাসে নতুন যুগের

বিজয়মর্দল দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল। এই নতুন যুগের ভগীরথ ছিলেন দিল্লির স্বনামধন্য শায়র মির্জা মুহম্মদ রফি 'সওদা' (১৭১৩-১৭৮১), যিনি মূলত গজল ও কাশিদার জন্য প্রসিদ্ধি হাসিল করলেও মাসনভী, মার্সিয়া তর্জীহবন্দ, মুখম্মাস, রুবাই, হিজো এবং কাতাতেও অনুরূপ পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু দিল্লি হয়ে উঠেছিল আহমদ শাহ আবদালি এবং নাদির শাহর উল্লাসমঞ্চ। একাধারে আক্রমণ, লুণ্ঠন ও দাওয়াত যুদ্ধের নিরবচ্ছিন্ন নামতা। এর ফলে দিল্লি বৃত্তের বেশির ভাগ কবি সেখান থেকে সরে এসে শরণ নিয়েছিলেন অওধ নবাবের দরবারে, অর্থাৎ লখনউয়ে। স্বাভাতই, তাঁদের সৃজনশীলতায় দেহলভীর ছাল খসে লখনভীর নির্যাস চুইতে শুরু করেছিল। সওদার সমীপকালীন খাজা মীর দর্দ (১৭২০-১৭৮৫) ছিলেন নকশবাদী-মুজাদ্দাদি সুফি সন্ত। জন্ম দিল্লিতে। তিনি নিজস্ব শায়রানা ও সুফিয়ানা প্রতিভা রক্তসূত্রে পিতা ফার্সীর গণ্যমান্য কবি খাজা মুহম্মদ নাসিরের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এবং, যে-কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, দিল্লি সেসময় আবদালি আর মারাঠাদের হামলায় ছারখার হয়ে গেছিল ঠিকই, এবং মীর ও সওদার মতো বড় মাপের কবিরা দিল্লি থেকে সরে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন লখনউয়ে; কিন্তু দর্দ কখনও দিল্লি পরিত্যাগ করেননি। প্রসঙ্গত এও উল্লেখ থাক, মীর, সওদা এবং দর্দ না জন্মালে উর্দু অথবা উর্দু শায়রির রাজত্ব এতখানি বিসারিত হতে পারত না।

ঐ কালবৃত্তে মীর মুহম্মদ তকী মীর (১৭২৩-১৮১০) একাধারে দিল্লি আর লখনউয়ের সর্বাগ্রগণ্য শায়র হিশেব পরিগণিত ছিলেন। জন্মেছিলেন আগ্রায়, উদিত ও প্রদীপ্ত হন দিল্লিতে, কিন্তু আবদালির দিল্লি আক্রমণের পর চলে আসেন লখনউ এবং আসাফ-উদ-দৌলার দরবারেই বাকিটা জীবন কাটিয়ে দেন, এমনকি অন্তশয্যাও গ্রহণ করেন লখনউয়ে। মীর তকী মীর যেন এক সুউচ্চ গিরিচূড়া, যা থেকে বিগলিত হয়েছে শতযুগের উপজীব্য বহু বিচিত্র কাব্যধারা। টীকাকার মল্লিনাথ প্রণয়ের দশটি দশার উল্লেখ করেছেন—চক্ষু:প্রীতি, মন:প্রীতি, সঙ্গসংকল্প, অনিদ্রা, কৃশতা, অবসাদ, হ্রীত্যাগ, উন্মাদনা, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু। মীরের কাব্যই বা কোন অংশে কম? হুসন, ইশক, তসব্বুফ, হকীকী, মতাজী, মজনুয়াত, জুদাই, মওত—কী নেই মীরে?[২৩]

উর্দু কাব্যসাহিত্যের একটা বড়ো অংশ প্রেমমূলক গজলের দখলে। ফিরাক গোরখপুরীর ভাষায় : 'উর্দু ইশকিয়া শায়রীর আসল রস মেলে গজলেই। প্রেমিক হতে গেলে শুধু হৃদয়বান হলেই চলে না, প্রয়োজন উদার ও বৃহৎ মস্তিষ্কের। যে কখনও প্রেমে ঘা খায়নি সে বঞ্চিত অতিশয়।'[২৪] ওয়লি আর মীরের ফারাকটা এখানেই। ওয়লি যে-অংশে কবি, সেই অংশেই সুফিকবি। তাই প্রেম-বর্ণনায় সুফি প্রভাবকে কাটিয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। অন্যপক্ষে মীর আপাদমস্তক প্রেমের রঙে রাঙানো। তাঁর ধারণা ছিল, হৃদয়ে প্রেম না থাকলে কবিত্ব আসে না :

'দূর ব্যয়ঠা গুবার-এ-'মীর' উস সে
ইশক বিন য়ে অদব নহীঁ আতা।'

ভাষার সারল্য মীরের শায়রীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর গজলের প্রাণমূল উত্থিত হয়েছে প্রেমময় নিষ্পাপ হৃদয়যাতনা থেকে, যা সুগভীর করুণা, মানবিক সৌন্দর্য এবং প্রেমের বিবশিতার ফসল :

'হম কো তো দর্দ-এ-দিল হ্যয়, তুম জর্দ ক্যুঁ হো এ্যয়সা
ক্যা 'মীর' জী তুমহে কুছ বিমারী হো গঈ হ্যয়।'

কিংবা—

'রাহ-এ-দূর-এ-ইশক মেঁ রোতা হ্যয় ক্যা
আগে আগে দেখিয়ে হোতা হ্যয় ক্যা।'

কিংবা নিচের শেরটি ধরা যাক। এই দুটি পংক্তি জীবনের কোনো একান্ত মুহূর্তে আবৃত্তি করেনি, এমন মাশুক বা প্রেমিক বিরল :

'দিল কে ফফোলে জল উঠে সীনে কে দাগ সে

ইস ঘর কো আগ লগ গঈ ঘর কে চিরাগ সে।'

এহেন স্বচ্ছ ও সাবলীল ভাষাই মীরকে ক্লাসিক করেছে। ক্লাসিকের লক্ষণই এই—সরলতা। সাধারণ মানুষের হৃদয়ে সরাসরি স্থান করে নেওয়া—

'রাত মজলিস মেঁ তেরী হম ভী খড়ে থে চুপকে
জ্যয়সে তসবীর লগা দে কোঈ দিওয়ার কে সাথ।'

মীর নিজেকে সমর্পিত রেখেছেন প্রেমে। শুধুই কি প্রেমে? হৃদয়ে অন্তস্তল থেকে যা নিঃসৃত হয়েছে তা বেদনাপ্রবাহ—

'আম আদমী জব রোতে হ্যঁয় প্যার বিন
তেরে দর পে আ জাতা হুঁ প্যার কে লিয়ে।'

প্রেম নিজের বৃত্তেই ঘুরে মরে না, তার মিলনবিন্দু আছে। সেই মিলনবিন্দুর সন্ধান পাওয়া এবং তাতে লক্ষ্যভেদ করা মীর তকী মীরের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। মীর সেই চক্ষুষ্মাণ কবি যাঁর কাছে প্রেমের রীতিপ্রকৃতি কিছুই ঢাকা থাকে না। তিনি জানেন প্রেমে বুদ্ধি চেতনা সমস্ত পুড়ে ছারখার হয়ে যায় এবং প্রেমিক সেখানে নিঃসঙ্গ, একাকী—

'সব গয়ে—দিল, দিমাগ, তাব-ও-তওয়াঁ
ম্যঁয় রহা হুঁ, সো ক্যা রহা হুঁ ম্যঁয়!'

বিরহানলে পুড়ে যায় প্রেমিক-হৃদয়। তবুও তার প্রতীক্ষা, তবুও তার প্রত্যাশা—

'আগে করেঁ কসু কে য়ে দস্তে-তমা দরাজ
য়ে হাথ সো গয়া হ্যয় সিরহানে ধরে ধরে'

পাঠক মীরের এক-একটি শের পড়া শেষ করেন আর তাঁর মনে জন্মায় অপার বিস্ময়,—এই যে এইমাত্র একটা জিনিশ পড়লাম, এটা তো আমারই উপলব্ধি, কবি সেটা জানতে পারলেন কীভাবে!! এই ধরনের শেরের মাধ্যমেই মীরের গজলসৃষ্টির মৌল স্বরূপটি চিনে নিতে ভুল হয় না আমাদের। বস্তুত, মীরের গজলের বিচরণভূমি প্রেম হলেও, তা বিরাট ও ব্যাপক এক বিশ্ব। এই বিচরণভূমি কেবল বৈচিত্র্যের প্রকাশে নয়, একই প্রেরণার ঐশ্বর্যরঙিন বিভার প্রকাশ।

'দিদনি হ্যয় শিকস্তগী দিল কী
ক্যা ইমারত গমোঁ নে ঢাঈ হ্যয়
দেখ তো দিল কি জাঁ সে উঠতা হ্যয়
য়ে ধুঁয়া সা কহাঁ সে উঠতা হ্যয়
বজহে-বেগানগী নহীঁ মালুম
তুম জহাঁ কে হো ওহাঁ কে হম ভী হ্যঁয়'

মহম্মদ হসন অস্করী লিখেছেন : 'মীর কাব্য করেন না, নিজের অন্তস্থিত মানুষটির অনুসন্ধান করে তাকে বাইরের মানুষটির সঙ্গে যুক্ত করেন। এই যুক্ত করার ব্যাপারে তাঁর কোনো আড়ষ্টতা নেই। এই অর্থে মীর অতিশয় আধুনিক। তাঁর গজলে যে 'আমি' কথা বলছে সে ভিতরকার সেই 'আমি'। বাইরের মীর ভিতরকার মীরের সাথে একাত্মবোধ করে নিজেকে এই 'আমি'র মধ্যে প্রতিফলিত করেছেন।'[২৫]

'ইশক মীর এক ভারী পৎথর হ্যয়
কব য়ে তুঝ না-তওয়াঁ সে উঠতা হ্যয়।'

মীর দুর্বোধ্য নন। তাঁকে বোঝবার জন্য মল্লিনাথ লাগে না। হৃদয়কে ছুঁয়ে যায় তাঁর সহজ সরল ভাব। মীরের গজলে এমন কিছু শের আছে যেগুলি একবার পাঠে তৃপ্তি হয় না। কবির কাজ যেখানে চুকেবুকে যায়, সেখান থেকেই আমাদের কর্মের শুরুয়াৎ—

'ঝুটপুটা শাম কা, বহতা হুয়া দরিয়া ঠহরা

সুবহ সে শাম হুঈ, দিল ন হমারা ঠহরা।'

মীর যে আজও কিংবদন্তী হয়ে যাননি, কালিদাসের মতোই চির-আধুনিক রয়ে গেছেন[২৬], তার অন্যতম প্রধান কারণ তাঁর ভাষা দুরূহ অথচ দুর্বোধ্য নয়। ভাষার দুরূহতা আরবি-ফার্সি শব্দের জন্য, ভাবের জাটিল্য সেখানে নেই। উদাহরণত ধরা যাক নিচের গজলটিকে যেখানে আছে এক দেহপসারিণীর প্রণয়চিত্র :

'এয় নুকীলে য়ে থী কহাঁ কী অদা
খব গয়ী জী মেঁ তেরী বাঁকী অদা
জাদু করতে হ্যাঁয় ইক নিগাহ কে বীচ
হায় রে চশমে দিলবরা কী অদা
বাত কহনে মেঁ গালিয়াঁ দে হ্যায়
সুনতে হো মেরে বদজুবাঁ কী অদা
খাক মেঁ মিল কে 'মীর' হম সমঝো
বেঅদাঈ থী আসমাঁ কী অদা'

ফারুক জানম খাঁ যথার্থ বলেছেন, মীরের প্রেম লিবিডো-ভারাতুর জৈবিক আকর্ষণ নয়, তা শাশ্বত, সুন্দর ও চির-আকাঙ্খিত। এই কারণে তাঁর গজলও চির-অম্লান থাকবে—

'ছাতী জলা কর হ্যায় সোজ-এ-দরুঁ বলা হ্যায়
ইক আগ সী রহে হ্যায় ক্যা জানিয়ে কি ক্যা হ্যায়'

মীরের ভাষা সরল, কিন্তু তার অনুশীলনে নেশা ধরে। তিনি ঔদাস্যের কবি, কিন্তু গজলে হরেক রঙের ফোয়ারা তুলে মাতোয়ালা করে দেন তিনি। মীরের জীবন ও গজলের বহুরঙা ভাষা দ্বন্দ্বময় চৈতন্যে আকীর্ণ, অথচ তীব্র আস্তিক্যবোধের আলোয় উজ্জ্বল। এরই প্রমাণ মিলবে নিম্নোদ্ধৃত গজলটিতে :

'হস্তী অপনী হবাব কী সী হ্যায়
য়ে নুমাইশ সরাব কী সী হ্যায়
নাজুকী উস কে লব কী ক্যা কহিয়ে
পংখুড়ী ইক গুলাব কী সী হ্যায়
চশম-এ-দিল খোল ইস ভী আলম পর
য়াঁ কী অওকাত খোয়াব কী সী হ্যায়
বার বার উস কে দর পে জাতা হুঁ
হালত অব ইজতিরাব কী সী হ্যায় ....
.... 'মীর' উন নীম-বাজ আঁখোঁ মেঁ
সারী মস্তী শরাব কী সী হ্যায়'

আবদালি আর নাদিরশাহর হামলায় ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দিল্লিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন মীর। দিনদাহাড়ে খুন আর লুটপাটের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তিনি। সেই ত্রাস ও বিভীষিকার ছায়া তাঁর রচনায় পড়েছিল। নিজের গজল সম্পর্কে বলেছিলেন,

'হমকো শায়র ন কহো মীর কি সাহিব হমনে
দর্দ-ও-গম কিতনে কিয়ে জমা তো দিওয়ান কিয়া।'

অথচ সেই মীরকে বলা হয়েছে 'খুদা-এ-সুখন', অর্থাৎ কাব্যের ভগবান। কথিত আছে, মির্জা গালিব একদা যখন এক দরবেশের মুখে প্রথম মীরের নজম শ্রবণ করেন, সবিমুগ্ধ শ্রদ্ধায় তিনি বলে উঠেছিলেন :

'দেখতে কে তুমহী নহীঁ হো উস্তাদ গালিব
কহতে হ্যাঁয় পিছলে জমানে কোঈ মীর ভী থা!'

ভালো কথা। সারস্বত ক্ষেত্রে 'উর্দু' নামটিকে কিন্তু কয়েনড বা মুদ্রিত করেছিলেন, মীর অথবা গালিব নয়, —তাঁর নাম মাসহফি গুলাম হমদানি (১৭৫১-১৮৪৪)। তৎপূর্বে উর্দু পরিজ্ঞাত ছিল 'জবান-ই-ওর্দু' নামে, যেটি সাধারণভাবে হিন্দুস্তানী, হিন্দভী, হিন্দী, দখিনি বা রেখতার উপনাম ছিল এবং যার সম্মিলিত ডাকনাম ছিল লশকরি জবান, অথবা নিছক 'লশকরি'। মীরের সমীপকালীন হমদানি আঠারো শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শায়র। ঝরঝরে উর্দু ভাষায় অজস্র শের এবং গজল লিখেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁর একটি বিখ্যাত গজলের কতিপয় শের পেশ করি :

'ইস কদর ভী তো মিরী জান ন তরসায়া কর
মিল কে তনহা তু গলে সে কভী লগ জায়া কর
দেখ কর হম কো ন পর্দে মেঁ তু ছুপ জায়া কর
হম তো অপনে হ্যাঁয় মিয়াঁ গ্যয়র সে শরমায়া কর ....
.... হম ভী এয় জান-এ-মন ইতনে তো নহীঁ নকারা
কভী কুছ কাম তু হম কো ভী তো ফরমায়া কর
তুঝ কো খা জায়েগা এয় 'মুসহফি' য়ে গম ইক রোজ
দিল কে জানে কা তু ইতনা ভী ন গম খায়া কর'

সমকালে আরও দুই মহীরূহপ্রতিম শায়রের অবদানও আমরা বিস্মৃত হতে পারি না—গালিব আর মোমিন, যাঁদের পুণ্যস্পর্শে ইতিহাসের দরবারে উর্দুর তাজপোশি সমাধা হয়েছিল। দুজনেই ছিলেন দিল্লির কবি।

আমি ভাষার সারল্যে বিশ্বাসী, ভাবের সারল্যে নয়। সেখানে আমি দুরূহতার পক্ষপাতি। বন্ধুমহলে আমার এই বিশ্বাস ধিকৃত হলেও পাকে-প্রকারে তাঁরাও কবিতার দূরবগাহের অনুমোদন না করে পারেননি। কোনও কবিতা পড়ামাত্র তার সমস্তটা যদি বুঝে ফেলি, কবিতার তবে আর রইল কী? দুর্বোধ্য না হয়ে যেসব কবিতা দুরূহ হয় তাদের অনুশীলন শ্রমসাপেক্ষ হতে পারে কিন্তু তা এক জায়গায় এসে থামতে বা ঠোর পেতে বাধ্য। এদের মূলে থাকে একটি কৌতূহল; যত দফা পড়ি, প্রত্যেক বারই দ্রৌপদীর শাড়ির মতো অফুরন্ত রহস্যের উন্মোচন ঘটতে থাকে। পক্ষান্তরে বলা যায়, কবিতার আত্মা হলো সেই জিনিশ যা যুক্তির অতীত, বুদ্ধিতে যার তৌল হয় না, যা কেবল ধ্যানযোগ্য। কবিতা বিধিবদ্ধ, সুশৃঙ্খল, ব্যাকরণ-সম্মত এবং বিশ্লেষণ উপযোগী না-ও হতে পারে। কিন্তু তার গভীরে মননশীলতায় আচ্ছাদিত যে এক রসরহস্য, তাকে অস্বীকার করি কোন যুক্তিতে? দুরূহতার জন্ম পাঠকের আলস্যেও হতে পারে, কিন্তু তার জন্যে কবিকে দোষারোপ করাটা অন্যায়।[২৭] কবি কেবল একটি গাছ—তাকে ঘিরে যে বিস্ময়, রহস্যময়তা—তাই কবিতা। সেহেন এক প্রোচ্চ মহীরূহের নাম অসদ উল্লা খাঁ গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯)। যিনি তাঁর কবিতায় ফার্সি শৈলী এবং তখল্লুসের সাজুয্য প্রয়োগের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর আসল নাম মির্জা অসদউল্লাহ বেগ খান, কিন্তু মূলত তাঁর ছদ্মনাম 'গালিব' এবং 'অসদ' নামেই সবিশেষ বিখ্যাত। মির্জা গালিবের জন্ম তৎকালীন আকবরাবাদ বা আধুনিক আগ্রায়। কিন্তু তাঁর কবিপ্রতিভার সমগ্র বিচ্ছুরণ ঘটে দিল্লিতে। ফার্সি ও তুর্কি ভাষায় সুদক্ষ হলেও তাঁর সৃষ্টিকর্ম সবই উর্দুতে। মাত্র এগারো বছর বয়সে গালিবের কাব্যযাত্রার সূচনা ঘটেছিল এবং তেরো বছর বয়স থেকে তিনি দিল্লিতে বসবাস শুরু করে নিজস্ব কাব্যপ্রতিভা আদিগন্ত বিস্তৃত করেন। তিনি ছিলেন মুঘল দরবারে সর্বোৎকৃষ্ট কবি। গজল, কাশিদা, রুবাই, কিতা এবং মার্সিয়ায় ছিলেন সমান সিদ্ধহস্ত। অধিকন্তু, উর্দু শায়রি ও গজলের দুনিয়ায় মীরের পর গালিবই আর-এক অভ্রংলিহ চূড়া যা থেকে বিগলিত হয়েছে শত-শতকের উপজীব্য অমৃত রসের নিরবচ্ছিন্ন সুধা, যার সেবনে কেবলমাত্র পাঠক ও শ্রোতার মনের তৃষ্ণাই নিবৃত হয় না, ভাষারও বাচ্চাদানি উপর্যুপরি স্ফীত হয়।

অবশ্য উর্দুসাহিত্যে গালিব সেই অর্থে ক্লাসিক নন, যে-অর্থে গ্রীসে হোমারকে বাদ দিয়ে ভার্জিল এবং সংস্কৃতে বাল্মীকির পরিবর্তে কালিদাস স্বীকৃত। দুর্বোধ্যহীনতা এঁদের কাব্য-বৈশিষ্ট্য। ঐ প্রচলিত নিয়মে উর্দু সাহিত্যের একান্ত প্রতিভূ গালিব নন,—মীর। কিন্তু ভাববিচারে গালিবকে ধ্রুপদী চত্তরের বাইরে স্থান দেওয়া অসম্ভব। শের-শায়রীর লক্ষণই হলো যা চট করে বুঝে উঠতে পারব না বলেই শেষাবধি একটা চাপা আনন্দের রেশ আমাদেরকে তার প্রতি উন্মুখ করে রাখবে।

'কর্জ কে পীতে থে ময় লেকিন সমঝতে থে কি হাঁ
রঙ লাওয়েগী হমারী ফাকা-মস্তী এক দিন
নগমা-হা-এ-গম কো ভী এয় দিল গনীমৎ জানিয়ে
বে-সদা হো জায়েগা য়ে সাজ-এ-হস্তী এক দিন'

মির্জা গালিবের গজলে আমরা শব্দের দুটি রূপ পাই। একটি তার ক্ষরিক, অন্যটি আক্ষরিক। একটি মায়িক, অন্যটি কায়িক। অর্থাৎ ক্ষর ও অক্ষর এই দুয়ে মিলে শব্দরূপ। শব্দ, অর্থাৎ যা কাব্যকথার দেহ ও আত্মা গড়ে তোলে। যা স্থির, রূপান্তরহীন, নিরন্তর বহমান তাই অক্ষর। তার অর্থও নির্দিষ্ট, বিকল্পহীন ও সুস্পষ্ট। আর ক্ষর ঠিক এর উলটো। যা ক্ষরিত, বিচ্ছুরিত ও রূপান্তরিত। এর কোনো অর্থ নেই, আছে কেবল উপলব্ধি। তাই গজলের কোনো অর্থ বা সংজ্ঞা হয় না—তা 'অপরিভাষিত'। এ-কথা গূঢ় অর্থে সত্যি। মহৎ গজল কোনো মানে বা অর্থে আটকে অনড় হয়ে থাকে না। বরং তার অন্তর্বাহিত ধারাটি ব্যঞ্জিত ও প্রবাহিত হয়ে আমাদের উপলব্ধিতে, বোধে এক ভাব-মৌচাক রচনা করে। জীবনানন্দের বিখ্যাত 'বনলতা সেন' কবিতার মগ্ন অন্তর্লীন রূপের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো প্রাবন্ধিক যে পন্থা অবলম্বন করেছেন[২৮], সেই পন্থা বা পদ্ধতি অনুসরণ করলে আমরা গালিবের গজলেও সেই দ্বিমাত্রিক ধারাটি খুঁজে পাবো। পাঠকের কাছে গালিবের শায়রী অনেকসময় কষ্টপাঠ্য ঠেকতে পারে, কিন্তু কোনোটি অনাবশ্যক মনে হয় না। পাঠান্তে পাঠক বুঝতে পারেন, তার অন্তর্নিহিত অর্থটি এমনভাবে ধরা পড়ত না যদি-না তা অরূপতার সন্ধানে তাঁদেরকে ব্যাপৃত রাখত। জটিল অথচ দুর্বোধ্য নয়, আছে জঙ্গমতার সাদ—যা গজলের গতি। এই গতিই আমাদের শেষাবধি দূর থেকে দূরতরে নিয়ে যায়—

'হমকো মালুম হ্যয় জন্নত কী হকীকৎ লেকিন
দিল কে খুশ রখনে কো 'গালিব' য়ে খ্যয়াল অচ্ছা হ্যয়
উনকো দেখে সে আ জাতী হ্যয় মুঁহ পর রওনক
উও সমঝতে হ্যঁয় কি বীমার কা হাল অচ্ছা হ্যয়'

মির্জা গালিবের গজলের প্রতিটি শেরে একটি করে অদৃশ্য শের আছে, যেন ভাসমান শেরের তলায় আর একটি মগ্ন শের। একটির সঙ্গে অন্যটি পৃথক নয়, বরং লগ্ন—কিন্তু নিমজ্জিত, অতএব অদৃশ্য। একটি আরেকটি হতে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং যুক্ত—একে-অপরের পরিপূরক। ডুবরির মতো ডুব দিয়েই, গজলে নিমগ্ন হয়ে, এই দ্বিতীয় শেরটিকে, অন্য গজলটিকে ধরা সম্ভব। মুদ্রিত গজলের আড়ালে এই যে আরেকটি গজল, যেটি গালিবের মগ্ন গজল, সেটিই তাঁর আসল গজল।

'ন থা কুছ তো খুদা থা, কুছ ন হোতা তো খুদা হোতা
ডুবোয়া মুঝকো হোনে ন হোতা ম্যঁয় তো ক্যা হোতা'

যে কবির সৃষ্টি এমন বিস্ময় উৎপাদন করে তিনি ক্লাসিক নন সেটাই বা বলি কেমন করে? গালিবের গজলের এক-একটি শের, যেগুলি আজ প্রবাদবাক্যের মতো বিশ্বময় মানুষের মুখে-মুখে ফেরে, সেগুলি উর্দুসাহিত্যের অমূল্য সম্পদই নয়, আত্মাও বটে : 'ওহী হোতা হ্যয় জো মঞ্জুর-এ-খুদা হোতা হ্যয়', 'ইশক পর জোর নহীঁ হ্যয় য়ে উও আতিশ গালিব', 'তু অগর মেরা নহীঁ বনতা, ন বন, অপনা তো বন', 'সাফ ইধর সে উধর নজর আতা হ্যয়', 'কভী হম উনকো কভী অপনে ঘর কো দেখতা হুঁ', 'তুঝে অঠখেলিয়াঁ সুঝী হ্যয় হম ব্যয়ঠে হ্যঁয়', 'সাফ ছুপতে নহীঁ সামনে ভী আতে নহীঁ', 'শোলা সা লপকে জায়ে হ্যয়, আওয়াজ তো

দেখো', 'ক্যা বনে বাত জহাঁ বনায়ে ন বনে', 'আগে আগে দেখিয়ে হোতা হ্যয় ক্যা' ইত্যাদি এ দাবির প্রোজ্জ্বল প্রমাণ। গালিবের অথৈ ভাবসমুদ্রে হানা দিয়ে আজকের বহু কবি নিজেদের রচনায় উদ্ধৃরণ দিচ্ছেন। এখনও কি বলতে হবে তিনি ক্লাসিক নন! উর্দু গজলে মীরের জবাব নেই, এ-কথা নিঃসন্দেহে। কিন্তু সেখানে গালিবের যে সিংহাসন, তা কেড়ে নেবো বললেই কেড়ে নেওয়া যায়? মীর প্রেমমূলক গজলের বাদশা, গালিব বেদনামূলক গজলের শাহেনশা। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দুজনেই অনন্য। মীর যেখানে আত্মানুসন্ধানে ব্যাপৃত, গালিব সেখানে বাইরের মানুষটিকে খুঁজে ফিরছেন, সেই মানুষটির মধ্যেই নিজের প্রতিচ্ছবি দেখছেন—

'হ্যয় কুছ এ্যয়সি হী বাত জো চুপ হুঁ
'বরনা ক্যা বাত কর নহীঁ আতী'

গালিব সংক্রান্ত অ্যানেকডোট সমুহ এবং তাঁর চিঠিগুলি তাঁর গজলের 'টীকা'-স্বরূপ। চিঠিগুলি পড়লে বোঝা যাবে তিনি দুঃখ ও বেদনাকে কবিতার নিয়তি হিশেবে মেনে নিয়েছিলেন। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন :

'মুশকিলেঁ মুঝপর পড়ীঁ ইতনী কি আসাঁ হো গঈ
দর্দ কে হদ সে গুজরা হ্যয় দওয়া হো জানা।'[২৯]

এধরনের নানান শের বিশ্লেষণ করে দেখানো যায়, মানুষের বেদনার সঙ্গে গালিব নিজের হৃদস্পন্দনকে এক করে ফেলেছিলেন। গজলের দুনিয়ায় গালিব যে বেদনার রঙ ছড়িয়েছেন তার নকলেও আজগের কবি ব্যর্থ। গালিব এমনই বস্তু যা আমাদের ধরাছোঁয়ার উর্দ্ধে। যাকে কেবল ধ্যান করা যায়, লাভ করা যায় না। মীরের খ্যাতি যেখানে ইশকিয়া গজলের জন্য অবিসংবাদিত, গালিব সেখানে কষ্টপ্রিয়তা বা মুশকিল-পসন্দিগীর জন্য মশহুর—

'দিল-এ-নাদাঁ তুঝে হুয়া ক্যা হ্যয়
আখির ইস দর্দ কী দওয়া ক্যা হ্যয়।...
ম্যঁয় নে মানা কি কুছ নহীঁ গালিব
মুফত হাথ আয়ে তো বুরা ক্যা হ্যয়।'

গালিবের গজলে নারী বেদনারসে সিক্ত। এমনকি, যেখানে চিত্রিত হয়েছে নারীর মমতাস্নিগ্ধ হরিণীর মতো চোখ—সেখানেও গালিবের ভাষা ও ছন্দ এমনই মমতাময়ী যে তার বারংবার অনুশীলনে হৃদয় দ্রাবিত হয়ে ওঠে—

'রঙো মেঁ দওড়নে ফিরনে কে হম নহীঁ কায়ল
জব আঁখ হী সে ন টপকা তো ফির লহু ক্যা হ্যয়
বহুত দিনোঁ মেঁ তগাফুল নে পয়দা কী
উও ইক নিগেহ, জো ওজাহির নিগাহ সে কম হ্যয়'

দ্বিতীয় শেরটির মোহে পড়ে সেটিকে অক্ষয় করে রেখেছেন উর্দুর বিতর্কিত উপন্যাস ও গল্প লেখিকা, চলচ্চিত্র নির্মাতা ইসমৎ চুগতাই ((১৯১৫-১৯৯১) তাঁর নিজের আঁকা একটি তৈলচিত্রে। সমগ্র ছবিটিতে একটি নারীর অবগুণ্ঠনের ভেতর দেবীপ্রতিমা সদৃশ একটি মাত্র স্থির নিশ্চল অথচ উজ্জ্বল চোখ। মুখের একপাশে সরীসৃপের ফণার মতো একগাছি চিকুর, অঞ্জনঘন ভ্রূলেখায় কামধেনুনন্দিত কান্তি, ঘন কৃষ্ণ ভ্রূযুগ এবং সেই গভীরকৃষ্ণ নিশ্চল অথচ চঞ্চল নয়নতারাটি দেখে মনে হয় যেন পদ্মবনে কতকগুলি ভ্রমর যূথভ্রষ্ট ভাবে উড়ে বেড়াচ্ছে—বসছে না, উড়ছে কেবল। এমন অনিন্দ্যসুন্দর চোখেও পৃথিবীর সকল নারী-নয়নের প্রতি কোনো অবজ্ঞার ভাব নেই, আছে বন্দীদশার অসহায়তা—বেদনা, অন্তর্জ্বালা আর মুক্তির মুক আকুতি। এই অক্ষিপাত সহৃদয়ের বুকে কারুণ্যের মেঘ ঘনিয় তোলে—

'করনে গয়ে থে উসসে তগাফুল কা হম গিলা

কী এক হী নিগাহ কি বস খাক হো গয়ে।'

গালিবের অন্য একটি শেরের ওপর চুগতাইয়ের আর-একটি ছবি আছে। বিষয় : 'কেশদাম'। ছবিতে নারীটির কানের দু-পাশে চুলের ঢাল ঘন হয়ে পিঠে ভাঙা-খোঁপার মতো ভেঙে ভেঙেই ক্ষান্ত হয়নি, নদীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে মুঠোর বাঁধন মাড়িয়ে। এতেও বন্দিনীর বেদনা মুখ্য ভাব, যদিও তা অপেক্ষাকৃত হালকাভাবে ব্যক্ত :

'নীঁদ উসকী হ্যয় দিমাগ উস কা হ্যয় রাতেঁ উস কী হ্যয়
তেরী জুলফেঁ জিস কে বাজু পর পরেশাঁ হো গঈ।'

'গালিব অফুরন্ত'—মহম্মদ ইকবালের এই উক্তির পর আর কোনো বিশ্লেষণই গালিব সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। তিনি যে দরদের গজল লিখেছেন, তার সুরে সংযোজিত হয়েছে হৃদয়ের আকুলতা, অব্যক্ত ব্যথা,—আর প্রতিধ্বনিত হয়েছে হৃদয় থেকে হৃদয়ান্তরে। আজও গালিবের সঙ্গে আমাদের সংযোগ ছিন্ন হয়ে যায়নি তার কারণ, তাঁর লেখনী চুঁইয়ে যে বেদনাধারা নির্গত হয়েছে তা আমাদেরই বুকের জ্বালা, তা সর্বজনীন। মীরে আছে ঔদাস্য, গালিবে বৌদ্ধিক সংশয়। বলা যায়, উর্দু গজল যদি একা মীরের কীর্তিতেই সমৃদ্ধ থাকত তাহলে আমরা আনন্দের মধ্যেও বিষাদ অনুভব করতাম। কেননা কেবল দরদ নয়, গালিবে রয়েছে হাজারো রঙ—

'হজারোঁ খোয়াহিশেঁ এ্যয়সি কি হর খোয়াহিশ পে দম নিকলে
বহুত নিকলে মিরে অরমান লেকিন ফির ভী কম নিকলে।'

কালিদাসের নিরন্তর অনুকবণে যেমন 'বর্ষা' ও 'বিরহ' সংস্কৃতকাব্যে প্রধান বিষয় হয়ে আছে, তেমি উর্দু গজলে 'প্রেম' ও 'বেদনা' এখনও প্রধান হয়ে আছে মীর ও গালিবের আবহমান প্রতিপত্তির কারণেই। মীর সহজ ভাব ও ভাষার কবি, গালিব জটিলতার। মীর একটি শের লিখে দশটা শের পাঠককে দিয়ে লিখিয়ে নেন আর গালিব একটি শেরেই পাঠককে ডুবিয়ে রেখে চলে যান পরবর্তী শেরে। মীর সুখের কবি, গালিব দুঃখের। মীর বিরহে কাতর, গালিব মিলনেও অসুখী। মীর প্রেমকে সার বলে জেনেছেন, গালিব বিরহের ইমারৎ গড়েছেন। মীরের যেখানে ঔদার্য, গালিবের সেখানে সংশয়।

মোমিন খাঁ মোমিন (১৮০০-১৮৫১) এঁদের সন্ধিস্থল। 'মোমিন' একটি আরবি ঐস্লামিক শব্দ, যার অর্থ আস্তিক বা সাচ্চা মুসলমান। যদিও জন্মসূত্রে মোমিন ছিলেন কাশ্মিরী এবং তাঁর কৌলিক পেশা ছিল উনানি চিকিৎসা, অর্থাৎ তিনি ছিলেন হাকিম; কিন্তু তাঁর মননবিশ্বটি ছিল দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিকতার। মোমিনের জন্ম দিল্লিতে এবং ঐসময় শাহ আলম দিল্লির বাদশা ছিলেন। বাদশার দরবারে হাকিমী পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁর পিতামহ এবং পরে তিনি নিজেও ঐ পদে বহাল হন। অবশ্য পরবর্তী জীবনে মোমিন শায়র হিশেবেই প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ছিলেন অতিশয় সুদর্শন, প্রেমিক ভাবাপন্ন এবং সর্বদা সেজেগুজে থাকতেন। তাঁর স্বভাবে ছিল প্রকৃতি ও সৌন্দর্যের প্রতি আসক্ত। মোমিন বেশ কিছু সুন্দর ওয়াসোখত রচনা করেছিলেন, যেগুলি আসলে উর্দু দীর্ঘ কবিতা। কিন্তু তাঁর গজলগুলিই শ্রেষ্ঠ। গজল সমূহে শাদা-সরল শব্দের বাহার থাকলেও গাঠনিক দিক থেকে খানিক ক্লিষ্টও। মোমিন মীর বা গালিবের মতো অমন বড়ো মাপের কবি নন, কিন্তু অবশ্যই বড়ো শিল্পী। কবি জন্মায়, আর শিল্পী ক্রমে গড়ে ওঠে। মোমিন নিজেকে গড়েছেন ওই দুই মহান উৎসধারার রসে। কিন্তু তবু তিনি মীর আর গালিবের থেকে স্বতন্ত্র। সংযুক্তিকরণেই ফুটেছে তাঁর বিযুক্তিকরণ—

'ম্যাঁয় ভী খুশ নহীঁ ওয়ফা করকে
তুমনে অচ্ছা কিয়া, নিবাহ ন কী
তুম মেরে পাস হোতে হো-গোয়া
জব কোঈ দুসরা নহীঁ হোতা'

শেষের শেরটি পড়ে গালিব বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন, 'মোমিন যদি এই একটি শের আমাকে ভিক্ষে দেন, বিনিময়ে আমি আমার সমস্ত সৃষ্টি তাঁকে দান করে দেবো।' জবাবে মোমিন বলেছিলেন, 'গালিব সাহেব আমার শের নিলেও নিতে পারেন, অন্যের সৃষ্টি আমার চাই না।'[৩০] প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, মোমিনের স্বভাবে অহংকারের প্রাচুর্য ছিল। রাজা কপুরথলা তিনশো টাকা মাসোয়ারা দিতে চেয়ে যখন তাঁকে নিজস্ব দরবারে আমন্ত্রণ জানান, তিনি ঐ প্রস্তাব এই বলে ফিরিয়ে দেন যে ওটুকু বেতন তো গাইয়েরা পায়।

যাই হোক। মোমিনের দুটি শেরের মধ্যে তৃতীয় আরও-একটি শের সংগুপ্ত, যা আমাদের অভিভূত করে। গজলের প্রথমে শেরেই তিনি একটি পথনির্দেশিকা পাঠকের হাতে তুলে দেন, পাঠক তাতেই মশগুল হয়ে কবির প্রলোভনে শূন্য গগনে হাঁটার জন্য তৈরি হয়ে পড়েন এবং আসল গজলটি বা তার মর্ম সহস্র আলোকবর্ষ দূরে পাঠিয়ে দেন। গজলের প্রথম চরণে বা শের-এ-মিতলায় শিল্পী যে-পথ আকীর্ণ করে দিয়েছেন তা যে একটা মিথ্যা বা ভুয়ো পথ—ছলনা, গোলোকধাঁধা বা প্যারাডক্স—সেটাই পাঠক ভুলে যান। এটাই মোমিনের শিল্পত্ব।

গালিব ছিলেন বেপরিমাপ মদিরাসক্ত, প্রডিগাল এবং তথাকথিত কাফির বা নাস্তিক। তদ্দণ্ডে তাঁর সমীপকালীন মৌলানা সৈয়দ আলতাফ হুসেন হালি (১৮৩৭-১৯১৪) ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর আর-এক প্রখ্যাত শায়র। জন্ম উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত বা আধুনিক হরিয়ানার ঐতিহাসিক শহর পানিপতে, এবং প্রয়াণও সেখানেই। বাল্যবয়সেই পিতা-মাতার মৃত্যুর দরুন তাঁর পড়াশোনার গুটি অচিরেই কেঁচে যায়। কিন্তু ধর্মের প্রতি ছিলেন পরম নিষ্ঠাবান, পাক্কা মুসলমান এবং পাখণ্ডীদের কড়া সমালোচক। তবুও তিনি ঐ কাফের গালিবের প্রতি ছিলেন একান্ত সশ্রদ্ধচিত্ত। 'য়্যাদগার-এ-গালিব' নামে গালিবের জীবনীও লিখেছিলেন। আসলে, গোঁড়া মুসলিম বংশে জন্ম হলেও, এবং শরীয়তী রীতির ভাবধারায় বাল্যাবস্থা লালিত হলেও, পরবর্তী কালে হালি ইংরেজি ভাষা ও আধুনিক ভাব-জগতের সংস্পর্শে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন সংস্কারমুক্ত এবং 'অখণ্ড ভারতের সেবক' হিশেবে। নবজাগরণের অগ্রনায়ক এবং ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন হালি, এবং পরবর্তী কালে, দিল্লির ইঙ্গ-আরবীয় স্কুলে শিক্ষকতা করার সময়েই তাঁর কবি-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং নিজাম বাহাদুরের কাছ থেকে ৭৫ টাকা মাসিক বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৬০ থেকে হালি আমৃত্যু সক্রিয় থেকেছেন শের-ও-শায়রির দুনিয়ায়। ছাব্বিশ বছর বয়সে প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দিওয়ান' প্রকাশিত হয়, যাতে গালিবের প্রভাব পরিলক্ষিত। 'শের-শায়রী' গ্রন্থে তিনি সমালোচক। পরে প্রকাশিত 'বরখুরত' ঋতু বিষয়ক কবিতার সংকলন, যা কালিদাসের 'ঋতুসংহার' এবং টমসনের 'সিজনস'কে স্মরণে আনে। 'নিশাত-ই-উমিদ' কাব্যে হালি আশাবাদী। 'হুববি-ওয়াতন'-এ যুগপৎ প্রবাসীর দেশানুরাগ ও হৃদয়যাতনা ব্যঞ্জিত : 'স্বর্গ পেলেও চাই না আমি একমুঠো তোর ধূলির বিনিময়ে'। কবিকে প্রেরণা যুগিয়েছে দেশের আদিম জনগোষ্ঠী। আর্যদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েও তারা দেশের মাটি ছাড়েনি। এই দার্ঢ্য হালির কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে :

'কাহারেও তুমি ভাবিও না পর হিন্দু-মুসলমান
ব্রহ্ম বৌদ্ধ যে-ই হোক সে যে স্বদেশেরই সন্তান।
প্রীতির নয়ানে চাহ সবা-পানে, তাহারা নয়নমণি
স্বদেশের শুভ চাহ যদি, লহ সবারে আপনা গণি।'[৩১]

হালির গজল উর্দু সাহিত্যের পরম সম্পদ। সমীপকালীন উর্দু সাহিত্যের প্রচল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন তাঁর সাহিত্য, কিন্তু পাঠকের কাছে তাঁর গজল, নজম, রুবাই এবং মার্সিয়ার সমাদর কম ছিল না। উপরন্তু বিশ শতকের গোড়ার দিকে হালির সুযোগ্য নেতৃত্বেই উর্দু শায়রি ও গজলের সমুচিত উন্নতি ঘটেছিল। উর্দু গজলে নবযুগের তিনিই উদগাতা। গজলে প্রকৃতি ও মানবকে তিনি গেঁথেছেন একই মালার ডোরে। তাঁর স্বদেশবন্দনার একটি গজল এরকম—

'অয় বতন অয় মেরে বহিশতে বরীঁ
ক্যা হুয়ে তেরে আসমাঁ ঔ জমীঁ
রাত অওর দিন কা উও সমাঁ ন রহা
উও জমীঁ অওর উও আসমাঁ ন রহা'

হালি নির্দলীয় শায়র, গজলেও তাঁর ওপর অন্য কোনো কবির প্রভাব ছিল না। ড. এহতেমাম হুসেন তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'হালি বদলায়মান যুগের প্রতিনিধি। তিনি না পুরনো রীতিপ্রযুক্তিকে আঁকড়ে থাকার পক্ষপাতি ছিলেন, আর না নতুন শৈলীকে ভাবনাচিন্তা বিনাই নিজের মধ্যে প্রবিষ্টি দেওয়ার পক্ষে ছিলেন।' হালি উর্দু কাব্যসাহিত্যের নানান জঁরের রেওয়াজ করেছেন, কিন্তু গজলেই তিনি শ্রেষ্ঠ। তাঁর একটি মশহুর গজলের কয়েকটি শের এখানে পেশ করছি :

'জীতে জী মৌত কে তুম মুঁহ মেঁ ন জানা হরগিজ
দোস্তী দিল ন লগানা ন লগানা ন লগানা হরগিজ
বজম-এ-মাতম তো নহীঁ বজম-এ-সুখন হ্যয় 'হালী'
য়াঁ মুনাসিব নহীঁ রো রো কে রুলানা হরগিজ'

পুরনো দিনের উর্দু শের-শায়রীর আবহাওয়ার প্রতি নস্টালজিয়া ছিল হালির। উপরোক্ত গজলে সেটি প্রকাশ পেয়েছে কিছুটা আক্ষেপ আর নৈরাশ্যের অভিব্যক্তিতে। তাঁর আর একটি গজলের কয়েকটি শের :

'গালিব' ও 'শোফতা' ও 'নৈয়র' ও 'আজুর্দা' ও 'জৌক'
অব দিখায়েগা য়ে শকলেঁ ন জমানা হরগিজ
'মোমিন' ও 'অলভী' ও 'সহবাঈ' ও 'মমনুঁ' কে বাদ
শের কা নাম ন লেগা কোঈ দানা হরগিজ
'দাগ' ও 'মজরুহ' কো সুন লো কি ফির ইস গুলশন মেঁ
ন সুনেগা কোঈ বুলবুল কা তরানা হরগিজ
রাত আখির হুই অওর বজম হুই জের-ও-জবর
অব ন দেখোগে কভী লুৎফ-এ-শবানা হরগিজ'

হালির এই ক্ষোভ বা হতাশা কিছু-অংশে সত্য প্রমাণিত হলেও, পরবর্তী কালে উর্দু গজলের জয়যাত্রা অক্ষুণ্ণই থেকেছে। সমসাময়িক উর্দু গজলের উন্নয়ন প্রকল্পে দিল্লির শেখ মুহম্মদ ইব্রাহিম জৌকের (১৭৯০-১৮৫৪) অবদানও কম নয়। তিনিও ছিলেন গালিবের সমকক্ষ এক প্রকাণ্ড দরবারি কবি। মুঘল দরবারে বিশিষ্ট কবি হিশেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন মাত্র উনিশ বছর বয়সেই। জৌকের আর-এক পরিচয়, তিনি ছিলেন আখেরি মুঘল বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরের (১৭৭৫-১৮৬২) উস্তাদ বা গুরু। জৌকের জন্ম দিল্লিতে। কাব্যক্ষেত্রে তাঁর মূল বিষয় প্রেম। জৌকের গজলের সমাদর আজও রয়ে গেছে উর্দু সাহিত্যের পাঠকের কাছে। গজল, কাশিদা, মুখম্মস সবেতেই তাঁর পারদর্শিতা লক্ষ্য করা যায়। জৌকের একটি জনপ্রিয় গজলের দুটি শের হাজির করছি, যাতে প্রেমের আদলে মৃত্যুর প্রতিমা গড়েছেন তিনি :

'মর্জ-এ-ইশক জিসে হো উসে ক্যা য়্যাদ রহে
ন দওয়া য়্যাদ রহে অওর ন দুয়া য়্যাদ রহে
তুম জিসে য়্যাদ করো ফির উসে ক্যা য়্যাদ রহে
ন খুদাঈ কী হো পরওয়া ন খুদা য়্যান রহে'

পর্যায়ক্রমে দাগ দেহলভী (১৮৩১-১৯০৫) নামটিও উচ্চার্য। পুরো নাম নবাব মির্জা খান দাগ দেহলবী। এঁর জন্ম পুরানী দিল্লির চাঁদনি চৌকে। পিতা নবাব সামসুদ্দিন আহমদ খান ছিলেন যুগপৎ লোহারু এবং ফিরোজপুর ঝিরকার শাসক এবং মাতা ওয়াজির খানুম দিল্লিবাসী এক জহুরির কন্যা। দাগের বয়স যখন সবে চার, এবং মায়ের চৌত্রিশ, গভর্নরের এজেন্ট উইলিয়াম ফ্রেজারের হত্যা-ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার দরুন

সামসুদ্দিনের ফাঁসি হয়। অতঃপর দিল্লির শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের ওয়ারিস মুঘল ক্রাউন প্রিন্স মির্জা মুহম্মদ ফাকরুর সঙ্গে মায়ের নিকাহ হলে দাগেরও সৌভাগ্যের তোরণ বারদিগর খুলে যায়। দিল্লির লাল কেল্লা থেকে তিনি উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন এবং পাশাপাশি শের ও শায়রির দুনিয়াতেও তাঁর আসনটি পাকা হয়ে যায়। পুরানী দিল্লিই ছিল দাগের সৃষ্টিপরিসর, যদিও তিনি হায়দরাবাদেও জীবনের শেষ অংশটি বাহিত করেন। মৃত্যুও ঘটে হায়দরাবাদে। গজল, কাশিদা, মুখম্মসের দরুন যশস্বী হয়েছিলেন। 'গুলজার-এ-দাগ' এবং 'দিওয়ান-এ-দাগ' বইদুটির জন্য তিনি আজও স্মর্তব্য। রোমান্টিক ও সেনসুয়াস লেখনীতে দাগের জুড়ি ছিল না—

'অভী হমারী মোহব্বত কিসী কো ক্যা মালুম
কিসী কে দিল কী হকীকৎ কিসী কো ক্যা মালুম
য়্যকীঁ তো য়ে হ্যয় উও খত কা জবাব লিকখেঙ্গে
মগর নবিশতা-এ-কিসমৎ কিসী কো ক্যা মালুম
অভী তো ফিত্রে হী বরপা কিয়ে হ্যঁয় আলম মেঁ
উঠায়েঙ্গে উও কয়ামৎ কিসী কো ক্যা মালুম
জনাব-এ-'দাগ' কে মশরব কো হম সে তো পুছো
ছুপে হুয়ে হ্যঁয় য়ে হজরত কিসী কো ক্যা মালুম'

মীর-ঘরানার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন দাগ দেহলভী। দাগের গজল স্বচ্ছ সরল, জটিলতা বা কৃত্রিমতায় আবিল নয়। শুধু ভাষা নয়, মীরের ভাবধারার সঙ্গে দাগের যোগসূত্র এমনই ঘনিষ্ঠ যে দাগের গজলকে অনেক সময় মীরের রচনা বলে ভ্রম হয়—

'অজব অপনা হাল হোতা জো বিসাল-এ-য়্যার হোতা
কভী জান সদকে হোতী কভী দিল নিসার হোতা'

উর্দু গজলের আর এক রৌশন সিতারা ছিলেন হায়দর আলি আতিশ (১৭৭৮-১৮৪৭) মীরের সমকালীনও ছিলেন, আবার তাঁর অনুগামীও। আতিশের দুটি মীর-গন্ধী শেরের নমুনা দেখুন—

১. 'সফর হ্যয় শর্ত, মুসাফির নওয়াজ বেতেহার
হজারহা শজরে-সায়াদার রাহ মেঁ হ্যঁয়।'
২. 'বুত-খানা তোড় ডালিয়ে মসজিদ কো ঢাইয়ে
দিল কো ন তোড়িয়ে য়ে খুদা কা মকাম হ্যয়।'

অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের লখনউয়ের কবি মীর অনীস (১৮০৩-১৮৭৪) ছিলেন মর্সিয়ার মহান শায়র, আবার গজলে মীরের অনুগামী। শুধু নামেই নয়, অনীসের কবিতাতেও মীরের প্রতিধ্বনি অবিকল শুনতে পাই—

১. 'আশিক কো দেখতে হ্যঁয় দুপট্টে তান কর
দেতে হ্যঁয় হম শর্বত-এ-দীদার ছান কর'
২. 'অনীস' দম কা ভরোসা নহীঁ ঠহর জাও
চরাগ লে কে কহাঁ সামনে হওয়া কে চলে'

শাদ অজীমাবাদী (১৮৪৬-১৯২৭) এই স্বরকেই আরও মধুময় করে তুলেছেন,

১. 'দিল-এ-মুজতর সে পুছ এয় রৌনক-এ-বজম
ম্যঁয় খুদ আয়া নহীঁ লায়া গয়া হুঁ।'
২. 'অব ভী ইক উম্র পে জীনে কা ন অন্দাজ আয়া
জিন্দগী ছোড় দে পীছা মিরা ম্যঁয় বাজ আয়া।'

এবং, তাঁর কাব্যশিষ্য সুপ্রসিদ্ধ শায়র, লেখক ও শিল্পী ইয়াগানা চঙ্গেজীর (১৮৮৪-১৯৫৬) মধ্যেও মীরের ছাপ দুর্লক্ষ্য নয়—

১. 'সমঝতে থে ক্যা, মগর সুনতে থে ফসানা-এ-দর্দ
সমঝ মেঁ আনে লগা জব তো ফির সুনা ন গয়া'
২. 'ক্যুঁ কিসী সে ওযফা করে কোঈ
দিল ন মানে তো ক্যা করে কোঈ
গালিব অওর মিরজা 'ইয়াগানা' কা
আজ ক্যা ফ্যয়সলা করে কোঈ'

গজলের এই ধারারই অনুগামী নজীর, হালি, ইকবাল এবং ফিরাক। প্রভাবিতদের সূচীতে আছেন ফানি, চকবস্ত, সরুর জহাঁবাদী, অসগর, হসরত, মোহানী, জিগর প্রমুখ।

অবশ্য, উর্দু শের-শায়রীর দুনিয়ায় মীর-অনুগামীদের সংখ্যা তুলনায় বেশি হলেও, শুধুমাত্র গজলের কথা যদি বলি, তখনকার বহু শায়র গালিব-পরম্পরায় গজল লিখেও এই জঁরকে উত্তুঙ্গ চূড়ায় নিয়ে গেছেন। গজলে গালিবের সার্থক উত্তরসুরী ছিলেন শেষ মুঘল বাদশা বাহাদুর শাহ জাফর (১৭৭৫-১৮৬২)। অধিকন্তু, জাফরের গজল নিয়ে খাস কথাও রয়েছে। বুড়ো বয়সে মসনদে বসেছিলেন ঠিক কথা, জাফর কিন্তু নিজ দেশকে মেহবুবার মতো ভালোবাসতেন। ১৮৫৭-এর ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম বিদ্রোহে নেতৃত্ব প্রদান করে বৃটিশের কোপ কটাক্ষে পড়েন জাফর এবং তাঁর জীবনে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। মেজর হাডসন যখন তাঁকে গ্রেপ্তার করতে হুমায়ুনের মকবরায় প্রবেশ করেন, যেখানে জাফর তাঁর দুই পুত্রকে নিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন, মেজর, যিনি অল্প-আধটু উর্দু জানতেন, বলেছিলেন, 'দমদমে মেঁ দম নহীঁ হ্যয় খ্যয়র মাঁগো জান কী, এয় জাফর ঠণ্ডী হুই অব তেগ হিন্দুস্তান কী।' তখন জাফর জবাবে হুঙ্কার সহ বলেছিলেন, 'গজিয়োঁ মেঁ বু রহেগী জব তলক ঈমান কী, তখত এয় লন্দন তক চলেগী তেগ হিন্দুস্তান কী।'

বাহাদুর শাহ জাফর কেবলমাত্র দেশভক্ত মুঘল বাদশাই ছিলেন না, উর্দুর একজন মহান কবি হিশেবেও তিনি সুপরিচিত। দেশাত্মবোধক কবিতায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি মূলত 'গালিবের ঘরানা'র ভাবাবেগ ও বেদনার শায়র। তাঁর গজলে সহৃদয়তা, ভাবালুতা ও চিত্রাঙ্কনী ক্ষমতার স্বাক্ষর স্পষ্ট। নিচের গজলটিতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবাদর্শ-গত স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যাবে :

'বাত করনী মুঝে মুশকিল কভী এ্যয়সী তো ন থী
জ্যয়সী অব হ্যয় তিরী মহফিল কভী এ্যয়সী তো ন থী
লে গয়া ছীন কে কৌন আজ তিরা সব্র ও করার
বে-করারী তুঝে এয় দিল কভী এ্যয়সী তো ন থী
চশম-এ-কাতিল মিরী দুশমন থী হ্মেশা লেকিন
জ্যয়সী অব হো গঈ কাতিল কভী এ্যয়সী তো ন থী
ক্যা সব্ব তু জো বিগড়তা হ্যয় 'জফর' সে হর বার
খুঁ তিরী হুর-শমাইল কভী এ্যয়সী তো ন থী'

সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের জীবনেতিহাস স্বয়ং একখানি ট্র্যাজেডি-কাব্য। কবিবর সুমিত্রানন্দন পন্ত লিখেছেন : 'বিয়োগী হোগা পহলা কবি, আহ সে উপজা হোগা গান।' জাফর সম্পর্কে একেবারে খাঁটি উক্তি। কবি হরিবংশ রায় বচ্চনের মন্তব্যটিও প্রণিধানযোগ্য—'জাফরের আন্তরিক বেদনার স্বর তাঁর শায়রীতে মুখর।' জাফর বাল্যবয়স থেকেই মুঘল সাম্রাজ্যের সমাসন্ন ধ্বংসের ইঙ্গিত বুঝেছিলেন। তাঁর বাল্যকালে গুলাম কাদির দিল্লি আক্রমণ করে। জাফর সেই হৃদয়বিদারক স্মৃতি মসীলিপ্ত করেছেন এমত ভাষায়—

'কোঈ আঁখ ন থী জো আঁসুয়োঁ সে পুরে নম ন থী
কোঈ দিল ন থা জো গম সে খালী থা,

করুঁ ইস সিতম কা ম্যঁয় ক্যা বয়াঁ
মেরা গম সে সীনা ফিগার হ্যয়।'

৩০ ডিসেম্বর ১৮৩৭ আকবর শাহর (দ্বিতীয়) মৃত্যুর পর তাঁর বৃদ্ধ পুত্র বাহাদুর শাহ জাফর 'বাদশাহ' তথা 'গাজীর' উপাধি গ্রহণ করেন। কার্যত তিনি ছিলেন বৃটিশসিংহের হাতের পুতুল। লালকেল্লা ব্যতিরেকে আর কোনও অঞ্চল তাঁর অধীনে ছিল না। এরপর আসে সেই মহাপ্রলয়, যাকে বহু ঔপনিবেশিক মনোভাবাপন্ন ইতিহাসবিদ নিছক 'সিপাহী বিদ্রোহ' বলে দেগে রেখে দিয়েছেন, আবার কারও-কারও চোখে যেটি ছিল 'ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম'। তখন বাংলা পত্রিকাসমূহে বিদ্রোহের বিরূপ সমালোচনা করে যেভাবে বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য বিদেশী প্রভুর কাছে মাথা খুঁড়েছিল, 'বৃটিশের রাজলক্ষ্মী স্থির রয় যেন' বলে বাঙালি ভীরুতা ও পদলেহনের যে প্রকাশ তাতে আমরা আজও লজ্জিত হয়ে আছি।[৩২] যাই হোক, ১৮৫৭ সনের ১১ মে বিদ্রোহীরা মেরঠ থেকে দিল্লি পৌঁছলে তাঁদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জরাজীর্ণ বয়স্বী সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর। পরিণামে কারাবাস এবং স্ব-পুত্রের ছিন্নমুণ্ড দর্শন।[৩৩] পরে মোকর্দমায় হেরে গিয়ে আজীবন কারদণ্ড ভোগের জন্য রেঙুন যেতে হয়েছিল তাঁকে। দিল্লি ত্যাগের আগে যে অরন্তুদ গজলটি তিনি লিখেছিলেন, তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করি :

'জলায়া য়্যার নে এ্যয়সা কি হম বতন সে চলে
বতৌর শমা কে রোতে ইস অঞ্জুমন সে চলে
ন বগবাঁ নে ইজাজৎ দী সয়র করনে কী
খুশি সে আয়ে থে, রোতে হুয়ে চমন সে চলে।'

জাফরের কাব্য স্রেফ তাঁর আত্মাভিব্যক্তি নয়, তাঁর আত্মজীবনীও বটে। তাঁর সমস্ত জীবনগাথা চমৎকার বাণীরূপ লাভ করেছে এই ক্ষুদ্র গজলটিতে—

'পসে-মর্গ মেরী মাজার পর জো দিয়া কিসী নে জলা দিয়া
উসে আহ! দামন-এ-বাদ নে সরেআম হী বুঝা দিয়া
মুঝে দফন করনা তু জিস ঘড়ী, তো য়ে উসসে কহনা কি এয় পরী
উও জো তেরা আশিক-এ-জার থা, তহ-এ-খাক উসকো দবা দিয়া'

দিল্লির ইশকিয়া গজল লখনউয়ে এসে সাগরসঙ্গমে মিলিত হলো। দিল্লির দরবারী কবিরা গজলকে ভারতের সাহিত্য করে তুলেছিলেন, আর লখনউয়ে এসে তা পেলো বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদা। 'বিশ্ব' কথাটা শুধু ভৌগোলিক নয়, কালিকও।

শক্তিহ্রাস হওয়া সত্বেও মুঘলরা দারুল-ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ছিলেন বহুকাল। দারুল-ইসলমা, অর্থাৎ মুসলিম অধ্যুষিত জায়গা সমূহে ঐস্লামিক হুকুমত কায়েম করার খোয়াব। খোদ অওরঙ্গজেব অন্তশয্যায় শুয়েও (মৃত্যু ১৭০৭) জিজিয়া কর উসুল করার ডিলিরিয়াম আউড়েছেন। তার পরেও মুঘলরা ভারতবর্ষকে 'স্বদেশ' বলে মেনে নিতে পারেনি। তারা বিলায়েৎ, অর্থাৎ স্বদেশ বলে জানত যে-যে দেশ থেকে তারা এসেছিল, সেই-সেই দেশকে।[৩৪] এ-প্রসঙ্গে সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের একটি কথা মনে পড়ছে। তিনি লিখেছেন, 'স্বভাবত ওই শাসকদের সমর্থক উলেমা-ওমরাহ-এলিট এবং তাঁদের প্রভাবে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় মুসলিম সমাজে পবিত্র বিলায়েত অবচেতনা গড়ে উঠেছিল।..... মুসলিম শাসকদের ভারতীয় হয়ে যাওয়া ঐতিহাসিক বাস্তবতা নয়।.... তুর্কি, আফগান, মোগল, পারসিক প্রমুখ সব মুসলিম শাসকই নিজ-নিজ বিলায়েতি রীতি ও ঐতিহ্য আঁকড়ে জীবনযাপন করেছেন।'[৩৫]

কিন্তু সাহিত্য-সংস্কৃতির দুনিয়ায় এই ধারানুবাহিকতার কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় লক্ষ্য করা যায়। এ-কথা ঠিক যে ভারতে বারবার অনুপ্রবেশকারী শক্তি এসে তার সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির ওপর প্রতিক্রিয়া ফেলেছে। ভারতীয় সমাজের মূল কাঠামো, যে বৈশিষ্ট্যই তার থাক, বহিরাগত নব্যনতুন সভ্যতা-সংস্কৃতির

অনুপ্রবেশে অনিবার্যত আনুষঙ্গিক প্রযুক্তি, আর্থনীতিক উপাদান, উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ও সম্পর্কঘটিত নতুন বিন্যাসের আঘাতে তা অবিকৃত থাকতে পারেনি। কিন্তু এর বিপরীতে, বহিরাগতরাও এদেশীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সভ্যতা থেকে পুরোপুরি বিচ্যুত থাকেনি। গালিব লিখেছেন হিন্দুদের পবিত্র ধর্মস্থান বারণসীকে নিয়ে প্রশংসাসূচক কবিতা, নজীর আকবরাবাদী লিখেছেন 'শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা', সাগর নিজামী গোপালকে নিয়ে মধুর গীত রচনা করেছেন, হালি ও ইকবাল হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের গান গেয়েছেন। সুতরাং গজলের ভারতীয়ত্বে কারও দ্বিমত থাকার যুক্তি নেই।

বিশেষত উর্দু গজলের ইতিহাস ঘেঁটে আমরা দেখতে পেয়েছি যে এর উদ্ভব ঘটেছে গুজরাত ও দাক্ষিণাত্যে, সংস্কার ও বিকাশ ঘটেছে দিল্লিতে এবং পরবর্তী বিকাশ ও পরিণতি লাভ করেছে লখনউ ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলসমূহে। প্রথম পর্বের গুরু ওয়লি দখিনী, দ্বিতীয় পর্বের নেতা মীর ও গালিব এবং তৃতীয় পর্বের সম্রাট ফিরাক গোরখপুরী। তিনটি পর্বে গজলের চিরায়ত রূপ অক্ষুণ্ণ থাকলেও, বলা বাহুল্য, পারিপার্শ্বিকতায় বিষয়গত অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

এই পরিবর্তন সুস্পষ্ট অবয়ব গ্রহণ করেছে ১৮৫৭-এর পর। সৈয়দ আলতাফ হুসেন হালির সময় থেকেই সংস্কারবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। তাঁর পূর্ববর্তী কালে যেসব কবি গজলের পরম্পরাগত ভাবধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নজীর আকবরাবাদীর (১৭৩৫-১৮৩০) নাম সর্বাগ্রগণ্য। অতীব বিস্ময়কর ও দুঃখজনক, যে, যাঁকে 'ফাদার অফ নজম' শিরোপা দেওয়া হয়েছে, সেই মহান শায়র নজীর আকবরাবাদী উর্দুসাহিত্যের ইতিহাস-লেখকদের কাছে চিরকাল উপেক্ষিত থেকেছেন। নজীরের মূল নাম ওয়লি মুহম্মদ। তাঁর জন্ম দিল্লিতে হলেও কর্মজীবন আগ্রায়। যেসময় হিন্দুস্তানের বাদশা ছিলেন মহামহীম আকবর, তখন থেকেই আগ্রা পরিচিত ছিল আকবরাবাদ নামে। ১৭৩৯ সনে নজীর যখন অতিশয় শিশু, নাদিরশাহর আক্রমণে দিল্লি তছনছ হয়ে যায় এবং নজীরের পিতা মুহম্মদ ফারুক কারাবন্দী হন। চতুর্দিকে লুঠতরাজ আর খুনোখুনির আতঙ্কে অনেকের মতো নজীরের মা আর ঠাকুমা আকবরাবাদে পালিয়ে আসেন। এই আকবরাদেই নজীরের উত্থান। সত্যি বলতে কী, নজীর আকবরাবাদী মীরের সমকালীন শায়রদের মধ্যে অগ্রগণ্য, যিনি ভারতীয় সংস্কৃতি ও পালা-পার্বন, হোলি, দেওয়ালি, শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে নজম রচনা সূত্রেও শ্রদ্ধেয়। নজীরই উর্দুতে প্রাকৃতির কবিতার ভিত্তিশিলা পুঁতেছিলেন, যা পরবর্তী কালে আলতাফ হুসেন হালি এবং মুহম্মদ হুসেন আজাদের হাতে ইমারতের রূপ পরিগ্রহ করে। নজীর মূলত লোককবি। সাধারণের কথাই তাঁর কথা। তাঁর ভাষা সম্পর্কে ড. ব্রজরত্ন দাস লিখেছেন, 'এঁর ভাষা ছিল দেশী আর তাকে বিলেতি বানানোর চেষ্টা কখনও করেননি। চলতি ভাষায় ষোলো আনা দখল ছিল, তাই ফার্সি কিংবা আরবি অভিধান থেকে শব্দ নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেননি। যেমন বিষয়, তেমনি ভাষা, আর তেমনি বাস্তবধর্মী চিত্রণ।'[৩৬]

নজীরের বাস্তবপ্রিয়তা তাঁর গজলকে জনপ্রিয়তা দান করেছে। নমুনা স্বরূপ তাঁর দারিদ্র বিষয়ক একটি গজলের উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। অনেক কবিই দারিদ্রের গুণগান করেছেন। আমাদের বিদ্রোহী কবিকে দারিদ্র 'মহান' করেছে। ইংরেজ কবির ভাষায় : 'Sweet are the uses of adersity.' অর্বাচীন কবি লিখছেন : 'আমি চাই ছোটঘর বড় মন লয়ে, নিজের দুখের অন্ন খাই সুখী হয়ে।' কিন্তু নজীর দারিদ্র বা মুফলিসীকে দেখেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন চোখে :

> 'জব আদমী কে হাল পে আতী হ্যয় মুফলিসী
> কিস-কিস তরহ সে সতাতী হ্যয় মুফলিসী
> প্যায়াসা তমাম রাত রোজ বিঠাতী হ্যয় মুফলিসী
> ভুখা তমাম রাত সুলাতী হ্যয় মুফলিসী।'

অওধের শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শাহর (১৮২২-১৮৭৩) প্রকৃত নাম ছিল অবুল মনসুর মির্জা মুহম্মদ ওয়াজিদ আলি শাহ। তিনি ছিলেন একাধারে সংগীতবেত্তা, নর্তক, গায়ক ও শায়র। পারফর্মিং আর্টের প্রতি

অপেক্ষাকৃত বেশি দুর্বলতা থাকলেও, ওয়াজিদ আলি শাহ স্বয়ং একজন উঁচু মাপের গজলকার ও ঠুমরি রচয়িতা ছিলেন। তিনি তাঁর দরবারে বেশ কিছু লেখক ও কবিকে সংরক্ষণ প্রদান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বরাক, আহমদ মির্জা সবীর, মুফতি মুনশি এবং আমির আহমন আমির সবিশেষ উল্লেখনীয়। উর্দু, আরবি এবং ফার্সিতে সুশিক্ষিত তথা শিল্পকলার জহুরি ওয়াজিদ আলি শাহ স্বয়ং অসংখ্য বেহেত্রিণ ঠুমরি ও গজল সৃষ্টি করেছেন। তাঁর লেখা একটি দুর্লভ গজল এরকম :

'সাকী কী নজর সাকী কা করম
সও বার হুই সও বার হুয়া
য়ে সারী খুদাঈ য়ে সারা জহাঁ
ম্যয়খরার হুই ম্যয়খরার হুয়া
জব দোনোঁ তরফ সে আগ লগী
রাজী-ও-রজা জলনে কে লিয়ে
তব শম্মা উধর পরওয়ানা ইধর
তৈয়ার হুই তৈয়ার হুয়া'

অবশেষে এলো বিংশ শতক। উনিশ শতকী বিশ্বাসের কেল্লা চুরমার হলো বিশ শতকী বাস্তবানুভূতিতে। প্লাটোনিক প্রেম আর ভাবালুতার জোলো মনোভূমি নিমেষে বদলে গেল ধূ ধূ মরুস্থলে। স্বপ্ন ও কল্পনার গজদন্তমিনার ভেঙে গেছে, পড়ে আছে নিছক স্মৃতির চুনসুরকি। বস্তুত, বিদায়মান উনিশ শতকী প্রাণনে ফুটেছিল ব্যক্তিত্ব বিকাশ, যা চূর্ণ হলো বিশ শতকী রাষ্ট্রিক অখণ্ডতায়। মধ্যবিত্ত ও বিধ্বস্ত কবি-শায়রদের মনেও তীব্র উচাটন ও অস্থিরতা। তাঁরা পড়লেন মহা ফাঁপরে, প্রশ্নের বেষ্টনে। পরাধীনতা, বঞ্চনা ও নির্যাতনের বোঝ অসহ্য হয়ে উঠছে। জাগছে চেতনার দিগ্বাহী চোরাস্রোত। প্রসুপ্ত আক্রোশ ও দ্রোহ দাবাগ্নির মতো ধিকিয়ে ধিকিয়ে ফুঁসে উঠছে কেবল। দিকে দিকে লৌহকপাট ভাঙার আকুলতা ও গণজাগরণের জোয়ার। এবার তাঁদের, কবি-শায়ীদের পালা। গজল লিখিয়েদের মধ্যে, যাঁরা ছিলেন অগ্রভাগে, তাঁদের মননে ও সৃজনে দানা বাঁধল জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতার আকাঙ্খা, প্রগতিবাদ, প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ। প্রসঙ্গত এখানে নথি হতে পারে কীভাবে গজলকাররা সমকালীন বিপ্লবকামী প্রগ্রেসিভ রাইটার্স মুভমেন্টে জড়িয়ে পড়েছিলেন, যার দরুন গজলবিশ্বে তিনটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রথমটি অবশ্যই কালচারাল ল্যান্ডস্কেপে এলো নতুন জোয়ার যা ভারতীয় মিশ্রসংস্কৃতিকে আরও মজবুত হতে মদত যোগালো। দ্বিতীয়ত, উর্দু গজলের ধ্রুপদী অন্বেষনের বাতায়ন খুলে রূপক, প্রতীক এবং চিত্রকল্পে এলো নতুনতর অভিব্যক্তি। এবং, তৃতীয়ত, বিশ্বভুবনে জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে চতুরায়তনিক আবিষ্কার গজলকারদের মধ্যে গড়ে তুলল নিও-ক্লাসিসিস্ট, প্রগ্রেসিভ, মডার্নিস্ট এবং পোস্ট-মডার্নিস্টদের এক অফুরন্ত কাতার।

প্রসঙ্গত এখানে আমি স্যার সৈয়দ আহমদ খানের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করব, বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালেই যিনি বলেছিলেন, 'হিন্দুজ অ্যান্ড মুসলিমস আর টু আইজ অফ দ্য বিউটিফুল ব্রাইড দ্যাট ইজ হিন্দুস্তান।' এই সজাগ ও বেবাক উচ্চারণ বিশ শতকের। কিন্তু সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) ছিলেন উনিশ শতকের প্রখ্যাত ইস্লামিক প্র্যাগমাটিস্ট, ধর্মসংস্কারক, দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ। ইনিই আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। রাজনৈতিক মঞ্চে খান সাহেব ছিলেন সেসময়কার সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা। প্রকৃত ইসলাম ও মুসলিম দরদী হয়েও যে তিনি হিন্দু-মুসলিম ভ্রাতৃত্বের পক্ষপাতি ছিলেন, তা ছিল তাঁর আস্থা ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক। উর্দু গজল লিখিয়েদের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের আকাঙ্খা, কিছুটা-হলেও, তিনিই চাগিয়েছিলেন। মুসলিম ভাবের জগতে এহেন মস্ত মাপের মনবদল কিংবা বাঁকবদল ইতিপূর্বে দেখা যায়নি।

আগেই বলেছি, মৌলানা সৈয়দ আলতাফ হসেন হালি ছিলেন প্রথম উর্দু জাতীয়তাবাদী কবি এবং সৃজনের মাধ্যমে অখণ্ড ভারতের সেবা করাই ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এই মনোধারাই উত্তরণ দেখি

ইকবালের (১৮৭৭-১৯৩৮) লেখনীতে, যদিও উভয়ের জাতীয়তাবাদ দুই বিপরীত মেরুর। ইকবালের পুরো নাম স্যর মুহম্মদ ইকবাল মসৌদী। জন্ম পাঞ্জাবের (অধুনা পাকিস্তানের অংশ) সিয়ালকোটে, এক কাশ্মিরী পণ্ডিতবংশে। পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে এম এ করার পর কিছুকাল লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজে এবং পরে সরকারি কলেজে অধ্যাপনা, এবং তারও পরে বিলেতযাত্রা তথা কেমব্রিজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে উপাধি লাভ এবং জার্মানির মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টর' উপাধি লাভ কবির যৌবন-বয়সের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পরবর্তী জীবনে ইনি একাধারে কবি, নেতা ও দার্শনিক। পাকিস্তানের রাষ্ট্রকবি রূপে পূজিত এবং 'অলামা ইকবাল' (বিদ্বান ইকবাল), 'মুফফকির-এ-পাকিস্তান' (পাকিস্তানের ভাবুক), 'শায়র-এ-মশর্রিফ' (পূর্বের শায়র) এবং 'হাকিম-উল-উম্মৎ' (উম্মা বিদ্বান) শিরোপায় ভূষিত। ইংল্যান্ডে ব্যারিস্টারি এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যপনার সময়েই তাঁর ইকবালের কাব্যচর্চার সন্নিধাপন। উর্দু ও ফার্সিতে তাঁর শায়রি আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শায়রি হিশেবে পরিগণিত। মুসলিম-হিন্দু দুই সম্প্রদায়ের কাছেই তাঁর শায়রি অতিশয় প্রিয়। ইকবালই প্রথম বৈদিক গায়ত্রীমন্ত্রের উর্দু তর্জমা করেন। 'মঙ্গলময় ঈশ্বর সকলের ঈশ্বর'—এই ছিল তাঁর প্রত্যয়—

'একই মাটিতে জলে আমি বানালাম বিশ্ব,
তুমি ভিন্ন ক'রে না দিলে ইরান, তাতার, জাঞ্জিবার;
মৃত্তিকার অনুকণা দিয়ে আমি বানালাম লোহা,
তুমি তাই দিয়ে তৈরি করেছো তরোয়াল, তীর আর বন্দুক।'[৩৭]

প্রকৃতপক্ষে ইকবাল ছিলেন মুসলিম জাতীয়তাবাদী কবি। গোড়ার দিকে, ভারতের তথাকথিত স্বাধীনতা হাসিলের আগে, ইকবালের মন্ত্র ছিল—'হিন্দোস্তাঁ হমারা'। তিনি সেসময় 'তরানা-এ-হিন্দ' (ভারতবর্ষের গীত) লিখেছিলেন, যার প্রথম পংক্তিটি ছিল : 'সারে জহাঁ সে অচ্ছা, হিন্দোস্তাঁ হমারা।' ঐসময় তিনি 'হিন্দী হ্যয় বতন হমারা' স্লোগানের মাধ্যমে অখণ্ড ভারতের মানুষকে মিলেমিশে থাকার পাঠ দিতেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সেই গানের শব্দকলাপ পালটে যায়। তিনি তখন লিখলেন, 'চীন-ও-অরব হমারা, হিন্দোস্তাঁ হমারা, মুসলিম হ্যয় বতন হমারা সারে জহাঁ সে অচ্ছা।' ইকবালই প্রথম যিনি পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টিয়ার প্রান্ত, সিন্ধ আর বেলুচিস্তানকে মিশিয়ে একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব এনেছিলেন। ১৯৩০ সনে ইকবালের নেতৃত্বেই মুসলিম লীগ প্রথমদফা ভারতের বিভাজন ও পাকিস্তান গঠনের দাবি পেশ করেছিলেন। যে-প্রস্তাব জিন্নাকে নিয়ে আসে মুসলিম লীগের ব্যানারে।

এতদসত্বেও, উর্দু সাহিত্যে ইকবালের অবদান অবিস্মরণীয়। পরবর্তী কালে তাঁর কৃত্যের প্রায়শ্চিত্য তিনি হয়ত করে যেতে পারেননি, কিন্তু তার বেদনার অশ্রুও গোপন থাকেনি। 'আসরার-এ-খুদি' (আত্মতত্ব) গ্রন্থে তাঁর একটি গজল এইরকম :

'আ গয়রিয়ত কে পর্দে ইক বার ফির উঠা দেঁ
বিছুড়োঁ কো ফির মিলা দেঁ, নকশোঁ দুই মিটা দেঁ
সুনী পড়ী হুই হ্যয় মুদ্দত সে দিল কী বস্তী
আ ইক নয়া শিবালা ইস দেশ মেঁ বসা দেঁ
দুনিয়া কে তীরথোঁ মেঁ উঁচা হো অপনা তীরথ
দামন-এ-আসমাঁ মেঁ উসকা কলম মিলা দেঁ
হর সুবহ উঠকে গায়োঁ মন্তর উও মিঠে মিঠে
সারে পূজারিয়োঁ কে ময় পীত মেঁ হ্যয়
ধরতী কে বাসিয়োঁ কী মুক্তি পিরোত মেঁ দেঁ'

এতদসত্বেও, যখনই আমরা 'উর্দু গজল' শব্দ দুটি একত্রে উচ্চারণ করি, আমাদের মনে আরও কিছু শব্দের হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়—কমনীয়তা, মননশীতা, এক সংগুপ্ত বা পুশিদা রহস্যের অনুভূতি, ভাবনার ঘনত্ব,

কাঠামোগত বা স্বরলিপির বাঁধন ও অভিপ্রায়, আবিষ্ট কল্পনা, সহজাত সুরময়তা, এবং অর্থের প্রোচ্চ সৌন্দর্য। গজলের দুই পংক্তিবিশিষ্ট প্রতিটি শের পাঠকের মনে এক-একটি কাল্পনিক ছবি এঁকে চলে, যা মূলত প্রেম, —আস্তিত্বিক ও সর্বজনীন, উভয়ত। গজলের দুনিয়া কল্পনা আর রূপকের খড়কাঠি দিয়েই গড়া। সিংহভাগ উর্দু শায়রের গজলে এই মূলগত বৈশিষ্ট অবশ্য বিশ শতকেও অক্ষুণ্ণ থেকেছে। কেননা, এই বৈশিষ্ট্যই তার প্রাণশক্তি।

ইকবালের পরে হাফিজ জালন্ধরীর (১৯০০-১৯৮২) নাম স্মর্তব্য।জলন্ধর শহরে জন্মেছেন বলে তাঁর নামের পেছনে জালন্ধরী কথাটা যুক্ত। জালন্ধরের প্রতি ভালোবাসা তাঁর গজলে ব্যক্ত।ইসলামের প্রতি ষোলো আনা শ্রদ্ধা সত্ত্বেও হিন্দু পুরাণ থেকে রস নিয়ে তিনি অনেক গজলের শের লিখেছেন—

'রাধা য়ু্য নাচে বেকটক দরিয়া কিনারে
চলো মঝধার গোরী কালে কিষণ সঙ।'

আঙ্গিক ও ভাবের এই ঐক্যসাধনই হাফিজকে বিশিষ্ট করেছে।তাঁর গজলে একটি শব্দের সঙ্গে অন্য একটি শব্দের, একটি মিসরার সঙ্গে আর একটি মিসরার এবং একটি শেরের সঙ্গে দ্বিতীয় শেরের যে অনন্যাশ্রয়ী সম্বন্ধ, তাতে এক নতুন অর্থ, নতুন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়।'বসন্ত' এবং 'অভী তো ম্যঁায় জওয়ান হুঁ' গজল দুটি তার প্রমাণ। 'জলওয়ায়ে সহর' কাব্যগ্রন্থের গজলগুলিতেও এই বৈশিষ্ট্য দুর্লক্ষ্য নয়।

উনিশ শতকীয় গজলের ভাবধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সেখানে যে প্রেম প্রতিবাহিত হয়েছে তা নরনারীর নয়, পুরুষ ও নারী নির্বিশেষের—অর্থাৎ মানুষের।সেই কবে চণ্ডীদাস বলেছিলেন—'শুনহ মানুষ ভাই—সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' আর সেই সত্যই পুনরাবিষ্কৃত হল উনিশ শতকে। এ-যুগের গজলেও দেখি উর্দু গজলকারেরা মানুষের জীবন ও ধর্মকর্মের ওপর ঐকান্তিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অর্থাৎ পরম-পুরুষার্থকে স্বীকার করেছেন। এটাই ছিল সে-যুগের মানববাদ বা হিউম্যানিজম। আর বিশ শতকের দাপাদাপি নিও-হিউম্যানিজম নিয়ে। উনিশের বিশ্বাসের দুর্গ চুরমার হলো বিশশতকী বাস্তবানুভূতিতে। ভাবালুতার জোলো জমি শুকিয়ে দেখা দিল ধু ধু মরু।কল্পনার ইমারত ভেঙে গিয়ে পড়ে রইল স্মৃতি চুনসুরকি। মধ্যবিত্ত-মানস এগিয়ে এল প্রশ্নের খড়্গ নিয়ে। কবিদের কাঁধে পড়ল দায়িত্বের বোঝা। আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মচেতনা আর আত্মঅভিজ্ঞানের সন্ধানী আলো ফেলে শুরু হল আধুনিক গজলের পথচলা। প্রবল সময়ানুভূতিই জন্ম দিয়েছিল নজীর হালি ইকবালকে, এবং নতুন বাঁকের মুখে আবির্ভূত হলেন সুফি মুর্শীদ ওরফে হসন নিজামী।

কবির পুরো নাম শামসুল উলেমা খ্বাজা হসন নিজামী (জন্ম ১৮৮০, মৃত্যু ১৯৫৫)। ইনি একাধারে কবি, লেখক, দার্শনিক ও ধর্মগুরু। 'দিল্লিতে উর্দুর প্রসার ও ব্যাপকতায় যে ক'জন লেখকের ভূমিকা স্মরণীয়, হুসন নিজামী তাঁদের একজন।'[৩৮] গজলে হসন ছিলেন আশ্চর্যভাবে সৃষ্টিশীল। কলমই ছিল তাঁর সমস্তরকমের প্রতিবাদের হাতিয়ার—

'অচ্ছী অওর বুরী মওত ক্যা ফর্ক
কলম কী বিজলী সে দিখা দিয়া।'

গজলের ক্ষেত্রে হসন নিজামী ছিলেন বলী, মীর, গালিব ও সওদার সার্থক উত্তরসূরি। হিন্দির সঙ্গে ফারসির কষ্টলব্ধ সমন্বয়ে তিনি গজলের বিকাশকে অনেকটা তরান্বিত করতে পেরেছেন।—

'ভুলে ন ইশক পে ডুবো বদকশাঁ হালিম মুঁ
দিল ন ঠহরা গুলো-গুলিস্তাঁ-এ-মহম্মদ।'

জোশ মলিহাবাদী প্রাক-'স্বাধীনতা' যুগের উর্দু গজলকারদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। নিজের 'জোশ' উপন্যাসটির মতোই তিনি বহু বিতর্কিত। এই বিতর্ক তাঁর স্ববিরোধকে ঘিরে।একদিকে তিনি সাম্যবাদকে মুক্তির একমাত্র উপায় মনে করেন, অন্যদিকে যন্ত্রের সাহায্যে সমস্যায় সমাধান তথা নগরজীবনে

গ্রামীণতার প্রাধান্যকে আহ্বান করেন। একদিকে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিকে অর্থসাহায্য করে লেখেন —'নিশ্চিত জানি জয় আপনাদের মুহূর্তে মুহূর্তে'[৩৯] অন্যদিকে সদস্যতা গ্রহণ করেছেন কংগ্রেসের। শববীর হসন খাঁ 'জোশে'র (১৮৯৫-২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২) এই স্ববিরোধিতা তাঁর সৃষ্টির সর্বত্র। নমুনাস্বরূপ নিচের রুবাইটি পড়া যাক—

'ঝুঁকতা হুঁ কভী রগে-খাঁ কী জানিব
উড়তা হুঁ কভী কহকশাঁ কী জানিব,
মুঝ সে দো দিল হ্যয় এক মামল-ব-জমী
অওর এক কা রূখ হ্যয় আঁসমাঁ কী জানিব।'

ইংরেজদের যেমন ভারতীয় অস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল, জোশ মলিহাবাদীর শের সেই সব অস্ত্রের মধ্যে একটি—

'ক্যা হিন্দ কা জিন্দাঁ কাঁপ রহা হ্যয় গুজ রহী হ্যঁয় তকবীরে
উকতায়েঁ হ্যঁয় শায়দ কুছ কয়দী অওর তোড় রহে হ্যঁয় জঞ্জীরে।'

'ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পনী কে ফরজল' নামে যে কবিতাটি পড়ে ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে, তার শেষ শেরটি ছিল এইরকম—

'বক্ত লিখেগা কহানী ইক নয়ে মজমুন কী
জিসকী সুর্খী কো জরুরত হ্যয় তুমহারে খুন কী।'

আর একটি কবিতায় জোশ লিখেছিলেন—

'উঠো, চৌকো, বঢ়ো, মুঁহ হাথ ধো, আঁখো কো মল ডালো
হওয়ায়েঁ ইনকলাব আনে কো হ্যয় হিন্দোস্তাঁওয়ালোঁ।'

দেশ-বিভাজনের পর হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধে, তখন জোশের বুক ভেঙে বেদনাধারা গড়িয়ে পড়ে এই গজলে—

'বুজহল কী শরাব সে ছবকা কে জাম কো
বট্টা লগা দিয়া হ্যয় মুহম্মদ কে নাম কো।
বখশা হ্যয় তাজ রাওনে দোজখ মুকাম কো
জিল্লত কী ঘাটিয়াঁ মেঁ গিরায়া হ্যয় রাম কো।'

দেশবিভাগ এবং উর্দু 'আজকাল' পত্রিকার সম্পাদনা—জোশ মলিহাবাদী সম্পর্কে নিছক সংবাদ নয়, জোশের রচনা ও জীবনদর্শনের মূল্যায়নে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। দেশবিভাগের পর জোশ কী আকাঙ্ক্ষায় পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন জানি না, কিন্তু সেখান থেকে ফিরে ভারত সরকারের উর্দু মাসিক 'আজকাল'-এর সম্পাদক পদে যোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রগতিবিমুখ হয়ে পড়েন, যা আমাদের ক্ষোভের কারণ। তাঁর কাব্যচর্চার ধারাই আমূল পরিবর্তিত হয়ে যায়। আসলে, 'কবিদের যা সবচেয়ে শত্রু তা দারিদ্র্য নয়, অবহেলা নয়, উৎপীড়ন নয়—তা অত্যধিক সাফল্য, তা বহুবিস্তৃত বিজ্ঞাপন।'[৪০] এই কারণে জোশকে ঠিক 'বিপ্লবের কবি' বলা যায় না। অথচ তিনি যে একসময় বিপ্লবেরই কবি ছিলেন, সেই স্মৃতি ভোলা যায় না—

'আনেওয়ালা কভী নহীঁ আতা
জানেওয়ালে কী য়্যাদ আতী হ্যয়।'

রঘুপতি সহায় ওরফে ফিরাক গোরখপুরী (২৮ আগস্ট ১৮৯৬- ৩ মার্চ ১৯৮২) থেকে শুরু হয়েছে উর্দু গজলের নতুন যুগ। শুধু গজল নয়, নজম কিংবা রুবাইয়েই নয়, কতএ কিংবা অদবেই নয়, ফিরাক সর্বোতভাবে নিজেকে নিবেদিত রেখেছিলেন দেশ ও দশের নানা উন্নয়ন মূলক কাজে।ব্যক্তিস্বাধীনতায়,

বাকস্বাধীনতায়, গণতন্ত্র রক্ষায়, সমাজবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রচারে তাঁর ভূমিকা ছিল পুরোদমে। সবের মধ্যে তাঁর সঞ্চরণ-বিচরণে ছিল না কোনো তালগোল পাকানো ভুয়োদর্শী ব্যাপার। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণ ছিল ক্ষমাহীন। জীবনের আদর্শ ও দর্শনের দিক থেকে কোন অদৃশ্য শক্তি তাঁকে আমরণ 'লড়াকু' করে রেখেছিল জানি না, কিন্তু তাঁর বিপুল সৃষ্টিসম্পদ আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। আরও বিচিত্র তাঁর জীবনেতিহাস।[৪১] পিতা ও সহোদরের মৃত্যু, কংগ্রেসে যোগদান, কারাবাস, বিভিন্ন পুরস্কার ও খেতাব লাভ, সর্বোপরি হিন্দুধর্মের প্রভাব কুত্রাপি তাঁর কাব্যকে স্পর্শ করতে পারেনি। ধর্মীয় ধ্যানধারণায় তিনি হিন্দুজাত হয়েও, ছিলেন নিরপেক্ষ।কবিতাকে তিনি নিয়ে গেছেন জনবোধের বাঁধানো পথে এবং যিনি ছিলেন শায়র-এ-শবাব (রূপের কবি) তিনি হয়েছেন শায়র-এ-ইনকলাব (বিপ্লবের কবি)।

বাহারউদ্দীন লিখেছেন, 'মধ্যযুগীয় সামন্ত চেতনা থেকেই ফিরাকের কবিস্বভাবের যাত্রা—আর এই উত্তরণ ঘটল আধুনিক কালে, এলিয়ট, পাউণ্ডের বুদ্ধিবাদী জগতে।' ফিরাক ছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির পুরোহিত, হিন্দু-মুসলিম মিলনের প্রতীক। তিনি হিন্দু মিথের তামাম প্রতীকগুলিকে দিয়েছেন শৈল্পিক অমরতা। ঘুংঘট, চিরাগা, রুহে কায়নাত, শব্দমিস্তা, অন্দাজেঁ, রমজো-কায়নাত, গুলিস্তাঁ প্রভৃতি সংকলনে ইশক আর মোহব্বতের বুদবুদ যে পাত্রে তুলছেন, সেই পাত্রেই ঘটেছে উপনিষদের মন্থন—

'ফিতরৎ কী খনওতোঁ মেঁ ডালে ফেরে
পেচোখম জীস্ত কে লগায়ে ফেরে।'

গতিজ বিবর্তনে বিশ্বাসী ফিরাকের গজলে তাই আমরা দেখতে পাই অরব-ইরানের সহবর্ণনা। এই বাঁকের মুখেই কাব্যকৃতি বা বিষয়ানুগত্যের প্রশ্নে ফিরাকের বিপ্লব। আমার মতে উর্দু গজলকারদের মধ্যে গালিবের পরেই ফিরাকের স্থান। মীর আর গালিবের পর শ্রেষ্ঠ গজল-রচয়িতা ফিরাক। তাঁর গজল দর্দে-দিল দর্দে-জিগরের অভিব্যক্তি—

'রাজ কো রাজ হী রখা হোতা
ক্যা কহনা গর এ্যয়সা হোতা।
য়ে নির্জন বন য়ে সন্নাটা
গর কোই পত্তা খড়কা হোতা।
ম্যঁয় হুঁ দিল হ্যয় তনহাই ভী
তুম জো হোতে তো অচ্ছা হোতা।'

ফিরাক ইশকিয়া গজলকে নতুন চরিত্র প্রদান করেছেন। প্রথম দিকের রচনায় মীর, গালিব, দাগ, জিগর, দর্দ, ফয়েজ প্রমুখের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। পরে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কিটস, কোলারিজের প্রভাবও পড়েছিল। এবং তারও পরে বাল্মীকি, ব্যাস ও কালিদাসের। কোনো রংই কিন্তু চড়া হয়ে ওঠেনি, বৃদ্ধ বয়সের রচনাতে তো নয়ই—

'কিস লিয়ে সে নহীঁ হ্যয় দর্দ ফিরাক
অব তো ওহ ধ্যান সে উতর হী গয়ে।'

ফিরাক খেয়ালি শায়র,—লিবারেল কবি বললেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি বলেছেন—'আমি সারা জীবন বুলন্দ-তরীন, পাকিজা-তহীন ও খঁরু-ও-বরকত দিয়ে গজলকে সাল, কারা করে তোলার চেষ্টা করেছি। ইনসানিয়ৎকে গভীর ও বলিষ্ঠ ভাবে দেখেছি। গজলই তো একমাত্র মাধ্যম, যা আমার হৃদয়ের জ্বালাকে হালকা করে আমাকে শান্তি দেয়।'—

'য়হ জিন্দগী কে কড়ে কোস য়্যাদ আতা হ্যয়
তেরী নিগাহেঁ-কর্ম কা ঘনা-ঘনা সায়া।'

ফিরাকের গজল আন্তর্দেশীয় খ্যাতি পেয়েছে, লোকের মুখে মুখে ফিরছে তাঁর শের—

'অল ফিরাক অল বিদা হে অহলে বতন

ইক অনসুনী আওয়াজ বুলাতী হ্যয়।
অব তুম সে রুখসৎ হোতা হুঁ
নয়ে তরানে ছেড়ো, মুঝে নীঁদ আতী হ্যয়।।

ফিরাক আজ চিরনিদ্রায় শায়িত, কিন্তু রয়ে গেছে তাঁর ফিরাক-সমুদ্র।তার জলে অবগাহন করেই আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারি এই অদ্বয় স্রষ্টাকে—

‘য়্যাদ আতী হ্যাঁয় উসকী বাতেঁ লেকিন দিল পর য়ে নহীঁ খুলতা
কিন বাতোঁ পর অশক বহায়েঁ, কিন বাতোঁ সে জী বহলায়েঁ।’

ফিরাক একবার বলেছিলেন—‘কোনো দেশের ওজিরে-আজমের (রাষ্ট্রপ্রধান) সিংহাসন এক মুহূর্তের জন্যেও খালি পড়ে থাকে না। কিন্তু শায়রে-আজমের সিংহাসন একবার শূন্য হলে তা যুগ যুগ ধরে শূন্যই পড়ে থাকে।’ গালিবের পর ফিরাক নিজেই ছিলেন আর এক ‘শায়র-এ-আজম’, যাঁর মৃত্যুর পর এযাবৎ কেউ আবির্ভূত হননি যিনি সেই সিংহাসন দাবি করতে পারেন। আত্মবিশ্বাসী ফিরাক জীবনসায়াহ্নে তাই বলে গিয়েছেন—

‘আনেওয়ালী নসলেঁ তুম পর ফখ্র করেঙ্গী হম অসরো
উনকো জব মালুম য়ে হোগা, তুমনে ফিরাক কো দেখা থা।’

তবুও উর্দু গজল-ক্ষেত্রে তৎপরতার অভাব ঘটেনি। গজলের রীতি-প্রকৃতি-ভঙ্গি নিয়ে চর্চায় এবং নতুন ভাবধারার সন্ধানে ব্রতী আছেন অনেকে। এঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করব মহম্মদ সমর য়্যার খাঁ ওরফে সাগর নিজামীর (১৯০৫-২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪)। সাগর নিজের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে—

‘ম্যাঁয় হুঁ অপনে বতন কে পূজারী
বগাওত জওয়ানোঁ কা মজহব হ্যয় সাগর
গুলামী হ্যয় পীরী বগাওত জওয়ানী।’

সাগর নিজামী স্বভাবতই বিপ্লবকামী ও দেশহিতৈষী। তাঁর ‘ওয়াদা-এ-মশরিকে’ সংকলিত কবিতাগুলির ভূমিকা লিখতে গিয়ে সরোজিনী নাইডু লিখেছিলেন—‘কবিতাগুলি নবযুবকদের প্রেরণা হোক।’ এটিই সাগরের সর্বাধিক বিক্রীত বই (প্রায় ৫০টি সংস্করণ)। ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর ‘মশাল-এ-আজাদী’ নজরুলের ‘অগ্নিবীনা’র সমকক্ষ। সাতচল্লিশের আগে উর্দু গজলে সাগর যে প্রাণচাঞ্চল্য এনেছিলেন, তার জন্যে তাঁকে জোশের পাশে স্থান দিতে আমাদের কুণ্ঠা নেই। উর্দু গজলে ‘ইনকলাব’ শব্দটির প্রথম ব্যবহার জোশের হাতে, আর তা ব্যঞ্জিত হয়েছে সাগরের কলমে—

‘ইস ইনকলাব নে কতরে কো শয়লে আব কিয়া
ইস ইনকলাব নে জর্বে কো আফতাব কিয়া।’

আশাবাদী শায়র সাগর নিজামীর গজলে আছে আলমগীর মোহব্বত, অর্থাৎ সার্বভৌম প্রেম—

‘জিস কদর কতরে হ্যাঁয় কতরো কো ফির দরিয়া করেঁ
আ কি ময়খানে মেঁ পয়দা ফির নই দুনিয়া করেঁ।’[৪২]

ভারতীয় প্রগতিক মহলে অজীম শায়র ফয়েজ আহমদ ‘ফয়েজে’র গজল শ্রদ্ধেয় ঐতিহ্য পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে সাম্যবাদীদের মধ্যে ফয়েজের আবেদন অবিসংবাদিত। দলিত-মর্দিত মানবতার পীড়াকে রক্তভেজা হৃদয়ে আঙুল ডুবিয়ে অভিব্যক্ত করেছেন ফয়েজ (১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১১-১৯ নভেম্বর ১৯৮৫)। উর্দু সাহিত্য ফয়েজে পেয়েছে মহোত্তরণ। মুক্ত, মহান, ডালপালা মেলা বিকশিত, পল্লবিত ও ঋদ্ধ মানুষ ও মানবিকতার কথাই ফয়েজের শায়রীচর্চার সারাৎসার।তাঁর মাধ্যমে উর্দু গজল পেয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতি। মাহমুদ আল জামানের ভাষায়—‘ফয়েজ কবিতায় মানুষের দুঃখ-বেদনা উপলব্ধির নন্দিত চৈতন্যে একবার পালটে দেন। উর্দু সৃজনশীল কবিতার ওপুস্রোত। ভাঙেন না বটে তিনি গীতিস্রোত, কিন্তু প্রচল ছিঁড়ে তিনি প্রেম আর প্রকৃতি, সুরাপাত্র আর প্রেয়সীর মুখ ছন্দে আনেন বাস্তবতার আদল। এখানেই তাঁর বিশিষ্টতা।

শুধুই কি দেশপ্রেম আর মানববন্ধন? মোটেই না। একই সঙ্গে আত্মীকরণ করিয়েছেন তিনি মানবজীবনের অনুপুঙ্খ ঘটনাস্রোত। যেখানে বঞ্চনা আর শোষণ, নিরাশা আর আশা, জীবনের সংগ্রাম, তৃষ্ণা, ক্লান্তি আর আনন্দ, কুৎসিত আর সুন্দরের জন্য, সৃষ্টির পথ সন্ধান, অপরাজেয় শক্তিতে সেখানে দীপ্যমান। ফয়েজ উর্দু কবিতার বিস্তৃত ভূমিতে এ-ক্ষেত্রেই অনন্য।'

ব্যক্তি ফয়েজ আর কবি ফয়েজের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। প্রগতিশীল লেখক সংঘে যোগদান, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কাজকর্ম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদের ভার, পাকিস্তান টাইমস পত্রিকার সম্পাদনা, প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা ও কাজকর্মের জন্য তিন দফায় কারাদণ্ড ভোগ—ইত্যাদি নানান ঘটনা ফয়েজের কবিতায়ও প্রভাব ফেলেছিল। রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলায় দীর্ঘ চার বছর বন্দি থাকার সময় তাঁকে কালি কলম দেওয়া ছিল নিষিদ্ধ। তখন তিনি ইটের টুকরোর ওপর বহু কবিতা লিখেছেন। তারই একটি কবিতার উদ্ধৃতি (পরে যেদি 'দস্ত-এ-সেবা' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়) এখানে দেওয়া হল—

'মতা-ই-লৌহো কলম ছিন গয়ে তে ক্যা গম হ্যয়
কি খুন-এ দিল মেঁ ডুবো লী হ্যঁয় উংলিয়াঁ ম্যঁয়নে
অনগিনত সদিয়োঁ কে তাবিক বহীমানা তলিসম
জুবান পে মোহর লগী হ্যয় তো ক্যা কি রাখ ভী হ্যয়
হরেক হলকা-ই-জঞ্জির মেঁ জুবান ম্যঁয়নে।'

দার-ও-রসন (ফাঁসি মঞ্চ), জনুন (পাগলামি), ম্যয়খানা (মধুশালা), শরাব, পেয়ালা, বুলবুল প্রভৃতি রোমান্টিক প্রতীকগুলিও ফয়েজের গজলে সুন্দরভাবে এসেছে—

'য়্যহী জুনুন য়্যহী তৌক-ও-দার কা মওসম
য়্যহী হ্যয় জব্র, য়্যহী অখতিয়ার কা মওসম।
কসম হ্যয় বস মেঁ তুমহারে,তুমহারে বস মেঁ নহীঁ
চমন মেঁ আতিশ-এ-গুল কে নিখার কা মওসম।
সবা কী মস্ত খিরামী তহ-এ-কমন্দ নহীঁ
অসীর-এ-দাম নহীঁ হ্যয় বহার কা মওসম।'

শেষ শেরটি অনুপম—

'বলা সে হমনে ন দেখা তো অওর দেখেঙ্গে
ফরোগ-এ গুলশন-এ মওত-এ হজার কা মওসম।'

ফয়েজের এই ধারারই উত্তরসাধক সাহির লুধিয়ানভী (১৯২৩-২৫ অক্টোবর ১৯৮০)। যাঁরা পুরোনো হিন্দি ফিল্মের দরদভরা গান শুনতে ভালোবাসেন, তাঁদের কাছে সাহিরের জনপ্রিয়তা অবিসংবাদিত। কলেজে পড়ার সময় তাঁর প্রথম নজম-সংকলন 'তলখিয়াঁ' প্রকাশ পায়। আজও সেই গ্রন্থ থেকে কলি হরণ করে প্রেমপত্র লেখে যুবক-যুবতিরা। সাহিরের আরও তিনটি কাব্যগ্রন্থ আছে—'গাতা জায়ে বনজারা', 'আও কি কোই খ্বাব বুনেঁ' এবং 'পরছাইয়াঁ'। সাহির ফিল্মেই গজল লিখেছেন বেশি। প্রথম ছবি 'নওজওয়ান' চল্লিশ দশকে নির্মিত। তারপর তাঁকে পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। প্যাসা, ধুল কা ফুল, সাধনা প্রভৃতি ছবিতে তাঁর গজল ঔৎকর্ষ ও ভাবপ্রবণতার জন্যে বিখ্যাত। সামন্ত ও সাম্রাজ্যবাদ ছিল সাহিরের চক্ষুশূল। তাজমহল সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন—

'এক শাহংশাহ নে দওলৎ কা সাহারা লেকর
হম গরীবোঁ কী মুহব্বত কা উড়ায়া হ্যয় মজাক।'

সংগীত পিপাসুদের কাছে আর একটি প্রিয় নাম মজরুহ সুলতানপুরী। এঁর গজল মূলত মানবীয় সমস্যা ও প্রেম। জনৈক সমালোচকের মতে—'মজরূহ গজলের কদীম শিসে (পুরোনো বোতলে) নতুর শরাব

ঢেলেছেন।' কথাটি এক অর্থে সত্য ; প্রমাণত—

'জবীঁ পর তাজে-জর, পহলু মেঁ জিন্দা ব্যাঙ্ক ছাতী পর
উঠেগা বেকফন কব য়হ জনাজা হম ভী দেখেঙ্গে।'

আর গজলে জমি, লাঙল, যবের দানা, কারখানা, শ্রমিক প্রভৃতি প্রতীকী শব্দের ব্যবহারে মজরুহ যে কুশলতা দেখিয়েছেন, তা-ও কি আমাদের বিস্মিত করে না?—

'জব জমীন গায়েগী, হল কে সাজ পর নগমে
ওয়াদিওঁ মেঁ নাচেঙ্গে হর তরফ তরানে-সে।
অহলে দিন উগায়েঙ্গে খাক সে মহো-অনজুম
অব গুহর সুবক হোগা জৌ কে এক দানে সে।
মনচলে বুনেঙ্গে অব রঙো-বু কে পয়রাহন
অব সঁওর কে নিকলেগা হুসন কারখানে সে।'

রচনার পরিচ্ছন্নতা, পারিপাট্য ও অনবদ্যতা সাধন আজকের গজলের সুলক্ষণ। মজাজের রচনা এই লক্ষণাক্রান্ত। শিল্পী মজাজের অনেক গজল হৃদয়াবেগের গভীর আন্তরিকতায় রসঘন হয়ে উঠেছে। তুলনামূলক অধ্যয়নে দেখা যাবে আখতার শীরানী ও মজাজের শায়রীর পৃষ্ঠভূমি প্রায় একই। দুজনেই মূলত রোমান্টিক ও গীতিময় কবিতা লিখেছেন—উভয়ের গজলেই আছে মাদকতা, যা নেশা ধরায়। শীরানীর রচনায় 'সলমা' ও 'অজরা' আছে, মজাজে আছে 'জোহরাজবীঁ'। উভয়ের গজলেই গালিব, মোমিন, হাফিজ এবং খৈয়ামের অনুষঙ্গ উপস্থিত। শীরানী ও মজাজের মধ্যে একটি মাত্র স্থলে দারুণ বৈষম্য, সেটা হল—সামাজিক পরিবর্তনের জন্য শীরানী যেখানে চিৎকার করেন, মজাজ সেখানে গান করেন উদাত্ত কণ্ঠে। নিচের গজলটিতে ফুটেছে মজাজের সুর—

'অয় মোহব্বত সাকী ক্যুঁ পরদে মেঁ রহী
গালিব কে দর্দ ক্যুঁ মেরে দিল মেঁ রহা!
বদলা নহীঁ চেহরা তো ক্যা বদলা
আখির দিল কা দর্দ দিল হী মেঁ রহা।'

আধুনিক উর্দু গজলে দুটি ধারা পাশাপাশি চলেছে। একটা ধারা শাশ্বত প্রেম, অন্যটি সাম্যচেতনা। প্রথমটি গজলের জন্মজাত প্রসঙ্গ, দ্বিতীয়টির জন্ম অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে—যা ফয়েজের সময় থেকে সুস্পষ্ট রূপ লাভ করেছে।দ্বিতীয় ধারারই বিকাশ ঘটেছে সরদার জাফরির গজলে। জাফরি আক্ষরিক অর্থেই জনকবি—

'মুঝে ন সতাও লোগো ম্যঁয় আমফহম গজলগো হুঁ
ঝন্ডা ওহাঁ ফওরায়ো জহাঁ তুমহারী জমীন হ্যয়।'

ব্যক্তিজীবনের সুখ-দুঃখের কথা সরস বাণীরূপ পেয়েছে হসমুখ বিজনৌরীর গজলে—

'বহুত সুনতে চলে আয়ে হ্যঁয় চর্চে বেওফাই কে
পতা ক্যা থা ধোখা য়হ খুদ খায়েঙ্গে একদিন।'

অবদুল মালিক খান উচ্চস্তরের হৃদয়াবেগের কবি। তাঁর একটি বিখ্যাত গজলের দুটি শের নিচে দেওয়া হল, এতে সন্ধান পাওয়া যাবে তাঁর রচনার গাঢ়বদ্ধতার—

'বাত কী বাত মেঁ বীততী জিন্দগী।
রোজ দিন রাত মেঁ বীততী জিন্দগী।
বক্ত কে দওর মেঁ ধূল বনকর উড়ে।
বাঢ়-বরসাত মেঁ বীততী জিন্দগী।'

পরিশেষে উদ্ধৃতি দেওয়া যাক সাম্যবাদী কবি মনমোহন তলখের একটি অনল-শের

'গজলোঁ সে রেভ্যুলেশন হোতী নহীঁ কভী

সচ্চে ইরাদোঁ সে উঠা লো রিভলবর।’

ওপরে উর্দু গজল সাহিত্যের উদ্ভবকাল থেকে এযাবৎ প্রাপ্ত নির্বাচিত নিদর্শনগুলি যথাসম্ভব কালানুক্রমে আলোচিত হল। বলা বাহুল্য, জীবিত অনেক কবির রচনার নিদর্শন এই ক্ষুদ্র পরিসরে সমাবেশিত করা সম্ভব হয়নি। এবং বলা আরও বাহুল্য, উর্দু গজল সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে আজ যেখানে এসে পড়েছে এটাই তার শেষ অবস্থা নয়—আরও বিকশিত হবে। সেই বিকাশ ভবিষ্যতে কোন পথে ধাইতে পারে তার আভাস ওপরের আলোচনায় দেওয়া হয়েছে।

একথা সর্বমান্য যে শিল্প-সাহিত্য সামাজিক বিশ্বাসকে অবলম্বন করে উদর্তিত হয়। গজল এর ব্যতিক্রম নয়। প্রাক-জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যুগ পর্যন্ত স্থৈর্য স্থিতিবোধ বিশ্বাসের বলয়ে জীবনকে সংবৃত রেখেছিল, চতুষ্পার্শ্বস্থ মসৃণ জীবনযাত্রায় জীবনপ্রীতির একটা স্থির অবিকল্পিত উপলব্ধি গজলকারদের চিত্তে সদাজাগ্রত ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাক-মুহূর্ত পর্যন্ত উর্দু গজল কল্পনার রঙিন ভাববিলাস থেকে বেরিয়ে রূঢ় বাস্তবের বন্ধুর ভূমি অবধি এক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে। খুবই সূক্ষ্মভাবে। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে এল—জীবনজিজ্ঞাসা ও সত্যনিষ্ঠ মননের অতন্দ্র সাধনা। অতঃপর স্বাধীনোত্তর কালে বাস্তব জীবনদর্শন, বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং সত্যোদঘাটনের বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা উর্দু গজলে যেভাবে রূপলাভ করেছে, জগৎ ও জীবনে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এ-যুগের গজল ব্যক্তিচেতনা-কেন্দ্রিক, প্রকরণও হয়েছে নিতান্তই ব্যক্তি-আশ্রয়ী। আত্মপ্রসারণকামী মানুষের পদে পদে প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে দ্বান্দ্বিক চেতনার বাণী, ললাটে তার যুদ্ধোত্তর যুগের ভস্মটীকা। অর্থ-বৈষম্য, সামাজিক অনৈক্য ও বিকৃতির অজস্র তরঙ্গাঘাতে গজল আজ প্রাচীন ভাবস্রোতের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত। মার্কসীয় বৈপ্লবিক সমাজতত্ত্ববাদ, ফ্রয়েডীয় ঈডিপাস ইলেকট্রো-ট্রো কমপ্লেক্স —ঐতিহ্যনুসারী উর্দু গজলের আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে।

শুধু পরিবর্তন বললে ঠিক বোঝানো যায় না। বলা উচিত, আশানুরূপ পরিবর্তন ঘটেছে। শুদ্ধ নির্মোহ বাস্তবতার অকুণ্ঠ প্রতিষ্ঠা, শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভের প্রকাশ—এ-যুগের গজলে আছে জীবনানুভবের যন্ত্রণা; চৈতন্যের উর্ধ্ব-বিহার নয়—বস্তুতান্ত্রিক ও শ্রেয়োবাদী ভাবনা। উর্দু গজল চলেছে সেই আকাঙ্ক্ষিত উজ্জ্বল উত্তরণের দিকে।

হিন্দী গজল

আমার জ্ঞান হওয়া ইস্তক ছোটোবেলায় পাঠ্য বইতে পড়া একটি বাক্য কানে দুলের মতো লেগে আছে—'কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না'।কেন জানি না এই অংশটুকু বাবা খুব টেস দিয়ে পড়াতেন। তিনি হয়তো সুবোধের মতোই ছেলের চরিত্র গড়ে তুলতে চাইতেন। কিন্তু বিলক্ষণ ব্যর্থ হয়েছিলেন। স্কুলের টিফিন হলেই আমরা ট্যারা চোখওয়ালা এক বুড়ো মাস্টারমশাইকে 'ট্যারা স্যার' বলে খচাতাম। এর জন্যে কানমলা খেয়েছি অনেক বার। তাই সন্দেহ হয়, হিন্দীভাষায় লেখা গজলকে যদি 'হিন্দী গজল' নামে উল্লেখ করি, তাহলে হয়তো আবার কানমলা খেতে হবে।

হিন্দী ভাষায় লেখা গজলকে 'হিন্দী গজল' নামে আখ্যায়িত করার ব্যাপারে যাঁদের প্রবল আপত্তি তাঁরা আসলে পূর্বসংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারেননি। সংস্কার অতি দুর্মর। মনে একবার বাসা বাঁধলে তাকে তাড়ানো কষ্টসাধ্য। ড. ধনঞ্জয় বর্মা 'গজল কো গজল হী রহনে দেঁ' শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন—'আপনারা গজলকে গজলই থাকতে দিন, 'হিন্দী' বিশেষণ যোগ করার প্রয়োজন নেই। 'হিন্দী গজল' বললে আমি ভাষাগত সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পাই। হিন্দীভাষী কবি নিজের গজলে ফারসি-উর্দু ছন্দ, লয় ও প্রতীকিগুলি ব্যবহার করুন, আপত্তি নেই।কিন্তু তাকে হিন্দী গজল বলার দরকার কী? গজল শুধুই গজল, তার আবার উর্দু হিন্দী কী?'[৪৩]

এই মন্তব্যে বস্তুনিষ্ঠার কোনো ছাপ নেই। গোটা নিবন্ধটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন, গবেষণার আগেই ড. বর্মা একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন এবং সেটিকে প্রমাণ করার জন্যে তথ্য বা পূর্বকল্পিত ধারণাগুলিকে ঠেসেঠুসে সাজিয়েছেন। সাহিত্য বিষয়ে এইরকম পূর্বকল্পিত ধারণা সংস্কারমাত্র। আর সংস্কার মাত্রই সত্য নির্ধারণের অন্তরায়।

হিন্দী গজল কথাটায় যাঁদের প্রবল আপত্তি তাঁরা হয়তো ধরেই নিয়েছেন যে এই বিশেষ ছন্দটির প্রয়োগ কোনো একটি বিশেষ ভাষার ক্ষেত্রেই সম্ভব।কিন্তু, যদি ফারসির দায়রা থেকে বেরিয়ে গজল উর্দুর মতো একটি লশকারি জবানে দাখিল হতে পারে, তবে হিন্দীতেই বা হতে পারবে না কেন? হিন্দী উর্দু উভয় ভাষারই সর্বনাম, ক্রিয়াপদ, শব্দ-বাক্য-বাগধারা প্রয়োগ ও রচনারীতি অভিন্ন। ম্যঁয় হম তুম তু ওহ য়ে ইত্যাদি সর্বনামে কোনো প্রভেদ নেই। পণ্ডিত হরিশঙ্কর শর্মা জানিয়েছেন—'সুমেরু, বিধাতা, বিহারী, শাস্ত্র, পীযুষবর্ষা, ভুজঙ্গপ্রয়াত, খরারী, হরিগীতিকা, আনন্দবর্ধন, দিগপাল, ভুজঙ্গী, চৌবাই প্রভৃতি ছন্দগুলি উর্দুতে ব্যবহার করা হয়।'[৪৪] হিন্দী কবিতায় এগুলি প্রত্যাখ্যাত নয়। বরং কোনও কোনও ছন্দে হিন্দী ও উর্দু সমান অংশীদার। বস্তুত উর্দুর সমস্ত ভাব, স্টাইল ও ব্যাসবাক্য হিন্দীর মাত্রিক ছন্দ ও বর্ণবৃত্তে নিহিত আছে। 'মফলুন ফায়লাতুন মফলুন ফউলুন'-এর মতো অনেক ভাবের কথা হিন্দী গজলে আক্ষরিক অনূদিত কিংবা অপরিবর্তিত থেকেই এসেছে।

হিন্দী কবিরা কেবলমাত্র জনপ্রিয়তা অর্জনের লোভে গজল লেখেননি।দায়িত্ব-সজাগ কবিরা সস্তা বাহবা কুড়োতে, চমৎকারিক শৈলী হিসেবে নয়—একটি সিরিয়াস প্রভাবকারী কাব্যশৈলী রূপে (সমকালীন হিন্দী কবিতায় তার উপযোগিতা বিচার করে) গজলকে গ্রহণ করেছেন। হিন্দী কবিদের সংবেদনশীলতা এবং চিন্তার আধুনিকতা, প্রগতিক উর্দু শায়রদের মতো, গজলকে সামাজিক যাথার্থ্যের নতুন পরিসর প্রদান করেছে। কতিপয় সমালোচক এমন ধারণা করেছেন যে-হিন্দীতে বহুল পরিমাণে গজল লেখা হলেও, সার্থক গজলের অভাব আছে। অনেকের মতে হিন্দী গজল বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছান্দিক অনুশাসন মেনে চলে না। গজলের মূল মেজাজের প্রশ্নটাও কেউ কেউ তুলেছেন। বনিয়াদি মেজাজের যে প্রশ্ন—তার জবাব আমার

কাছে আছে। যে-কোনো প্রাচীন শৈলীর মূল মেজাজ রক্ষা করবার নামে তাকে যদি সমকালীন চিন্তাধারা থেকে দূরে সরিয়ে রাখি, তবে মেজাজের শর্ত পূরিত হয় ঠিকই।কিন্তু সমকালীন সন্দর্ভে তার প্রায়োগিক সজীবতা বিনষ্ট হয়। যাঁরা গজলকে শুধু গুলো-গুলিস্তাঁ, বুলবুল, শরাব, সাকীসুন্দরী ইত্যাদি প্রাচীন নজাকতের জন্যেই পছন্দ করেন, তাঁরা প্রকৃত অর্থে বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকেছেন। উর্দুতে ফয়েজ, মজাজ, জিগর প্রমুখ এই কাল্পনিকতার মোহ ভাঙতে চেষ্টা করেও ভাঙতে পারেননি। কিন্তু হিন্দী কবিরা প্রথম থেকেই ওই স্বপ্নিল অবাস্তবতা থেকে দূরে সরে থেকেছেন।

গজলে শৈল্পিক বন্ধন ও লয়ের একসঙ্গে কায়েম থাকার যে শর্ত আছে, সেটি তার স্বাভাবিক নজাকতের বিরোধী পরিস্থিতিতেও সম্ভব। কেননা, গজলে পরস্পর-বিরোধী অনুভূতিও পাশাপাশি থাকতে পারে। হিন্দী গজলের চরিত্রহীনতার অভিযোগ তাই অবান্তর। হিন্দী গজলকারেরা শুধু আরবি-ফারসি-উর্দুর প্রতীকি ব্যবহারের বিপক্ষে। তাঁদের ঝোঁক বাস্তবতা ও সমসাময়িকতার দিকে।

শুধুমাত্র ভাষার ভিত্তিতে উর্দু আর হিন্দী গজলকে আলাদা করার পক্ষপাতী আমি নই। যাঁরা মেহেদি হাসন, গুলাম আলির গজল শুনেছেন তাঁরা বলবেন—গজলে আবার হিন্দি উর্দু কী? হিন্দি আর উর্দুর উৎস এক। দুটির জন্ম খড়ীবোলী থেকে।[৪৫] কিন্তু হিন্দীভাষা কবিরা যদি উর্দুর এই বিশেষ কাব্যছন্দকে ব্যবহার করেন তবে উর্দুর প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই থাকবে। হিন্দি গজল নজাকত ও ভাষার দৃষ্টিতে উর্দু গজলের মতো হতে পারে—কিন্তু উভয় ভাষার পার্থক্য যে আছে তা অনস্বীকার্য। অতএব হিন্দি শব্দপুষ্পে গাঁথা মালাকে 'হিন্দী গজল' বলতেই হবে।

'হিন্দী' কথাটায় যাঁরা ভাষাগত সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পান, তাঁদের যুক্তি ধোপে টেকে না। উপন্যাস, ছোটোগল্প, নাটক—সবই তো পশ্চিমের আমদানি। এখন কি তবে হিন্দীভাষায় লেখা উপন্যাসকে ইংরেজি উপন্যাস বলতে হবে? যদি উর্দু পরাম্পরার একটি শৈলী হিন্দীতে সম্পূর্ণ ওরিজিন্যালিটি নিয়ে হাজির হয়, তবে তাকে 'উর্দু শৈলী' বা শুধু 'শৈলী' বলবো কোন যুক্তিতে? সেটি পড়ে যদি কেউ সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পান, তাঁকে বলব—

'য়্যাদ আনা হ্যয় অগর তো ইস তরহ আয়া করো
কোই কড়ুই বাত শীরীঁ লব সে কহ পায়া করো।'

মৌলানা মহম্মদ হুসেন আজাদ বলেছেন, বেশির ভাগ উর্দুর শায়রই নিজেদের কাব্যবস্তু, কাব্য-শাস্ত্রীয় ছন্দ, উপমা প্রভৃতি ভারতীয় পরিবেশ থেকে গ্রহণ না করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফারসি শায়রীর অনুসরণ করেছেন। কিন্তু হিন্দী গজলে, তার উপমায় অলংকরণে, রূপকল্পে, রঙে, বর্ণনায়, ছবির আভাসে কবির মানসিকতা, দেশকাল, জীবনাচরণ, তাঁর ধর্ম-সংস্কৃতি, সৌন্দর্যচেতনা লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এই গজলকে অবশ্যই 'হিন্দী গজল' বলা হবে।

হিন্দী সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগের বিরাট চত্বরে কোথাও গজলের হদিস মেলেনি। হিন্দীভাষাকে কাব্য-কবিতার একাধিপত্য পরিহার করে সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে নিজেকে সঞ্চারিত করে তুলতে প্রচুর সময় ব্যয়িত হয়েছে। ভারতেন্দুর আগে হিন্দীতে কেউ গজল লেখেননি। মুসলিম সুফিমত আদি হিন্দু সাহিত্যের বহুলাংশে প্রভাবিত করেছিল এবং পারসিক ভাষায় বিখ্যাত কবি আমির খুসরো দেহলবী (১২৫৩-১৩২৫) হিন্দী ভাষার একটি আঞ্চলিক ধারা অবলম্বনে কিছু গান ও ধাঁধা লিখেছিলেন। অনেকে সেই গানগুলিকেই গজল বলে চালাতে চান। কিন্তু সেগুলিকে গজল বলা যায় না।

'শবানে হিজরাঁ দরাজ চু জুলফ
ও রোজে-ওসলত চুঁ উম্র কোবাহ,
সখী পিয়া কো জো ম্যাঁয় ন দেখুঁ
তো কয়সে কাটুঁ অঁধেরী রতিয়াঁ।'

বস্তুত আধুনিক পর্বের আগে পর্যন্ত হিন্দী কাব্যসাহিত্যে গজল ছন্দের ব্যবহার হয়নি।ইতিপূর্বে আমার একটি প্রবন্ধে ভ্রমবশত সন্তকবি কবীরদাসকে (১৩৯৮-১৪৪২) হিন্দীর অন্যতম গজলকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এম এ গণীর 'History of Persian Language and Literature at the Mughal Court' গ্রন্থের অনুসরণে ভুলটি করেছিলাম।[৪৬] কবীর গজল লিখেছিলেন ঠিক কথা, কিন্তু তা পূর্বী-ফারসি শব্দের অনুষঙ্গে —

'হমন নে ইশক মস্তানা, হমন কো হোশিয়ারী ক্যা
আজাদ রহে য়্যা জগ মেঁ, ইমন কো ইন্তজারী ক্যা।
কবিরা ইশক কা মারা, দুই বেশ দূর কর দিল সে
জো চলনা রাহ নাজুক হ্যয়, হমন কো সির বোঝ ভারী ক্যা।'

বস্তুত, পঞ্চদশ শতকে কবীর সাহিত্যে জোয়ার নিয়ে আসেন এবং তৎকৃত দোঁহাগুলি হিন্দি সাহিত্যের পরম সম্পদ। কিন্তু দোঁহাগুলির বর্তমান আলোচনায় কোনো মূল্য না থাকায় আমরা ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র (৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫০-৬ জানুয়ারি ১৮৮৫) থেকে হিন্দী গজলের সূত্রপাত ধরেছি।

হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে ভারতেন্দু নবযুগের উদগাতা[৪৭]। একসময় হিন্দী কবিতার ভাষা মানে ছিল ব্রজভাষা, ছন্দ ছিল প্রাচীন সবৈয়া ও দোহা, বিষয় রাধাকৃষ্ণ ও রাসমতীর লীলা। কোথাও ধরার ধুলোর স্পর্শ ছিল না। এই কবিতাকে জীবনের দিকে টেনে এনেছিলেন ভারতেন্দু। তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের মধ্যেও নতুনত্বের প্রতি আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। প্রতাপনারায়ণ মিশ্র, অম্বিকাদত্ত ব্যাস, রাধাকৃষ্ণ দাস উপাধ্যায়, বদ্রীনারায়ণ চৌধুরী প্রমুখের কবিতায় আধুনিকতার লক্ষণ সুস্পষ্ট। এই আধুনিকীকরণের পেছনে ছিল বাংলা সাহিত্যের প্রভাব। ভারতেন্দু তাঁর 'নাটক' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন—'হিন্দী সাহিত্য নিজের সমৃদ্ধা জ্ঞানবৃদ্ধা বড়ো বোন বঙ্গভাষার অক্ষয় রত্নভাণ্ডারের সহায়তায় প্রভূত উন্নতি করেছে।' ভারতেন্দুর একাধিক মৌল কবিতার উৎস হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বহু কবিতার ভাব, ভাষা ও ছন্দের সম্মান যে হেমচন্দ্রের প্রাপ্য, তা বোধহয় অনেকেই জানেন না।তবে গজলে ভারতেন্দু সম্পূর্ণ মৌলিকতা দাবি করতে পারেন।

ভারতেন্দুর গজলে বেজেছে বিদ্রোহের সুর। উর্দু গজলের সাকি জাম মেহেফিল তাতে নেই। আছে সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থনীতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনা এবং বিক্ষোভ—

'হিলা দেঙ্গে অভী এ সঙ্গে দিল তেরে কলেজে কো
হমারী আতিশবারী সে পৎথর পিঘলতে হ্যাঁয়।'

ভারতেন্দুর সমকালীন জগন্নাথপ্রসাদ রত্নাকরও কিছু গজল লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর রোলা, কবিত্ত এবং সবৈয়া ছন্দের মতো গজল ততটা ঔৎকর্ষ দাবি করতে পারে না। বরং তাঁর পরবর্তী কালের কবি অযোধ্যা সিং উপাধ্যায় 'হরিঔধ'কে (১৮৬৫-৬ মার্চ ১৯৪৭) কিছুটা সম্মান দেওয়া যায়। ভারতেন্দু ছিলেন সংক্রান্তিকালীন কবি—একাধারে অতীত ও বর্তমানের পূজারি। তাঁর বেশির ভাগ কবিতাই রীতিকালীন পরম্পরার মায়ায় আচ্ছন্ন। কিন্তু হরিঔধ বর্তমানের পূজারি। তাঁর ভাষা ও ছন্দ অপেক্ষাকৃত নবীন—সহজ ও সরল। হরিঔধ এমন এক যুগে জন্মেছিলেন যখন হিন্দীভাষা সদ্য খোলস ছাড়িয়ে উঠেছে। হিন্দী খুঁজছিল নতুন প্রাণস্পন্দন। ফলত হরিঔধকে প্রতিষ্ঠার বেগ পেতে হয়নি। তাঁর প্রিয় ছন্দ ছিল কবিত্ত, সবৈয়া, ছপ্পয়, দোহা, সংস্কৃত ছন্দ এবং যাবতীয় উর্দু ছন্দ। গজলে তিনি ভারতেন্দুর তুলনায় বেশি সফল—

'জীবন কভী দেতা নহীঁ উও সুখ জো হমারী মাঁগ হ্যয়
য়ে অফিস অওর কচহরী সব কে সব বকওয়াস হ্যয়।
উঠ জায়ে হাথ সবকে তো ফির ব্যবস্থা হী ক্যা
জীবন উও সব কুছ দে দে জো হমারী মাঁগ হ্যয়।'

বোঝা যাচ্ছে, হিন্দী গজল গোড়া থেকেই লক্ষ্যে স্থির। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের জালে আটকে না থাকলে প্রথম দিককার গজলে ক্ষোভের পরিবর্তে বিদ্রোহই প্রকাশ পেতো। পায়নি। কিন্তু সেই বাঞ্ছিত রাজমার্গের পথে যাত্রা শুরুর একটা ইঙ্গিত অবশ্যই প্রকাশ পেয়েছে।

ভারতেন্দুর পর দ্বিবেদী যুগে (১৯০১-২০) হিন্দীতে গজল লেখার ধুম পড়ে যায়। শ্রীধর পাঠক (ড. ধনঞ্জয় বর্মা শ্রীধরকেই হিন্দী গজলের জনক ধরেছেন), মৈথিলীশরণ গুপ্ত, কেশব প্রসাদ মিশ্র, মন্নন দ্বিবেদী, মাধব শুক্ল, বদ্রীনাথ ভট্ট, সত্যনারায়ণ কবিরত্ন, ঠাকুর সোয়েল, শরণ সিংহ, রায়দেবীপ্রসাদ পূর্ণ, লালা ভগবানদীন, রামনরেশ ত্রিপাঠী প্রমুখের মাধ্যমে এই ধারাবাহিকতা গিয়ে মিশেছে ছায়াবাদী কবিদের লেখনীমুখে। বলা বাহুল্য, ভারতেন্দু থেকে হিন্দী গজলের যে ধারা সূচিত হয়েছিল, দ্বিবেদীযুগে তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। ছায়বাদী যুগে এসে জয়শংকর প্রসাদের হাতে হিন্দী গজল এক নতুন ব্যঞ্জনা লাভ করল।

গোবিন্দ চাননপুরী জয়শংকর প্রসাদকে (১৮৯০-১৫ নভেমম্বর ১৯৩৭) হিন্দী গজলের জনক আখ্যা দিয়েছেন।[৪৮] বলতে কী, হিন্দী কাব্যজগতে প্রসাদের আবির্ভাব এক যুগান্তকারী ঘটনা। প্রসাদে এসে হিন্দী কবিতা একটা ব্রেক পেল।একটা সহজ সচলতাও লক্ষ করা গেল তাতে শুধু গজল বা কবিতাই নয়, ভারতেন্দুর পর হিন্দী সাহিত্যে সব কটি কক্ষ নিপুণ শিল্পীর মতো সাজিয়ে তুলেছেন প্রসাদ। বিশেষত, কবিতা ও নাটকে তাঁর দক্ষতা ছিল অসন্দিগ্ধ। আর গজলে তিনি আধুনিক জীবনের বৈষম্যকে যেভাবে নিখুঁতরূপে এঁকেছেন, তার তুলনা কোথায়?—

> ‘জগন দূর কুছ, ক্রিয়া ভিন্ন হ্যয়, ইচ্ছা ক্যুঁ পুরী হো মন কী
> এক দুসরে সে ন মিল সকে যহ বিড়ম্বনা হ্যয় জীবন কী।’

আধুনিক হিন্দী কাব্যসাহিত্যের তৃতীয় পর্যায়ে ধরা হয় ১৯১৮ সালে। বিশ্বযুদ্ধের উন্মত্ততার পর অবসাদ। আবার অসির চেয়ে বড়ো হয়ে উঠল মসি। এশিয়ার প্রথম নোবেল লরিয়েট রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দনের জোয়ার তখনও থিতিয়ে পড়েনি। তাঁর ভাব ভাষা ছন্দকে আদর্শ করে হিন্দী কবিরা সাহিত্যের সমৃদ্ধি বিধানে এগিয়ে এলেন। এঁরাই পরবর্তীকালে চিহ্নিত হয়েছিলেন ‘ছায়াবাদী কবি’ হিসেবে। নেতৃত্বে ছিলেন প্রসাদ-পন্ত-নিরালা। প্রসাদজীর কবিতায় রাবীন্দ্রিক প্রভাব সর্বতাশ্রয়ী। এমনকি, তাঁর গজলেও রাবীন্দ্রিক প্রভাব অননুকৃত থাকেনি। ফলে গজলের মূল মেজাজ বা সুর যথাযথ ফুটে উঠতে পারেনি। রবীন্দ্র-কবিতায় যেমন প্রান্তিক মিলহীনতা সত্ত্বেও অন্তঃস্থিত মাত্রাসমকত্ব বজায় থাকে (‘পরিশেষে’র ছন্দ)। প্রসাদের গজলেও সেই ভঙ্গি দুর্লক্ষ্য নয়।কিন্তু মুক্তছন্দ তো ফর্ম বা ছন্দানুশাসনের মুক্তি নয়, তা প্রাচীন ছন্দানুশাসন থেকে মুক্তি এবং নতুন রূপ বা ফর্মের অন্বেষণ। প্রসাদেও এটা ঘটেছে। কিন্তু সেই লয় আর সংরচনার লয়াত্মক চেতনা কোথায় —যা গজলের অনিবার্য শর্ত?—

> ‘তুমহারে কেশর সে হী সুগন্ধিত পরাগময় হো রহে মধুব্রত
> প্রসাদ, বিশ্বেশ কা হো তুম পর, য়হী হৃদয় সে নিকল রহা হ্যয়।’

বক্তব্য স্পষ্ট। কিন্তু সেই বাগধারা, লয়াত্মকতা, বাগবৈদগ্ধ্য নেই—যা শেরকে ‘শের’ করে। এ-কথা অনস্বীকার্য যে হিন্দী গজলের লড়াকু চরিত্র প্রসাদের লেখনীতে আরও বলিষ্ঠ রূপ পেয়েছে—কিন্তু তা গজলের নজাকত-গত কোনো বিশেষ শর্ত পূরণ করে না।

প্রসাদ যুগের (সংবত ১৯৭৫-৯৫) বিশিষ্ট কবিদের মধ্যে রামনরেশ ত্রিপাঠী, সুমিত্রা নন্দন পন্থ, রামধারী সিং ‘দীনকর’, মহাদেবী বর্মা প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।এঁদের কেউই গজলকার রূপে পরিচিত নন। এ-যুগের পণ্ডিত সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী ‘নিরালা’ গজল লিখেছিলেন বটে, কিন্তু রাবীন্দ্রিক প্রভাবে সেগুলির বেশিরভাগই অ-গজল।[৪৯]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হিন্দীসাহিত্যের যে-যোগ, নিরালাজীই (১৮৯৭-১৫ অক্টোবর ১৯৬১) তার স্বর্ণসেতু। নিতান্ত কৈশোররচনা সহ নিরালার এমন কোনো গ্রন্থ বিরল যাতে রবীন্দ্র-অনুষঙ্গ অনুপস্থিত। তবে নিরালার ছায়াবাদকে নিছক রবীন্দ্রনাথের ছায়াবাদ বললে বিরূপ সমালোচনা হয়। নিরালার কবিতায় রবীন্দ্র-অনুসরণ থাকলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি মৌলিকত্বে সমুজ্জ্বল 'নবরসরুচিরা হ্লাদৈকময়ী' কবিতাও সৃষ্টি করেছেন। এই ছায়াবাদ মূলত রবীন্দ্রনাথের ছায়ানুগমনের নামান্তর হলেও হিন্দীতে 'ছায়াবাদ' ঠিক সে-অর্থে প্রযুক্ত হয়নি। গঙ্গাপ্রসাদ পণ্ডেয় লিখেছেন, 'ছায়াবাদ হল এই পরিদৃশ্যমান রূপজগতের রূপাতীতের ছায়ানুভব—কবির আন্তর উপলব্ধির রঙে বহির্বিশ্বের অনুরঞ্জনই ছায়াবাদ।'[৫০] মহাদেবী বর্মার ভাষায়—'বহির্বিশ্বের আপাতবিচ্ছিন্ন খণ্ড বস্তুসমূহের মধ্যে একটা অখণ্ডতা, একটা নিরবচ্ছিন্নতা অনুভব করেন ছায়াবাদীরা। তাঁরা জানেন পৃথিবীর প্রতিটি খণ্ড সুন্দরের মধ্যে দিয়ে এক অখণ্ড সুন্দর নিজেকে নিরন্তর অভিব্যক্তি করে চলেছে।'[৫১] এই ছায়াবাদের সঙ্গে নিরালার গজলের সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী। বিশেষত রাবীন্দ্রিক ছায়াবাদ মুক্তছন্দের সঙ্গে তাঁর গজলের যোগ প্রত্যক্ষ।

এমনিতে নিরালাজীর গজল বাংলা গানের দ্বারাও প্রভাবিত।তাঁর নিজের ভাষায়—'বঙ্গসাহিত্য গজলকে আপন করে নিয়েছিল। কিন্তু এই ধারা মুসলমান আমলে নয়, ইংরেজ শাসনের পর এসেছিল। উর্দু গজল ঠিক সাহিত্যে যায়নি, বাংলায় তৈরি হয়েছিল নতুন গজল।... কলকাতা আর বাংলাদেশে আমি বত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত ছিলাম।কলকাতার আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে আমি পরিচিত। আমার গজলে বাংলা সঙ্গীতের সেই ধারা প্রতিফলিত।'[৫২] কিন্তু রবীন্দ্র প্রভাবের তুলনায় তা ম্লানায়মান। নিরালা বাংলার সমাস-গুম্ফিত পদ এবং তৎসম পদ (রবীন্দ্র ব্যবহৃত শব্দ) প্রয়োগের মাধ্যমে তথা ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের বিলোপ করে 'না-হিন্দী' ভাষায় গজল লিখেছেন—

> 'গন্ধ-ব্যাকুল-কুল-উর-সর লহর-কচ কর কমল-মুক পর
> হর্ষ-অলি স্পর্শ-পর সর গুঞ্জ বারংবার।'

নিরালা হিন্দী গজলের ভাষাকে ভেঙে চুরমার করেছেন। হিন্দী ভাষায় এসেছে অহিন্দীপনা। তাঁর 'বেলা' কাব্যগ্রন্থের গজলগুলিও রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের ভাষা, ছন্দ ও ভাব স্মরণ করিয়ে দেয়—

> 'চাঁদনী সম হকতী ফুল জ্যয়সে মেরে দিল মেঁ ছা গই
> মধুবন মেঁ খুশবু বাদল সে ভী বেতাব হুই।'

এই কারণে 'বেলা'র গজলগুলিকে পারফেক্ট বলা যায় না। হিন্দিতে প্রয়োগশীলতার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি নিরালার গজল শেষপর্যন্ত প্রয়োগই থেকে গেছে, গজলে উত্তীর্ণ হতে পারেনি—

> 'নিগহ তুমহারী থী, দিল জিসমে বেকরার হুয়া
> মগর ম্যঁয় গ্যয়র সে দিল কর, নিগহ কে পার হুয়া।'

এতে বাগবৈদগ্ধ্য আছে, ছন্দও হয়েছে খাসা, কিন্তু তবু শেরটি পড়ে নিরালাকে যথার্থ গজলকার বলা যায় না। এতে শুধু অন্দাজেবয়াঁ নয়, তসব্বুসুফের দৃষ্টিতে শৈয়রিয়তেরও প্রভাব আছে। একসময় ফিরাক বলেছিলেন—'উর্দু গজলের শরবত বানিয়ে খেলে হিন্দী গজল সুন্দর স্বাস্থ্য লাভ করবে।' ফিরাকের এই ব্যঙ্গ ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের মতো কাজ করেছে। ড. রামবিলাস শর্মা ১৯৪৮ সনেই লিখেছিলেন যে নিরালাজী হিন্দী কাব্যভাষাকে পাঠকের কাছাকাছি নিয়ে আসবেই 'বেলা'র গজলগুলি লিখেছিলেন। এই নিরিখে 'বেলা' সার্থক হয়েছে নিশ্চয়ই।[৫৩]

শমশের বাহাদুর সিংয়ের মতে, হিন্দী গজলে নিরালার পরেই ত্রিলোচনের স্থান।হিন্দীতে ত্রিলোচন শাস্ত্রীই সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ গজল রচয়িতা। মধুসূদনের রচনা-প্রভাবে ত্রিলোচন ইটালিয়ান সনেটকে হিন্দীতে এনেছিলেন।তারপর পেত্রার্কান সনেট, শেক্সপিয়রীয় ও অপরাপর মিশ্র গঠনরীতির সনেট এবং চতুর্দশপদী রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। কিন্তু হিন্দী গজলে তাঁর দক্ষতা আমাকে সন্দিহান করে—

'প্রবল জলবাত পাকর সিন্ধু দুস্তর হোতা জাতা হ্যায়
কঠিন সংঘর্ষ জীবন কা কঠিনতর হোতা জাতা হ্যায়।
কমতা এক থা পরিবার পুরা চয়ন করতা থা
অকেলে কা ভী জীবন অব তো দুভর হোতা জাতা হ্যায়।
বড়োঁ কো ছোটা, ছোটোঁ কো বহুত ছোটা বনা ডালা
পটেল কে তলে ঢেলা বরাবর হোতা জাতা হ্যায়।
হমেঁ আশা থী অব তো দুঃখ অপনা পীছা ছোড়েঙ্গে
মগর হম ক্যা করেঁ পীছা নিরন্তর হোতা জাতা হ্যায়।
'ত্রিলোচন' তুম গজল মেঁ খুব আয়ে বাত বন আই
নয়ে জীবন কা স্বর অব গান কা স্বর হোতা জাতা হ্যায়।'

এরকম হালকা ভাবের কথা তাঁর অধিকাংশ গজলে প্রাপ্তব্য। এ-কথা স্বীকার করব যে হিন্দীতে উক্তি কৌশল এবং অন্দাজেঁবয়ার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে ত্রিলোচন কিছু সার্থক গজল লিখেছেন। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তিনি নিরালার মতো, সমাস-গুম্ফিত পদ ও তৎসম শব্দের ব্যবহারে ভারাক্রান্ত—

'প্রশংসা পরার্থানুসন্ধান কী হ্যায়
কহাঁ স্বার্থ কা রং গহরা ন দেখা।'

'পরার্থানুসন্ধান' ইত্যাদি সংস্কৃতক্লিষ্ট সমাসবদ্ধ শব্দ শেরের মেজাজকে ক্ষুণ্ণ করে।এসব শের পড়তে গেলে আমাদের জিভ হোঁচট খায়—

'সঙমন হী প্রাণ কা উৎকর্ষ হ্যায়
সংবেদন মেঁ কিসলিয়ে সংশয় হুয়া।'

এ ধরনের শের গজলে ঠিক মানায়ে না। গজল যেখানে মর্মস্পর্শী, সেখানে ভাবই মুখ্য, ফর্ম গৌণ। কিন্তু গজল যেখানে স্বয়ং একটি ফর্ম, সেখানে তার ফর্মালিজমের শর্ত পূরিত হলে তবেই ভাব-বিহারের ঔচিত্য। ভাবের দিক থেকে হিন্দী গজল উর্দু গজল থেকে পৃথক। অন্তর্জগতের গূঢ় গহন রহস্যময়তা মানবসত্তার গুহায়িত কামনাবাসনার সূক্ষম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হিন্দী গজলকে বিশিষ্টতা প্রদান করেছে। ফলত তা উর্দু গজলের নজাকত থেকে পৃথক হতে বাধ্য। কিন্তু মেজাজের প্রশ্ন উঠলে তা অবশ্যই শর্তানুগ হতে হবে। 'প্রাণ', 'উৎকর্ষ', 'সংবেদন', 'সংশয়' ইত্যাদি শব্দ সেই মেজাজ আনতে পারে না।

অন্যদিকে আধুনিক কবি, যাঁদের গজলে আছে শুদ্ধ নির্মোহ বাস্তবতার অকুণ্ঠ প্রতিষ্ঠা—ক্ষোভ, দুঃখ আর বিদ্রোহ,—তাঁরা অপেক্ষাকৃত সহজ ও প্রাকৃত ভাষায় গজলের মেজাজ, নজাকত ও ভাবপ্রকাশে আশাব্যঞ্জক ভাবে সফল। আধুনিক গজলের ভাষা কথ্যভাষার দিকে ধাবিত হচ্ছে, তার অজস্র নিদর্শনগুলির মধ্যে থেকে কয়েকটি এখানে আলোচনা করা যেতে পারে।

হিন্দী গজলের তৃতীয় পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি শমশের সিং বাহাদুর। ইনি শুধু নতুন ধারার জনক নন, বর্ষীয়ান প্রতিপালক। শমশেরকে বলা হয়েছে বিশিষ্ট অনুভূতির কবি। এঁর গজলের আবেদন সর্বজনীন। উর্দু আর ফারসিতেও সমান ওস্তাদ হবার ফলে শমশেরের হিন্দী গজলে ফারসি শব্দের এত দাপাদাপি—

'ইল্ম-হিকমৎ, দীনো-ইমাঁ, মুল্ক-দৌলৎ, হুস্নো-ইশক
আপকো বাজার সে জো চাহিয়ে লা দেতা হুঁ।'

উর্দু গজলের ভাবসর্বস্ব বিষয়ের মুখাপেক্ষী শমশের নন। জনপ্রিয়তা লাভের বাসনায়ও তিনি গজল লেখেননি। 'কুছ অওর কবিতায়েঁ' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় শমশের লিখেছেন—'পাঠকের প্রতি মোহ তো দূরের কথা, স্বয়ং নিজের কবিতার মোহে আমি বন্দী হতে পারিনি।' তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ গজল—

'ওহী উম্র কা এক পল কোই লায়ে
তড়পতী হুই সী গজল কোই লায়ে।

হকীকৎ কো লায়ে তরবৈয়ুল সে বাহর
মেরী মুশকিলোঁ কা জো হাল কোই লায়ে।
কহীঁ সর্দ খুঁ মেঁ তড়পতী হ্যয় বিজলী
জমানে কা রদ্দবদল কোই লায়ে।
নজর তেরী দুস্তরে ফিরদৌসী লায়ে
মেরী জিন্দগী মেঁ অসল কোই লায়ে।'

শমশেরের গজলে রয়েছে সংগ্রামের প্রচ্ছন্ন সুর। এই সুর হিন্দী গজলের সুর, যা কোনো ভুঁইফোড় ফসল নয়—বরং হিন্দী কাব্যসাহিত্যের বিবর্তনে খুবই স্বাভাবিক।বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে হিন্দী কবিতা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়, তারই অনিবার্য ফসল—ছায়াবাদ, যা 'রহস্যবাদ' নামেও চিহ্নিত। কখনও তাকে সামন্তবাদী মূল্যবোধের ক্ষয়িষ্ণুতা ও পুঁজিবাদী সংস্কৃতির প্রতিপালক রূপেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। ছায়াবাদের প্রবর্তক হিসেবে কখনও জয়শংকর প্রসাদ, আবার কখনও মুকুটধর পাণ্ডেয়ের নাম উল্লিখিত হয়েছে। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে ছায়াবাদী কবিতা মূলত ব্যক্তিচেতনার ফসল, তাই চল্লিশের দশকে তার বিসর্জনের জয়ডঙ্কা বেজে উঠেছে।জন্ম নিয়েছে প্রয়োগবাদ ও প্রগতিবাদ। এ যুগের বচ্চন, নগেন্দ্র শর্মা, ভগবতীচরণ বর্মা প্রমুখ 'উত্তর-ছায়াবাদী-কালের কবি' হিসেবে চিহ্নিত। অবশ্যি হরিবংশ রায় বচ্চন 'হালাবাদ' নামে একটি পৃথক কাব্যধারারও জন্ম দিয়েছিলেন। বচ্চনের মদিয়া-প্রতীকি ব্যবহার নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠলে, তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে বলেছিলেন—

'ম্যঁয়নে তুমহে মদিরা কী কবিতা নহীঁ দী
ম্যঁয়নে তুমহে কবিতা কী মদিরা দী হ্যয়।'

চল্লিশের দশকে এসে হিন্দী কবিতা ক্রমে পাল্টাতে শুরু করল। বামপন্থী চেতনার জন্ম হল।গদ্য-পদ্য উভয় ক্ষেত্রেই। ড. প্রভাকর মাচওয়ের প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি—...'Then came the Leftist wave after the first Progressive Writers' Association meet in Lucknow in 1936, presided over by Premchand (1881-1936). Many poets voiced anti-Fascist and pro-Soviet, pro-China sentiments. Some of them wrote journalistic verse, which now sounds worse. Among the progressive or Marxist poets of that period were Narendra Sharma, Shamsher Bahadur Singh, Kedarnath Agarwal, Shivamangal Singh 'Suman', Girija Kumar Mathur, Naresh Mehta, Trilochan Shastri and Prem Dhawan.'[৫৪]

প্রগতিবাদের পরের দশকে প্রয়োগবাদের জন্ম, যা এসেছিল সচ্চিদানন্দ বাৎসায়েন 'অজ্ঞেয়' সম্পাদিত 'তার সপ্তকে'র মাধ্যমে। ড. মাচওয়ে লিখেছেন—In 1943, Agyeya edited an anthology of seven poets called 'Tar Saptak' (Sepiet in Soprano). It started the experimentalist trend, the 'New Voices' Agyeya repeated such seplets three times during the past four decades, but with diminishing returns. Some poets out of the 28 were outstanding, such as Bhawaniprasad Mishra, Raghuvir Singh Sahae, Sarweshwardayal Saksena, Harinnarayan Vyas. But non surprised Agyeya, the radical humanist, existentialist and now a neo-mystic all in one. Some poets like Nagarjun, the rebel, wee out of Agyeya's fold and made a great mark...'[৫৫]

১৯৫১ সালে 'দুসরা সপ্তক' এবং ১৯৫৯ সালে 'তীসরা সপ্তক' প্রকাশের মাধ্যমে প্রযোগবাদী 'নয়ী কবিতা'র শেকড় আরও মজবুত হলেও, সত্তর দশকে 'চৌথা সপ্তকে'র প্রকাশ অনেকের কাছে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল। প্রগতিক দল বলল, নয়ী কবিতা বা নিউ পোয়েট্রি মুভমেন্টের জন্যে নাগার্জুন, মুক্তিবোধ ও

ধূমিল আমাদের নমস্য, কিন্তু চৌথা সপ্তক নয়। চৌথা সপ্তক নতুন ধারার কাব্যান্দোলনের নেতৃত্ব দাবি করলে সমালোচনায় জর্জরিত হলেন অজ্ঞেয়জী। '...in spite of all these achievements till the sixties, and several movements in poetry like 'New Poetry', 'Anti-Poetry' and so on late, the past 20 years have not seen any single outstanding genius in Hindi Poetry. These are scores of good and passble poetasters and singers (gitkars) of lyricist. But even in lyrics Mahadevi and Bachchan have not been surprised, both in output, popularity and mellifluence. It is sad to think that most of great names in poetry are people who have crossed seventy. Today the scene in Hindi poetry is like a Kumbha Fair (in Bhopal, the called the recent poets' meet Kavi-Kumbha) where each is blowing his or her own trumpet.'[৫৬]

আধুনিক হিন্দী গজলে অ-কবিতা বা অ্যান্টি-পোয়েট্রির বিশেষ ভূমিকা আছে। প্রয়োগবাদী কবিতা, নয়ী কবিতা এবং অ-কবিতা—বস্তুত একই কাব্যপ্রকৃতির গতিশীল চরণবিন্যাসের তিনটি পৃথক নাম। অ-কবিতা রচয়িতাদের মতে, 'অ-কবিতা' শব্দের 'অ' উপসর্গটির মানে হল, 'পরম্পরা-রহিত'—গতানুগতের বিরোধী। অ-কবিতা শুধুমাত্র কতিপয় বক্র, পিরামিডি বা সর্পিল পঙক্তির সমন্বয় নয়—এর তিনটি উপাদান, ভাষা ভাব অর্থ—যা কবিতারই নামান্তর।[৫৭]

অকবিতার জন্মলগ্নে মার্কসীয় চিন্তাধারার যে দীপশিখা শমশের বাহাদুর সিংহের গজলে স্ফুরিত হয়েছিল, পরবর্তী কালে তারই উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে দুষ্যন্ত কুমারের গজলে। এই দুই মহান আলোকস্তম্ভের মাঝখানে 'হিন্দী গজলের শাহজাদা' বেকল উৎসাহীর অবস্থান। বেকলের আসল নাম মহম্মদ শফি খাঁ (জন্ম ১৯ জুলাই ১৯২৮)। সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ নিজের পূর্বপুরুষদের সর্বদা ঘৃণা করে এসেছেন বেকল। তাঁর প্রিয় কবি গালিব ও নজীর। ইকবালকে ভালো লাগলেও, বেকল বলেছেন—'জাতপাতের গন্ধ থাকায় ইকবালের শের আমাকে প্ররোচিত করে না।'[৫৮] যাঁরা তাঁর লেখাকে প্রভাবিত করেছেন তাঁরা হলেন, ফরজন্দ আলি, কলীম উল্লাহ এবং মৌলভী রৌনক আলি ছঙ্গা। এই প্রভাব তাঁর গজলেও—

'ব্যঙ্গ কে তাঁর, মুঝী পর খীঁচে হোঙ্গে
আপ জব অওর মেরে, অওর মেরে নগীচে হোঙ্গে।
জিসকী হর শাখা পর রাধায়েঁ মচলতী হোঙ্গী
দেখ না কৃষ্ণ উসী পেড় পর কে নীচে হোমের।'

'পাঁচ বছর আচার্য নরেন্দ্র দেবের সন্নিধি আমাকে সমাজবাদী করেছে'—কবির এ উক্তি মিথ্যে নয়। এই সোশ্যালিজম তাঁর গজলের সর্বত্র ভাস্বর :

'পূজনেওয়ালে মহলোঁ মেঁ ব্যয়ঠে হুয়ে
তফসরে লু কে ঝোঁকে পর করতে হ্যঁায়।
এক জখমি কবুতর সা পীপল তলে
বক্ত কে দেবতা ফড়ফড়াতে হ্যঁায়।'

আধুনিক হিন্দী কবিদের মানস-বিবর্তনের তত্ত্বটি আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, তাঁরা গজলের মাধ্যমে ভাবালুতার উন্মোচন করে জীবনের নগ্ন বাস্তবরূপই দেখতে চাননি, মানুষের সুন্দর বাসনা-কামনার পূর্তির পথ ও সমাজরোগের নিদান দিতেও চেষ্টা করেছেন। মার্কসবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হলেও ব্যক্তি প্রাধান্যের স্থান নেই—সমষ্টি চেতনাই সাম্যবাদের মৌল ভিত্তি—আধুনিক হিন্দী গজলে এই বোধের প্রাধান্য হেতু আঙ্গিকেও পরিবর্তন এসেছে। শমশের থেকেই এই ধারার যাত্রা শুরু, তার অনিবার্য প্রতিফলন দুষ্যন্ত কুমারের গজলে।

হিন্দী গজলের দুনিয়ায় দুষ্যন্ত কুমারের আবির্ভাব সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। দুষ্যন্ত এসে হিন্দি গজল একটা ব্রেক পেল, আধুনিক অর্থে গজলের যেসব লক্ষণ মেলে—সব দুষ্যন্তে প্রতিফলিত। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা চার। 'সূর্য কা স্বাগত'-এ তাঁর অনুভূতির উষ্ণ চাঞ্চল্য, সরস সজীবতা এবং প্রাঞ্জল ভাষায় এক অনাস্বাদিতপূর্ব হৃদয়গাথা; দ্বিতীয় কাব্য সংকলন 'আওয়াজোঁ কে ঘেরে'-তে আমরা পাই জীবনরহস্য উন্মোচনরত কবিকে; তৃতীয় সংগ্রহ 'জ্বলতে হুয়ে বল কা বসন্ত'-এর মাধ্যমে তিনি আরও সমৃদ্ধির পরিচয় দেন; এবং সর্বশেষ কীর্তি 'এক কণ্ঠ বিষপায়ী'-তে পৌরাণিক আখ্যানের অনুসরণে রচিত এমন একটি গীতিনাট্য তিনি উপহার দিয়েছেন যা 'অন্ধাযুগ'-এর মতো সশক্ত কীর্তির সঙ্গে তুলনীয়।[৫৯]

হিন্দি গজলে দুষ্যন্ত কুমার সাম্যবাদ ও জীবনবাদের প্রবর্তক। তাঁর রচনার প্রধান অবলম্বন হৃদয়বেদনা, জ্বালা আর ক্ষোভ। মার্কসীয় চিন্তাধারার এমন নির্মল প্রতিফলন দুষ্যন্তের আগে শমশের ছাড়া অন্যকারও গজলে পড়েনি। নই কবিতার সর্বজনপ্রিয় কবি দুষ্যন্ত কুমার গজলের আসরে পদার্পণ করার আগেই স্বলক্ষ্য সম্বন্ধে নির্দ্বিধ হয়ে গিয়েছিলেন। 'জ্বলতে হুয়ে বন কা বসন্ত' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন—'আমার কাছে কবিতার কোনো মুখাদর্শ নেই, মুখোশ নেই, আন্তর্জাতিক মুদ্রা নেই, আনকোরা শব্দের পোশাক নেই। কবিতাকে আমি চমক সৃষ্টি কিংবা আতঙ্কিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিনি। সমাজ ও ব্যক্তির প্রসঙ্গে তার দায়িত্ব এ-থেকে অনেক বড়ো' হিন্দি কবিতার গতানুগতিক ধারায় নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেননি দুষ্যন্ত। তিনি তাঁর অনুভূত যুগসত্যকে আড়ম্বরহীন ভাবে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। তিনি খুঁজছিলেন বৃহত্তর পরিসর, যেখান থেকে মনের সমস্ত ভাবনা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে। নই কবিতা তাঁকে সেই বাঞ্ছিত পরিসর দেয়নি। ফলে তিনি দীর্ঘদিন ভুগেছেন অতৃপ্তির জ্বালায়। তিনি সেই সংকীর্ণ পরিসর থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন—'আমি সবসময় অনুভব করেছি—আধুনিকতার মিথ্যা ছদ্মবেশ সর্বদা পাঠককে কবিতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। কবিতা ও পাঠকের মাঝখানে এতটা ব্যবধান আগে ছিল না। নতুন কবিরা কবিতার নামে যা চালাচ্ছে, তাকে ঘসা মুদ্রার মতো বাজারে চালানোর অর্থ পাঠককে ধোঁকা দেওয়া।' তাই দুষ্যন্ত নঈ কবিতার গলি ছেড়ে এসে ঢুকেছেন গজলের উন্মুক্ত আঙিনায়। তিনি বুঝেছিলেন, প্রাচীন ও বহুব্যবহৃত শৈলী হলেও গজলের সম্ভবনা অনেক।[৬০]

এই প্রসঙ্গে দুষ্যন্ত কুমার স্বয়ং লিখেছেন—'গোড়ার দিকে গজল আমার প্রতি সদয়া হয়নি। বেশ সময় গেছে তাকে বুঝতে। তারই মাঝে লুকিয়ে-চুরিয়ে কখনো-সখনো একটু-আধটু হাত মকশো করেছি। মাঝে মাঝেই একটা প্রশ্ন মনে খোঁচা মারত—ভারতীয় কবিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রখর অনুভূতির কবি মির্জা গালিব নিজের হৃদয় পীড়ার অভিব্যক্তিকে রূপ দিতে শেষপর্যন্ত গজলকেই কেন বেছে নিয়েছিলেন? আর যদি গজলের মাধ্যমে গালিব নিজের বেদনাকে এতটা সার্বজনিক করে তুলতে পারেন, তাহলে আমার এই বেদনাবার্তা (ব্যক্তিগত ও সামাজিক) গজলের সাহায্যে বেশি সংখ্যক পাঠকের কাছে পৌঁছোতে পারবে না কেন? ...জীবনে কখনো-কখনো এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন হৃদয়ের জ্বালা আর ভেতরে আবদ্ধ থাকতে পারে না বেরিয়ে আসতে চায় বাইরে। আমি গজল লিখেছি সেই অবস্থার মধ্যে।'—নিজের দুঃখ ও হৃদয়-যাতনাকে অধিকসংখ্যক মানুষের মধ্যে চারিয়ে দেবার অত্যুগ্র বাসনাই দুষ্যন্ত কুমারকে গজলকার করেছে। তাঁর গজলের বেদনা আজকের প্রতিটি ব্যক্তির বেদনা, যাতে জীবনের বাধাবিপত্তি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, মূঢ়তা, প্রদাহ, প্রজ্জ্বলন, নির্বাপণ—জীবনের একটা পুরো অধ্যায় জুড়ে থাকে।—

'ন হো কমীজ তো পাঁও সে পেট ঢক লেঙ্গে
য়ে লোগ কিতনে মুনাসিব হ্যাঁয় ইস সফর কে লিয়ে।'

দুষ্যন্তের গজলেই প্রথমে শোনা যায় জোরালো ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর, শোষণ ও অপশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ।যে-সময় হিন্দী কবিতা ধুঁকছিল মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর ড্রয়িংরুমে, সেই সময় দুষ্যন্ত লিখেছিলেন—

'কহাঁ তো তয় থা চিরাঙ্গা হরেক ঘর কে লিয়ে

চলো য়হাঁ সে চলেঁ অওর উম্রভর কে লিয়ে।
য়হাঁ দরখতোঁ কে সায়ে মেঁ ধূপ লগতী হ্যয়
কহাঁ চিরাগ ময়সসর নহী শহর কে লিয়ে।'

এই ধরনের কাব্যভঙ্গিমা ও গণচেতনাই দুষ্যন্তকে অমরত্ব প্রদান করেছে। জীবনে জুড়ে থাকা কৃষ্ণ-ক্রূরতাকে অনুভব করেই তিনি লিখেছেন—

'য়হ জুবাঁ হমসে সী নহী জাতী
জিন্দগী হ্যয় কি জী নহীঁ জাতী।'

শুধু হাঙ্গামা খাড়া করা দুষ্যন্তের লক্ষ্য নয়। ফাঁকা বিদ্রোহের অর্থ অরাজকতার পুনর্বাসন, যার পরিণাম হতাশা—এ সত্য দুষ্যন্তের জানা। তিনি চান একটা বিকল্প হাতিয়ার, অর্থাৎ ব্যবস্থা ভাঙো! আমি না পারলেও আগামী প্রজন্ম যেন তা ভাঙতে পারে—

'মেরে সীনে মেঁ নহীঁ তো তেরে সীনে মেঁ সহী
হোঁ কহীঁ ভী আগ লেকিন আগ জ্বলনী চাহিয়ে।
সির্ফ হঙ্গামা খড়া করনা মেরা মকসদ নহীঁ
মেরী কোশিশ হ্যয় কি য়হ সুরত বদলনী চাহিয়ে।'

দুষ্যন্তের দ্বারা প্রবর্তিত গজলের ছোট্ট সড়ক আজ রাজমার্গে প্রবর্তিত হয়ে গেছে—এটা বাড়িয়ে বলা নয়। হিন্দী গজলের দুনিয়ায় এখন বিরাট আলোড়ন। দুষ্যন্তের প্রভাবকে এড়িয়ে চলা নতুন কবিদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। হিন্দী গজলের দুনিয়ায় এখন দুটি নাম—শমশের বাহাদুর সিং ও দুষ্যন্ত কুমার। দুজনের রচনা-ব্যক্তিত্ব ছিল যেমন পাহাড় প্রমাণ, তার প্রভাবও হয়েছে তেমনি ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। প্রভাবিতদের সকলেই যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, এমন কথা বলব না—কিন্তু তবুও এ প্রবাহে ছেদ পড়েনি।

'লাজিম নহী' কি সবকো মিলে এক সা জবাব
আও ন হম ভী স্যয়র করঁ কোহে-তুর কী!'

এখনকার গজলে ফুটে উঠেছে যুগপৎ শোষিতের আকুতি ও বিদ্রোহ। এ জোয়ার নিছক ভাববিলাস নয়, কেন-না এর মূলে আছে মধ্যবিত্ত মানস। গোড়ার দিকে রুশ কাব্যধারা এর নির্মাণকল্পে সহায়ক ছিল, এখন হয়েছে চৈনিক কবিতার ধারা। সর্বহারার হাতে মুষ্টিবদ্ধ ভাবে ওপরের দিকে উঠছে, উচ্চারিত হচ্ছে প্রতিরোধ গড়ার প্রতিজ্ঞা।জাতীয় জীবনের এই ভাবে এখনকার গজল সংক্রামিত। শমশেরের ভাষায় বলব—

'ভাব হো জো শক্তি-সাধন কে লিয়ে
লুট গয়ে কিস আন্দোলন কে লিয়ে
ধুল মেঁ হমকো মিলা দো লেকিন
চালতে হ্যঁয় ধুল কণ-কণ কে লিয়ে।'

মতান্তরে, গজল এখন আর শুধুই গজল নয়, তার সঙ্গে ঘটেছে ধরার ধুলোর স্পর্শ, গণ-আন্দোলনে পরিণয়। চিকন আর সুডৌল শব্দের ব্যবহার উঠে গিয়ে আসছে চাঁচাছোলা তীক্ষ্ণধার শব্দ। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ শমশেরের গজল, যেখানে পাই শ্রমজীবী মানুষের তেজালো কণ্ঠ—

'উও জলওয়ে লৌটতে ফিরতে হ্যঁয়, খাকো-খুনে-ইনসা মেঁ
তুমহারা তুর পর জানা, মর জানা নবীনা হোনা হ্যয়।'

এই কণ্ঠই আরও স্পষ্টতা লাভ করেছে দুষ্যন্তের গজলে—

'ম্যয়কদে কা রাস্তা অব ভী খুলা হ্যয়
সির্ফ আমদ রফত হী জ্যাদা নহীঁ হ্যয়।'

দুষ্যন্ত কুমারের স্থির বিশ্বাস—'বিপ্লব আসবেই! আকাশে শুধু কালো মেঘই নেই, আছে একটা লাল আগুনের গোলাও—যার নাম কমিউনিজম।'—

'মত কহো আকাশ মেঁ কোহরা ঘনা হ্যয়
য়হ কিসী কী ব্যক্তিগত আলোচনা হ্যয়।'

এর পরে মার্কসায়নে যাঁরা আবর্তিত হয়েছেন, তারাও যে মার্কসীয় চিন্তার উষ্ণ সুবাস গজলের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে পারছেন—এ অত্যন্ত আশার কথা। এই ধারার কবিদের মধ্যে বলবীর সিং রঙ, চন্দ্রসেন বিরাট, সূর্যভানু গুপ্ত, মাহেশ্বর তিওয়ারী, সত্যপাল সাকসেনা, নরেন্দ্র বশিষ্ঠ, রামাবতার ত্যাগী, কুঁওর বেচৈন, শেরজঙ গর্গ, সরস্বতীকুমার দীপক বিশেষ স্মরণীয়। বিশ্লেষণে দেখা যাবে এঁদের কেউ কেউ চান গজলকে হকিকৎ (বাস্তবতা) ও তখৈউল (কল্পনা) থেকে মুক্ত রাখতে। এই চাওয়াকে 'কাল্পনিকতা' ধরেল ভুল হবে। আসলে এই চাওয়া কল্পনাশীলতার দাবি—

'স্যাহী সে ইরাদোঁ কী তসবীর বনাতে হো
গর খুন সে বনাও তো তসবীর অসলী হোগী।'

শেরজঙ গর্গকে অনেক সমালোচক আত্মবিরোধী গজলগো বলেছেন। এটি বিতর্কের ব্যাপার। আমার মতে তাঁর গজলে আত্মবিরোধ নেই, আত্মানুসন্ধান আছে।নীচের গজলটি পড়লে বোঝা যাবে তিনি যন্ত্রণার আয়নায় নিজেকে খুঁজেছেন—

'কোই শহর গুমশুদা হ্যয়, কোই গাঁও অনমনা হ্যয়
ইনহী খাস উলঝনোঁ সে নয়া আদমী বনা হ্যয়।
অভী রোশনী কা টুকরা, নহীঁ আসমাঁ সে উতরা
নহীঁ কোপলোঁ পে ছায়া, য়হাঁ কোহরা ঘনা হ্যয়।
তুমহে চন্দ মুঁহলগোঁ নে বহকা দিয়া হ্যয় শায়দ
জরা রূপ অপনা দেখো মেরা দর্দ আইনা হ্যয়।
নহীঁ মঞ্জিলোঁ কো ম্যঁয়নে দিয়া দোস্তোঁ কা দর্জা।
সভী কাময়াবিয়োঁ সে মেরা যুদ্ধ সা ঠনা হ্যয়।
মেরে খুশনুমা ইরাদোঁ, মেরী দেখভাল করনা
কিসী অওর সে নহীঁ হ্যয়, খুদ সে সামনা হ্যয়।'

শেরজঙের মতে, অনুভূতি ও অভিব্যক্তির শৈলী বলিষ্ঠ না হলে গজলও বলিষ্ঠ হতে পারে না। তাঁর প্রিয় গজলকার দুষ্যন্ত কুমার, কেননা 'দুষ্যন্তের গজলে সেই বলিষ্ঠতা আছে।' আজ হিন্দীতে বলিষ্ঠ কবিদের একটি সারি রচিত হয়েছে যাঁদের মধ্যে বলবীর সিং রঙ, নীরজ, ত্যাগী, বালস্বরূপ রাহী, সূর্যভানু গুপ্তের ওপর দুষ্যন্তের প্রভাব অত্যন্ত সক্রিয়। কেননা, শেরজঙের ভাষায়—'দুষ্যন্ত কী গজলোঁ নে এক সীসা তক হিন্দি গজল কো নেই ভাবভূমি তথা তেবর প্রদান কিয়া হ্যয়, জিসকা প্রভাব হিন্দি গজলকারোঁ পর পড়না লাজিমী হ্যা।'[৬১]

সমকালীন হিন্দী গজলকারদের মধ্যেও দুষ্যন্তের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। এর কারণ কী? জবাবে নরেন্দ্র বশিষ্ঠ বলেছেন—'নয়ে লিখনে ওয়ালোঁ পর দুষ্যন্ত কা প্রভাব কা এক খাস কারণ হ্যয়। তব সমুচা রাষ্ট্র রীজনীতিক মুদ্দোঁ সে প্রভাবিত থা অওর দুষ্যন্ত কা লেখন উন স্থিতিয়োঁ কো উকের রহা থা। স্বাভাবিক হী থা কি উসে ব্যাপক স্বীকৃতি মিলত্রী।[৬২] অর্থাৎ রাজনীতিক কারণেই দুষ্যন্তের প্রভাব এতটা স্বীকৃতি পেয়েছে। স্বয়ং নরেন্দ্র বশিষ্ঠের গজল দুষ্যন্তের দ্বারা প্রভাবিত—

'য্যকিন জিসকো সমঝতা থা উও গুমাঁ নিকলা
জলানে ওয়ালা মেরে ঘর কা পাসবাঁ নিকলা।
কিসী সে তেরা পতা হী ন মিল সকা হমকো

তেরী গলী মেঁ হর এক শখস বেজুবাঁ নিকলা।
বিখর গয়ে হ্যাঁয় পরখতে হমারী কশতী কে
হমরা দিল সে অভী হওসলা কহাঁ নিকলা।
সজা দিয়ে কই গুলদান উসনে ফুলোঁ সে
চমন উজাড়নে ওয়ালা ভী বাগবাঁ নিকলা।
সভী কে পাঁও সফর সেঁ লহুলুহান হুয়ে
তলাশে অমন মেঁ জব কোই কারওয়াঁ নিকলা।'
এর পাশাপাশি পড়া যাক মাধব কৌশিকের—
'কাগজ কী পত্তিয়োঁ কা গুলশন খিলা দিয়া
কিসনে হমারে খুন মেঁ পানী মিলা দিয়া।
ইনসানিয়ৎ কে দর্দ কো জিন্দা ন কর সকে
নফরত কা চাহে সোপনে মুরদা জিলা দিয়া।
পড়নে লগী হ্যয় দোস্তোঁ দীওয়ার মেঁ দরার
শায়দ কিসী সে নীঁও কা পথর হিলা দিয়া।
হঁসনে কী বাত আই তো মায়ুস হো উঠা
রোনে কে হর মুকাস পে উও খিলখিলা দিয়া।
সুকরাত কো দুরুস্ত বতানে কে জুর্ম মেঁ
লোগোঁ নে উসে জহর কা প্যালা পিলা দিয়া।'

দুষ্যন্তীয় গজলের প্রভাব স্পষ্টত ফুটে উঠেছে রামাবতার ত্যাগীর রচনাতেও। এ শুধু ভাবগত নয়, ভাষা, শব্দ ও অলংকার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও—

'রোশনী তো চাহিয়ে পর লৌ জরা মদ্ধম রখো
চাহিয়ে মুঝসে গজল তো আঁখ মেরী নম রখো।
ম্যাঁয় হুয়া তৈয়ার তুলনে কো অভী কহনে লগে
দুসরে পলড়ে মেঁ অপনী জিন্দগী কে গম রখো।
আঁখ মেরী দেখকর কহনে লগে বুঢ়ে হকীম
ইন পে বর খুরদার খ্বাবোঁ কা বজন কুছ কম রখো।
তুম খুদা হোগে মগর য়হ শায়রোঁ কী হ্যয় গলী
শওক সে গুজরো উসুলনে সর জরা সা খম রখো।
চাহা নহীঁ যা দর্দ সে ফির ভী আল্লুক হো গয়া
অব তো ইসী মেঁ শান হ্যয় জ্যসে বনে কায়ম রখো।
কওন স ফনকার যা জিসকো ন দী ঘুমনে কসম
আঁখ মেঁ জো ভী রহে পর হোঁট পর সরগম রখো।
জো করো 'ত্যাগী' তুমহেঁ পহচানতে হ্যাঁয় লোগ বাগ
অপনে চেহরে পর ভলে তুম জিস কদর মাতম রখো।'

এর পাশাপাশি ভবানীশংকর মিশ্র, জানকীবল্লভ শাস্ত্রী, জনঞ্জয় সিংহ প্রমুখের একটি অপার রোমান্টিক গজলের ধারা চলেছে। এই ধারা ঠিক ভারতেন্দু বা নিরালা যুগের না হলেও, খুব নবীন বলে সুখ্যাতি পাবে না। যদিও উল্লিখিত তিন কবির জনপ্রিয়তা সম্পর্কে আমি নির্দ্বিধ। এঁদের মধ্যে ভবানীশংকর মিশ্রের নাম সবিশেষ স্মর্তব্য। কেন-না এঁর গজল প্রাক্তন ও নব্যযুগের সেতু রচনা করেছে। নিচের গজলটিতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবাদর্শের স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট—

'ইসলিয়ে তারীখ নে হমকো কভী চাহা নহীঁ
হম অকেলে হ্যয়, হমারে পাস চৌরাহা নহীঁ।
চওখটোঁ কে পার চমড়ে কা ভরা বাজার হ্যয়
অওর কানোঁ মেঁ হমারে ইএ কা ফাহা নহী।
দোস্তোঁ, তুমনে বহুত চাহা মগর হম ক্যা করেঁ
জিন্দগী বাকায়দা হোতী কভী স্বাহা নহীঁ।

জানকীবল্লভ শাস্ত্রী গীতিকার হিসেবেই বেশি পরিচিত। তিনি যে গজলেও দক্ষ, সে প্রমাণ তিনি রেখেছেন। কিন্তু সুর না থাকলে তাঁর গজল নেবানো প্রদীপের মতো—

'ধূপ দুপহর কী মুখতসর-কী সী
রাত ভর ম্যঁয়নে চাঁদনী পী থী!
মৌন বেমওতে মর গই হোতী
ম্যঁয়নে উসকো জিন্দগী দী থী!'

আর ধনঞ্জয় সিংয়ের গজল শুধু সুখপাঠ্যই নয়, কথ্যের দিক থেকেও স্বচ্ছ সরল; কৃত্রিমতায় আবিল নয়।নিচের গজলটি তাঁর একটি সর্বাঙ্গসুন্দর রচনার নমুনা—

'ইস তরহ ভীড় কে সৈয়লাব সে গুজরতা হুঁ
জ্যয়সে দলদল ভরে আলাব সে গুজরতা হুঁ।
সারী দুনিয়া বড়ী রঙীন নজর আতী হ্যয়
জব তেরে বসল কে উস স্তাব সে গুজরতা হুঁ।
ডুব জাতা হ্যয় পাহাড়োঁ কা বদন চোরী তক
জব তেরী আখোঁ কে দোআব সে গুজরতা হুঁ।
কাঁপ উঠতে হ্যাঁয় ইমরেৎ কে কঁগুরে থর-থর
জব তেরী য়্যাদ কী মেহরার সে গুজরতা হুঁ।
দেখকর অপনী হী পরছাঁই চঁওক উঠতা হুঁ।
জব কভী সায়া-এ-মেহতাব সে গুজরতা হুঁ।
ভরী দোপহর মেঁ সূরজ কা ঘুট রহা হ্যয় দম
ম্যঁয় তেরে জুল্ম কে সীমাব সে গুজরতা হুঁ।'

এই প্রাচীন ও রোমান্টিক ধারার অন্যান্য কবিদের মধ্যে হরিপ্রসাদ যাদব,বিন্দেশ্বরী চৌহান, লক্ষণপ্রসাদ মাথুর, শ্যামল গুলাব কর্ণ, দেবশোয়া গৌরী, বাণীরানী দেবী, বিমল ত্রিপাঠা 'অশক', পুর্ণ সিং জেঠলানী প্রমুখের সাফল্যও কম নয়।

নতুনদের মধ্যে এমন কবির সংখ্যা কম নয় যাঁরা নিছক উর্দু গজলের নকলকে হিন্দী গজল বলে চালাতে চান। এই শ্রেণীর কবিদের মধ্যে শ্যাম বিমল, মধুর নজমী, পাকিজা খাতুন, চন্দ্রশেখর ঝা 'ইন্দু', বলরাজ হ্যয়রৎ প্রমুখের নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। এঁরা গজলের শর্ত ও তার প্রকৃতিকে না বুঝেই পঞ্চরঙ্গী হিন্দীতে বিজু তুকবন্দী লিখে 'গজল'-এর স্ট্যাম্প মেরে লটারির জাল টিকিটের মতো বাজারে ছাড়ছেন। উদাহরণ হিশেবে মধুর নজমীর রচনা পড়া যাক—

'দর্দ কিতনা গঝিন হো গয়া—
আদমী আলপিন হো গয়া।।
অপনে কিরদার কী মওত সে—
আদমী মুতইন হো গয়া।।'

ফারসিয়ানায় ভারাক্রান্ত এ ধরনের রচনা গজলমূলক নজমা বা 'গজলের মতো কবিতা' হতে পারে, কিন্তু গজল হয় না। তাই এঁদের রচনাকে 'গজল' বলে স্বীকৃতি দেওয়া অসম্ভব।

আবার আর এক শ্রেণীর কবি আছেন যাঁরা গজলের নামে প্রাচীন কাব্যিক শব্দের ব্যবহারে বা অতি-হিন্দী ভাষায় 'পদাবলী' লিখে ঘসা-মুদ্রার মতো বাজারে ছাড়ছেন।সত্যপ্রকাশ সাকসেনা, ড. শিওবেশ, বিশ্বম্ভরনাথ উপাধ্যায়, চন্দ্রমণি ত্রিপাঠী, বিশ্রান্ত বসিষ্ঠ, ব্রহ্মাশংকর পাণ্ডেয়, অজিত শর্মা প্রমুখকে এই দলের শ্রেণীভুক্ত বলা যায়। এঁদের রচনায় যথার্থ মেজাজ ও ভঙ্গির অভাব, কাফিয়া-রদীফের ও ছন্দের ত্রুটি খুবই দৃষ্টিকটু। উদাহরণত সত্যপ্রকাশ সাকসেনার দুটি শের উদ্ধৃত করছি—

'রাম সী বনবাস মেঁ হ্যয় জিন্দগী
পহচান কী তলাশ মেঁ হ্যয় জিন্দগী।
উও উমড়তা বাদল জানে হ্যয় কহাঁ
শুষ্ক কেদে প্যাস মেঁ হ্যয় জিন্দগী।'

কিন্তু নতুনদের দলে এমন কবির সংখ্যাও কম নয়, যাঁরা রচনাগুণে স্বতন্ত্র অভিনিবেশের দাবি করতে পারেন। বেদপ্রকাশ রাহী, সরস্বতীকুমার 'দীপক', শ্রীরাম মিনা, জ্ঞানপ্রকাশ, জাহির কুরেশি, সুরেশ বিমল, তারাদত্ত নির্বিরোধ, বাবুরাম শর্মা 'বিভাকর', ব্রহ্মাশংকর পাণ্ডেয়, কলীম আনন্দ, কুঁওর বেচৈন, ভট্ট মধুর শাস্ত্রী, পশুপতিনাথ ব্যাকুল, বলরাজ হ্যয়রৎ, ইশরৎ কিরৎপুরী, মনমোহন তলখ, রাজীব সাকসেনা, রাজকুমারী রশ্মি, মৃত্যুঞ্জয় মিশ্র 'করুণেশ', প্রতাপ সহগল, পূরণ সরমা প্রমুখ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যাঁদের গজলে জীবনের বিবিধ পক্ষগুলিকে সহজ স্বাভাবিক ভাষায় ও শৈল্পিক পদ্ধতিতে উদঘাটিত করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। কোথাও শহুরে জীবনের বিড়ম্বনা চিত্রিত আছে, কোথাও গ্রাম আর পুরোনো স্বর্গ থাকেনি। ড. সুধেশ বর্মা যথার্থই লিখেছেন, 'গজল মূলত শহুরে সংস্কৃতির প্রতীক, কিন্তু যেভাবে উর্দু শায়রগণ গজলের কথ্য ও শিল্পে বিস্তার সাধন করেছেন, ঠিক সেইভাবে হিন্দি কবিগণ কেবলমাত্র নগরীয় সংস্কারে সীমিত না থেকে গজলকে ব্যাপক জনজীবনের কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন।'[৬৩] নমুনা স্বরূপ জ্ঞানপ্রকাশ বিবেকের একটি গজল উদ্ধৃত করছি। মানুষের দুর্দশা ও আজকের অভাবের ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর এই গজলে—

'য়ে জিন্দগী হ্যয় ফকত রেল কী তরহ অওর হম
হ্যঁয় পায়দান পে লটকী সওয়ারিয়োঁ কী তরহ।
য়ে জিন্দগী উমীদোঁ কা এক বিস্তরা থী
কভী খেলতা রহা হুঁ কভী বাঁধতা রহা হুঁ।
কর্জ কী উম্মীদ লেকর ম্যঁয় গয়া থা জিসকে পাস
ফীস মাফী কে লিয়ে উও লিখ রহা থা অর্জিয়াঁ।

জ্ঞানপ্রকাশ বিবেকের গজলের সবচেয়ে প্রধান বিশেষতা হল পরম্পরাগত ভারতীয় প্রতীকগুলির কলাত্মক প্রয়োগ।লঙ্কা, পঞ্চবটী, তাজমহল, মুমতাজ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার লক্ষ করুন—

'অশকোঁ কী সজী লংকা তো আঁখো মে খড়ী হ্যয়
খুশিয়োঁ কী মগর পঞ্চবটী সুনী পড়ী হ্যয়।
কিস-কিস কে লিয়ে তাজমহল অশক বহায়ে
হর দর পে ফটেহাল সী মুমতাজ খড়ী হ্যয়।'

গজলে রদীফ ও কাফিয়ার মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে নতুন কবিরা অনেক সজাগ। এঁদের ভাষা অধিকাংশত প্রচলিত কথ্যভাষা, যা সহজেই পাঠক-মনকে আকৃষ্ট করে। প্রসঙ্গত, মৃত্যুঞ্জয় মিশ্র 'করুণেশে'র একটি গজল উদাহৃত করছি—

'আকাশ মহল আপকা, দুঙ্গা না দখল ম্যঁয়
রহনে দেঁ মেরী ঝোপড়ী, সমঝুঙ্গা মহল ম্যঁয়।

করতে হো ক্যোঁ হর বার তুম আসান কো মুশকিল
করতা হুঁ তো কিতনা করুঁ মুশকিল কো সহল ম্যাঁয়।
আঁসু হ্যাঁয়, গরীবী হ্যয়, ভুখ, প্যাস, বেবসী
শায়র হুঁ, উন আঁখোঁ কো ক্যয়সে কহুঁ কমল ম্যাঁয়।
মেরা থা কাম, খুন-পসীনা লগা দিয়া
কাটেঙ্গে কোই অওর, ন কাটুঙ্গা ফসল ম্যয়।
ঠোকর তো বহুত বার লগী, হোশ ন আয়া
হ্যয় মর্জ লা-জবাব, ন পাউঙ্গা সঁভল ম্যাঁয়।
তব তক ন কোই ছন্দ, কোই গীত উতরতা
জব তক কি আঁচ-তাপ মেঁ জাতা ন পিঘল ম্যাঁয়।
কহনে কো তো কহতে হ্যাঁয় গজল অওর বহুত লোগ
কহতে হ্যাঁয় মগর লোগ কি কহতা হুঁ গজল ম্যাঁয়।

শুধু ভাষার সহজতা বা শব্দের সুচারুতাই নয়, নতুন উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক প্রভৃতির ছটাও আজকের গজলের বিশেষত্ব। আধুনিক কবির কাছে 'উপমাই কবিত্ব'। উদাহরণত শ্রীরাম মীনার একটি গজল পড়া যাক —

'দহকতা অঙ্গার পানী মেঁ ডুবাও মত
ইস তরহ সে ডুবকর, ইতনা নহও মত।
য়হ নদী গহরী নহীঁ হ্যয়, আপমে জ্যাদা
আপ দরিয়া মেঁ, অওর দরিয়া ডুবাও মত।
জুলফ জ্যয়সে ঘটায়েঁ ভী নহাকর নিকলী—
মোতিয়োঁ সী বুন্দ কো, নীচে গিরাও মত।
বস্ত্র সারী দেহ সে, লিপটে হুয়ে চুম্বন
চুমতে হ্যাঁয় উও, অধর মেরে জ্বলাও মত।'

যৌন ও গণ এই দুই ধারায় উত্তর-দুষ্যন্তীয় গজলায়ণ এগিয়েছে। যৌনভিত্তিতে গড়ে উঠেছে গণজ প্রবাহ। কেন-না 'মানুষের সত্যকার মুক্তি তার নিজের ভেতরকার প্রেরণা ছাড়া আসে না'—এবং তা মুখ্যত যৌনজ। ফ্রয়েডীয়-মার্কসীয় তত্ত্ব গজলে কীভাবে এসেছে, তা একটি উদাহরণ সহযোগে বোঝাচ্ছি। ১৯৮২ সালে জাঁ-লুক গোদারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'রাগী' ছবি 'ব্রিটিশ সাউন্ডস' নিয়ে প্রচণ্ড বিতর্কের ঝড় ওঠে। ছবিটির দ্বিতীয় সিকোয়েন্সের একটি দৃশ্য দিয়েই বিতর্ক। দৃশ্যটিতে ছিল একটি নগ্ন রমণী—সাউন্ডট্র্যাকে নারীমুক্তি আন্দোলনের কথা। মেয়েটির নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় যোনির সামনাসামনি ক্লোজশট। এই পুরো সিকোয়েন্সটিতে গোদার কিন্তু দর্শকদের দেখাতে চাননি যৌনতা বা নারীদেহের সৌন্দর্য। বরং ফুটিয়ে তুলেছেন যৌনতা ও স্বাধীনতার পারস্পরিক জটিল ও অসম সম্পর্ক। দৃশ্যটিতে ডায়ালেকটিক্যাল ইনটার প্লে নারী-স্বাধীনতা বিষয়টাকে ছাপিয়ে যৌন আচরণ ও রাজনৈতিক আচরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে থাকে। হঠাৎ পর্দায় —'যৌন বিকৃতি ও স্টালিনইজম', 'একজনের লিঙ্গকে চাপা দিয়ে শ্রমিক সংগঠনের সিদ্ধান্তকে গোপন রাখা' ইত্যাদির ভেতর দিয়ে সমান্তরালতা দেখানোর প্রচেষ্টা। এই রকম জটিল বিষয় নিয়ে হিন্দীতে শ্রীরাম মীনা, ভগবতী প্রসাদ, মীনাক্ষী চৌহান প্রমুখ গজল লেখার চেষ্টা করছেন, যা নতুনত্বের পরিচায়ক।

কিন্তু জীবন শুধু মননসর্বস্ব নয়, দেহের নৈরাজ্যও সেখানে চলে না। তাই অনেকের গজলের দেহবাদে ফুটে উঠেছে মার্কস-লেনিনীয় তত্ত্ব। প্রোলেতারীয় গজলের জন্ম হয়েছে। সুরেশ বিমলের এই গজলটি তারই নমুনা—

'আগ হী আগ হুই সব তরফ য়্যারো

বচ কে অব জায়েঁ তো কহাঁ য়্যারো।
হাথ মেঁ শখস কে জলতী মশাল
কিস-কিস কো সমঝায়েঁ যহাঁ য়্যারো।
বস্তী মেঁ লগী হ্যয় আগ ঘর-ঘর মেঁ
ধুনী সা সুলগ রহা জরা-জরা য়্যারো।
আজ কী ইস সভ্যতা তো ক্যা কহেঁ
আদমী কো আদমী নশতর হুয়া য়্যারো।
জুলম অওর শোষণ কী সমাপ্তি চাহিয়ে
গজল সে সর্বহারা কী চাহত লিখী য়্যারো।'

এই ধারার বিশিষ্ট কবি কলীম আনন্দ আবৃত্তিযোগ্য বহু গজল লিখেছেন।লেখনভঙ্গিতে হৃদয়াবেগের সাবলীল উচ্ছ্বাস বেশ মর্মস্পর্শী। নিচে উদ্ধৃত গজলটিতে কলীম নবজাগরিত ভিয়েতনামের মানবতার পূর্ণ অধিকার ও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের প্রয়াসকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন—

'তেজ অওর তেজ দওড়তে রহিয়ে
জিন্দগী ক্যা হ্যয় সোচতে রহিয়ে।
অব পহাড়োঁ সে লওট আয়ী হ্যয়
অপনী আওয়াজ খোজতে রহিয়ে।
মুফলিসী বন গয়ী হ্যয় আজাদী
জিতনা জী চাহে বোলতে রহিয়ে।
পৎথরো কা য়হী জমানা হ্যয়
লাখ শীশোঁ কো কোসতে রহিয়ে।
ক্যোঁ ন সূরজ সে দোস্তী করকে
রোশনী রোজ তোলতে রহিয়ে।'

ওই চেতনা বা প্রত্যয় আরও শৈল্পিক রূপ পেয়েছে জাহির কুরেশির গজলে।তাঁর একটি গজলের দুটি শের নিচে নিচে লিখছি—

'আগ কো ভী নহীঁ পতা হ্যয়, সুনো
য়ে ‘হিমালয়’ সুলগ রহা হ্যয়, সুনো।
তুমনে মুঝকো সমঝ লিয়া কি নহীঁ?
ম্যঁয়নে তুমকো সমঝ লিয়া হ্যয়, সুনো।'

সংযত হৃদয়াবেগের জন্য সত্যপাল সাকসেনা ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তা হাসিল করেছেন। ইনি দরদের কবি —সাম্যবাদী চিন্তায় বিশিষ্ট। তাঁর রচনার নমুনা—

'রেত পর হাথ সে কুছ অশক বনা দেতা হুঁ
দিল পে মুশকিল-সে লমহে এ্যয়সে বিতা দেতা হুঁ।
মেরা মকসদ তেরী রাহত তো নহীঁ হ্যয় লেকিন
জিন্দগী! আ, ম্যঁয় তেরে বোঝ উঠা দেতা হুঁ।'

এর পাশাপাশি পড়া যাক আনোয়ার শামীমের একটি গজল। আনোয়ার ধানবাদের কবি, জন্ম ১৯৬২; হিন্দী ভাষায় নতুন ধারার কবিতা ও গজল লিখছেন বিগত চার দশক ধরে। আসুন, শামীমের গজলটি পাঠ করা যাক—

'চাঁদ হোগা, ন চাঁদনী হোগী।
জিন্দগী মেরী জল রহী হোগী।

মেরে কমরে মেঁ কৌন আয়েগা,
ভুলী-ভটকী সী য়্যাদ হী হোগী।
কিতনে দরওয়াজে মুন্তজির হোঙ্গে।
মেরী খিড়কী ভী জাগতী হোগী।
মেরে অশআর থক গয়ে হোঙ্গে,
নীঁদ খওয়াবোঁ কো আ গঈ হোগী।
আইনা জব জুবান খোলেগা,
মেরী সুরত থকী-থকী হোগী।'

পরিশেষে সরস্বতী কুমার 'দীপক'-এর একটি গজলের কিয়দংশ উদ্ধৃতি অসংগত হবে না—বরং যথেষ্ট প্রাসংগিক

'চুপ খড়ে হ্যাঁয় পেড় সারে, আজকল
রো রহে তম কে সিতারে, আজকল।
বহ রহী কিস অওর সরিতা, ক্যা পতা—
কহ রহে দোনোঁ কিনারে, আজকল।
হটো জী, অব কহাঁ কবিতা কী জগহ—
গজলোঁ কী ধুম মচী হ্যয় প্যারে, আজকল।'

হিন্দীতে এখন গজলেরই জয়যাত্রা। অসংখ্য কবির দল গজলচর্চা করে চলেছেন এবং গতানুগতিক ভাবধারা বর্জন করে অভিনব ভাবধারার সন্ধানে ব্রতী আছেন। এঁদের সকলেই যে গজলেও সফল, এমন কথা বলব না। অনেকের কাছে গজল একটা চ্যালেঞ্জে মতো, এবং তাঁরা অজীম শায়র ফয়েজ আহমদ 'ফয়েজে'র এই শেরটি সম্ভবত কবুলও করেন :

'গর বাজী ইশক কী বাজী হ্যয় জো কুছ ভী লগা দো ডর ক্যয়সা
গর জীত গয়ে তো ক্যা কহনে, হারে ভী তো বাজী মাত নহীঁ।'

মৌসিকী-এ-গজল

'গজল শায়রী নয়, তহজীব।'—বলেছেন অধ্যাপক আহমদ সিদ্দিকি। অর্থাৎ, গজল কেবলমাত্র কাব্য নয়, তা সংস্কৃতি। আর এই সংস্কৃতি হলো মৌসিকীর। অর্থাৎ সংগীতের। সুরবিহীন গজল নেবানো প্রদীপের মতো। এ-মন্তব্যের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। শায়রকে অনুসরণ করে বলব—

'চাঁদ কে বিনা সারী রাত স্যাহ হ্যয়
ফুল কে বিনা চমন তবাহ হ্যয়,
শায়র কী গজল তো এক আহ হ্যয়
গায়ী ন গঈ তো লিখনা গুনাহ হ্যয়।'

মূলত, গজল লঘু শাস্ত্রীয় বা রাগসংগীত বিশেষ। আবার হালকা-গম্ভীর রসের মিশ্রণে সিক্ত আধ্যাত্মিক গানও বটে। উদ্ভব পারস্যে। ভারতীয় সংগীতের মধুস্পর্শ সংযোজিত হলে গজল গানের ধারা হিন্দুস্তানে অনুপ্রবেশ করে। ভারতীয় সংগীতের যে দুটি ধারা হিন্দুস্তানি (উত্তর ভারতীয়) এবং কর্নাটকী (দক্ষিণ ভারতীয়), গজল তার প্রথম ধারার অন্তর্ভুক্ত। হিন্দুস্তানি সংগীতধারায় গজলের সংযুক্তি ঘটলে ফার্সি, উর্দু ও অন্যবিধ ভাষার গজল রচনার প্রবাহ শুরু হয় এবং তাতে রাগসংগীতের মাধুর্য যুক্ত হওয়ায় গজল গান হিশেবে নতুন মাত্রা পায়।

গজলের মধ্যে সততই মনকে আপ্লুত করার একটি খাস গুণ রয়েছে। এতে সুরের চেয়ে কথার প্রাধান্য বেশি। এ গান শৃঙ্গাররসাত্মক এবং এর মূল উপজীব্য প্রেম অথবা প্রেমিক-প্রেমিকার পারস্পরিক নিবেদন হলেও গজল এমন এক অভিনব শৈলী যাতে প্রেম ও ভক্তির অপূর্ব সঙ্গম ঘটেছে। এছাড়াও, গজলে অন্যতর বিষয়ও স্বাভাবিক ভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ গানে অনেকগুলি চরণ, কলি বা তুক বিদ্যমান। প্রথম কলিটি 'স্থায়ী', বাদবাকি কলি 'অন্তরা' এবং সেগুলি একই সুরে গাওয়া হয়। মধ্যে-মধ্যে কোনো স্তবক ছন্দ ভেঙে ধীর লয়ে আবৃত্তি করা হয়। গজল গানের প্রকৃতি বা স্বভাব কোমল। টপ্পা আর ঠুমরির মতো গজল গানে মধুর ও মৃদু স্বভাবের রাগ ব্যবহৃত হয়। সচরাচর কাফি, ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, ভৈরবী, পিলু, বারোয়া প্রভৃতি রাগ এবং পশতু ও দীপচন্দী তালে গজল গাওয়া হয়।[৬৪]

গজল গানের কলিগুলির অর্থ প্রায়ই দ্ব্যর্থবোধক। প্রেম যখন পুরুষ বা নারীর প্রতি নিবেদিত হয় তখন সে গজল মানব-প্রেম বা পার্থিব প্রেম; আবার প্রেম যখন স্রষ্টার উদ্দেশে নিবেদিত, তখন তা আধ্যাত্মিক প্রেম। তাই গজল এক ধরনের 'ভাবসংগীত' বলেও পরিচিত। গজলের আর একটি রূপও আছে, যা অন্য গানে নেই। সেটা হলো, আবৃত্তি আকারে গজল পরিবেশন। এসব ধর্মের গুণেই গজল শাস্ত্রীয় সংগীতের ভুবনে আলাদা জাত হিশেবে গণ্য।

এবার সরাসরি গঠনবৈশিষ্ট্যের কথায় আসি। যে-কথার আভাস আগেও দিয়েছি,—গজল দুটি পংক্তি নিয়ে রচিত। দুটি পংক্তি নিয়ে এক-একটি খণ্ড। প্রতিটি খণ্ডকে বলে 'শের'। একাধিক বা অনেকগুলি শের নিয়ে এক-একটি গজলের অবয়ব। গজলের কাব্যভাষাই মুখ্য। ভাষার লালিত্য, শব্দের ঝংকার, ছন্দের মাধুর্য গজলের বৈশিষ্ট্য। গজলের প্রথম শেরই হলো 'স্থায়ী', এবং বাদবাকি 'অন্তরা'। গজল গাওয়ার নির্দিষ্ট কোনো রাগ নেই, কিন্তু মূলত যেসব রাগে শৃঙ্গাররস সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে সেই সব রাগে, যেমন একটু আগেই বললাম, কাফি, পিলু, খাম্বাজ, ভৈরবী প্রভৃতি তথাকথিত চটুল রাগের ব্যবহার গজলে বেশি দেখা যায়। তা বলে দরবারী কানাড়া, মিয়া-কী-মল্লার, বিলাসখানি টোড়ি, চন্দ্রকোষ প্রভৃতি গম্ভীর চালের রাগেও গজলের পরিবেশনে বাধা নেই। তবে ধ্রুপদ বা খেয়ালের মতো তাল, বাঁট করার ব্যাপার নেই এবং স্থায়ী ব্যতিরেকে

সমস্ত অন্তরা একই সুরে গাওয়া হয়। অবশ্য, তালের ব্যাপারে গজল পরিবেশনের পরিধি কিছুটা সীমাবদ্ধ। তালের গজলে কাব্যিকভাবে অন্তরার সৃষ্টি হয়। তাই স্বল্পমাত্রা আর সরল ছন্দের কাহারবা ও দাদরা তালেই বেশির ভাগ গজল গীত হয়। তালের ক্ষেত্রেও কোনও ধরনের কূটলয়কারী বা তেহাই প্রয়োগ করা হয় না এবং গজল প্রধানত মধ্য লয়ে পরিবেশিত হয়।

'মাতাল যেমন মদপিয়াসী, চিরমধুর সেই বঁধুরে তেমনি আমি ভালোবাসি।'—কৃষ্ণচন্দ্রের গজল ঢঙে গাওয়া এই ভজনটি দিয়েই আমার বৈঠকী গানের শ্রবণযাত্রা শুরু হয়েছিল। গোঁফ গজানোর বয়স তখনও আসেনি, কিন্তু সেই অপক্ক বয়সেই সায়গল, বেগম আখতার, কমলা ঝরিয়াদের গান শুনে এক অদ্ভুত শিহরণ জাগত। এখনও জাগে। ওইসব সুরেলা গলায় কী এক জাদু আছে, যার মোহজালে আমি আকৈশোর বাঁধা পড়ে আছি। আজ জলসায় গুলাম আলি, জগজিৎ সিং, নুসরৎ ফতেহ আলি খান, পংকজ উধাস, পিনাজ মসানিদের প্রত্যক্ষ গান শোনবার জন্য লোকের হুটোপুটি দেখে যত আনন্দ হয়, ততটাই কষ্ট জাগে। আনন্দ এই কারণে যে এখনও গজলের মতো বন্দেশি গানের শ্রোতা আছে। আর কষ্ট পাই, কারণ এখন যে-হারে সস্তা বাহারী গজলের হরিল্লুঠ চলছে তাতে গজলের শর্বরী ঘনাতে বোধকরি আর সময় নেবে না। খানদানি গজল তো ডোডো পাখির মতো অবলুপ্তির পথে। এখনকার বেশির ভাগ গায়কই শ্রোতার বুক ভরাতে অক্ষম। অথচ, সেকালে বেগম আখতারের গজল এমন ছুরি বসিয়ে দিত যে একবার শোনার পর তা উপড়ে ফেলতে অন্তত দিন-পাঁচেক সময় লাগত।

গজলের পাঠেও অনেক ফেরবদল ঘটেছে। আমি যে-কটি মুশায়রা বা সাধারণ মেহেফিলে গজল পাঠ শুনেছি, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পাঠের ধরন-ধারণ দেখে মনে হয়েছে—যাঁরা এই তরন্নুম আবৃত্তি করেন তাঁদের মধ্যে গজল পাঠ সম্পর্কে প্রকৃত ধারণার অভাব রয়েছে। গজলের প্রতিটি শেরে দুটি করে যে পংক্তি থাকে সে-দুটির উচ্চারণ ও সুর বিধিতে তারতম্য থাকা বাঞ্ছনীয়। শেরের প্রথম পংক্তিটিকে দু-বার এবং দ্বিতীয়টিকে একবার বলাই বিধেয়। প্রথমটির বেলায় ঈষৎ বিলম্বিত তথা দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত দ্রুত—এইভাবে আবৃত্তি বা পাঠ করা উচিত। কিন্তু সেই প্রলম্বিত বা হ্রস্ব উচ্চারণের মান বা প্রোপোরেশন কতখানি হবে সে-সম্পর্কে পাঠকর্তার সম্যক জ্ঞান না থাকলে একটা আন্দোলিত ভঙ্গির সৃষ্টি হয় মাত্র—তাকে 'গজল পাঠ' বললে সত্যের অপলাপ হয়। অপিচ, আজকের দিনে গজলের নিখুঁত পাঠ হয় না বললেই চলে।

গেয় গজলের সবচেয়ে বড়ো বিবেচনা-স্থল হলো উচ্চারণ ও সুরের জ্ঞান। পাঠের ক্ষেত্রেও যুক্তাক্ষরে উচ্চারণ ব্যাপারটা বিচার্য। একটি যুক্তাক্ষরকে কীভাবে ভেঙে কোন অংশটা চড়া আর কোনটা নিচে উচ্চারিত হবে, তা জানতে হবে গায়ক ও পাঠককে। কাজটা যে সহজ নয় এটা সকলে স্বীকার করবেন। কেননা উচ্চারণের সুরেলা কোমল বৃত্তিকে সম্পূর্ণ বজায় রেখে তা বোঝানোর চেষ্টা করাও বাতুলতা। নিদেনপক্ষে লেখাতে যদি আশেপাশের ডায়মেনশন এনে হাজির করি, তাহলে হয়ত-বা পড়তে জিনিশটা ইন্টারেস্টিং ঠেকবে; কিন্তু সেই সালিসি তো ফাঁকি। অতএব এখানে শুধু এইটুকু বলার, যে, উচ্চারণ ও সুরজ্ঞান পর্যাপ্ত না হলে গজল বিকৃত হতে পারে, যা গর্হিত ও অন্যায়।

বাঈজী, বাদশা আর শায়র—এই তিনের সন্নিপাতে শুরু হয়েছিল ভারতীয় গজল গানের অভিযাত্রা। পক্ষান্তরে, ত্রয়োদশ শতকের রাজন্যপোষিত বাঈজীরা যেদিন প্রথম শায়রদের পাশাপাশি বাদশাহী দরবারে প্রবেশাধিকার পেয়েছিল, সেদিনই গজল গানের জন্ম। সেটা ছিল আমির খুসরোর (১২৫৩-১৩২৫) জমানা। তারপর শত শত বছর বয়ে গেছে পাহাড়ের বুকে ঝরনার মতো। কিন্তু এই সন্নিপাতের ডোর বহুদিন পর্যন্ত থেকেছে অচ্ছিন্ন।

ইসলাম ধর্মে গানবাজনা করা 'গুনাহ'—অর্থাৎ পাপ। কিন্তু এ-কথা উল্লেখের অবকাশ নেই যে আমাদের দেশে সংগীতের প্রভূত উন্নতি মুসলিম যুগেই ঘটেছে এবং এদেশের প্রাচীন সংগীতধারাকে নবনব রসে সিঞ্চিত করার মূলে মুসলমানরাই ছিলেন অগ্রণী। আসলে সংগীত বা মৌসিকী এমনই এক হৃদয়কাড়া ফুলবাগিচা যার আকর্ষণ ধর্মের নিষেধাজ্ঞার বেড়াকেও টপকে যায়। মুসলমানদের ধর্মগুরু মরমী সুফিসন্ত

মোইনুদ্দিন চিস্তির (১১৪৩-১২৩৬) আগ্রহে সংগীতের ওপর থেকে ইসলামের নিষেধাজ্ঞা শিথিল হয়েছিল। অবশ্য, যাকে বলে প্রভাব, ভারতীয় সংগীতের ওপর মুসলমানরা তা ফেলতে পারেননি। শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, রীতি-রেওয়াজ ইত্যাদির ওপর মুসলিম প্রভাব পড়লেও ভারতীয় সংগীতকে তাঁরা ইসলামিকরণ করতে পারেন নি। এর কারণ, তখনকার ভারতীয় সংগীত এত নিয়মবদ্ধ, উচ্চাঙ্গের এবং স্থায়ী রূপ নিয়ে বর্তমান ছিল যে বহিরাগতের আলোড়ন তাকে তেমনভাবে টলাতে পারেনি।[৬৫] বরং মুসলিম গাইয়ে-ওস্তাদরাই ভারতীয় সংগীতের প্রাচীন ঐতিহ্য ও রসধারার সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন।

তবে এ-কথা অনস্বীকার্য যে গজল ও বাঈজী সংস্কৃতির জনক ও প্রতিপালক ছিলেন মুসলিমরাই। আমির খুসরোর জমানা অবধি দেবদাসী ও বাঈজীদের মধ্যে কোনও তফাৎ ছিল না। এদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি শুরু হয় ১২৭০-৭৫ নাগাদ। দেবদাসীরা চিহ্নিত হলো মন্দিরের নর্তকী হিসেবে এবং বাইজিরা রাজসভার নর্তকী হিসেবে। দক্ষিণে ছিল দেবদাসীদের প্রচলন আর উত্তর ভারতে বাইজিদের। মুসলিম শাসকের বাইজিদের কোঠাতেই সপারিষদ খানাপিনা আর নাচ-গান উপভোগ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। 'একদিকে বিপুল রাজস্বের কাঁচা টাকা, অন্যদিকে অন্তহীন চক্রান্ত আর শাসক বংশের দ্রুত ও আকস্মিক উত্থান-পতনের অনিশ্চয়তা—এর মধ্যে মুসলমান শাসকেরা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে ভুলে গিয়ে দু'হাতে পাগলের মতো খরচ করতেন।গানবাজনা, সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ আর কবিতা—তাঁদের ছিল এই তিন নেশা। এই সাংস্কৃতিক জীবনের শতবর্ষ পূর্ণ হবার আগেই তৈমুর দিল্লি তছনছ করে দিয়ে যান (১৩৯৮-৯৯)। সমরখন্দকে একটি সুন্দর রাজধানীর রূপ দেবার জন্য অনেক কারিগর ও ভবঘুরেদের সাংস্কৃতিক জীবনে আকর্ষিত করার জন্যে গাইয়ে বাজিয়েদের সঙ্গে করে তিনি নিয়ে গেলেন। অন্যান্য কারিগর আর গাইয়ে বাজিয়েরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলেন মুসলমান প্রধান জায়গাগুলিতে—উত্তরে জৌনপুর, মাণ্ডু, দাক্ষিণাত্যের দিকে আহমদনগর, বহিপুর, গোলকুণ্ডায়।ফলত বাইজিরা দেশের বহু জায়গায় বসবাস শুরু করলেন। দিল্লির সুলতানরা আবার যখন শক্তিশালী হলেন তখন আবার সেখানে জড়ো হতে লাগলেন প্রতিভাবানরা। মোগলরা চিত্রশিল্পীদের উৎসাহ দিতেন, তবেই বোধহয় বাঈজীদের পোশাকেও লাগলো রঙ ও শহুরে সংস্কৃতির ছোঁয়া। আগেকার উগ্র রঙের বদলে এল মৃদু সূক্ষ আভা। তাদের সংগীত সংগ্রহে পারসিক গজল ও হিন্দি গীতের সঙ্গে যুক্ত হল উর্দু গজল।' [৬৬]

'বাঈ' কথাটা নিয়ে যাতে বিভ্রাট না ঘটে তার জন্যে দু-চার কথা বলা দরকার।'বাঈ' শব্দটির অর্থ—মেয়ে বা সম্ভ্রান্ত মহিলা। কিন্তু শব্দটির আসল অর্থ এখন লুপ্ত হয়েছে, লোকে বাঈজী বলতে বোঝে স্খলিত, পতিত, বিনোদিনীকুলকে। 'তবায়েফ' শব্দটিরও অনুরূপ সর্বনাশ হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়িয়েছে বেশ্যা বা চরিত্রহীনা নর্তকী। কিন্তু ইতিহাসের পাতা ওলটালে এমন বহু নর্তকী বা বাঈজীর সাক্ষাৎ মিলবে যাঁদের 'বেশ্যা' বললে অপমান করা হয়। মহারাষ্ট্রে আজও ধনী ও অভিজাত বংশের মহিলারা তাঁদের নামের পেছনে 'বাঈ' শব্দটি ব্যবহার করতে গর্ববোধ করেন। মোগল আমলেও 'বাঈ' শব্দটি ছিল সম্ভ্রান্ত—কোনও কোনও রাজদরবারে রানিসাহেবার ওপরে ছিল বাঈজীদের স্থান। তাঁরা সুশিক্ষিত, সংগীতকলায় নিপুণ ও সমাজে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। গোড়ার দিকে বেশির ভাগ বাঈজী ছিলেন এক-পুরুষবিহারিনী। তার প্রমাণ, ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দের আগে পৃথিবীতে উপদংশ রোগ জন্মায়নি। বাঈজী কথাটি যে সম্মানের প্রতীক ছিল, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ—'বাঈজীরা চাইতেন তাঁদের মেয়ে হোক, কেননা মেয়ে হয়ে জন্মালে রাজসম্মান লাভ করা যেত।' [৬৭]

পরে অবশ্যি দেবদাসীদের মতো, বাঈজীরাও গণিকাবৃত্তির অসহায় শিকার হয়ে পড়েছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার (১৫২৬) পর থেকে বাঈজীদের মধ্যে ব্যভিচারিণীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। মোগল সাম্রাজ্যের পতন আমাদের প্রপিতামহদের যুগ থেকে একটি বহু-আলোচিত বিষয়; কিন্তু দুঃখের কথা এই দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আটকে থাকা বাঈজীদের পতন ও তাঁদের কারুণ্যঘন জীবনের গল্প এমন সাশ্রুনেত্রে কোনো ঐতিহাসিকই বলেননি। এ দেশে আরভিং স্টোনের মতো লেখক থাকলে সেই গল্প লেখা

হতো ঠিকই। ভারতের মধ্যযুগে শুরু হয়েছিল বাঈজী সংস্কৃতি, কিন্তু এই যুগের প্রথম (ছয় শতক থেকে ১২০০ খ্রি.) কিংবা দ্বিতীয় ভাগের (১২০০-১৫২৬) কোনো বাঈজীর জীবনকাহিনী ইতিহাস লিখে রাখেনি। সুতরাং আমাদের আলোচনা শুরু করতে হবে মধ্যযুগের তৃতীয় ভাগ (১৫২৬-১৭০৭) থেকে।

আকবরি জমানায় হাফ-গজলের সৃষ্টি। বাঈজীরা যে গজল গাইতেন তাতে ঠুংরির অনুপ্রবেশ ঘটায় এই নামকরণ। শাজাহানের শাসনকালে এই হাফ-গজল আরও সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে।হিন্দুস্তানি সংগীত সম্বন্ধে প্রথম গ্রন্থ 'শমস-উল-অসওয়াত' এই সময়ে লিখিত। গজলের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষাও ওই কালের একটি বড়ো ঘটনা। ইতিহাসে যে জৈনব বাঈয়ের কথা পাই, তিনি ছিলেন ঔরঙ্গজেবের প্রিয়তমা। অসাধারণ রূপবতী ছিলেন জৈনব বাঈ। সেই রূপানলে পুড়ে মরতে অনেক পুরুষই প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু জৈনব নিজের প্রাণমন সঁপে দিয়েছিলেন ঔরঙ্গজেবকে। প্রথম দর্শনে ঔরঙ্গজেব তাঁর কৃপাপ্রার্থী হলে জৈনব তাঁকে প্রণয়দানে সম্মত হয়েছিলেন এই শর্তে যে, ঔরঙ্গজেবকে মদিরাপানে বীতরাগ দূর করতে হবে। জানা যায়, এই বাঈজী ঔরঙ্গজেবের মদাসক্তি অনেক পরিমাণে শিথিল করতে কৃতকার্য হয়েছিলেন।[৬৮]

আঠারো শতক ছিল বাঈজীদের স্বর্ণযুগ। রাজনৈতিক দিক থেকে দিল্লি তখন টলমল হলেও শায়র ও বাঈজীদের কাছে তা হয়ে উঠেছিল স্বর্ণভূমি। বাঈজীরা এই যুগে তাঁদের শিল্পকে করে তুলেছিলেন অনেক বেশি দৃষ্টিনন্দন। বাঈজীদের কোঠা ফরাসি মলেঁর মতো মানুষের মেলামেশার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই যুগের কেক্তো বাঈজীর গল্প ইতিহাস লিখে রাখেনি কেন, তা আমার কাছে দুর্বোধ্য।

এরপর শাসক হঠাৎ শাসিতে রূপান্তরিত হলে যা হয়, পলাশীর ময়দানে মারণযুদ্ধের শেষে মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থাও সেইরকম দাঁড়াল। সামাজিক-আর্থিক ভারসাম্য চোট খেল। ইংরেজ শাসনের আগে দেশের সমূহ গুরুত্বপূর্ণ পদে মুসলমানরা অধিষ্ঠিত ছিলেন, এখন সেই প্রতিষ্ঠা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হলেন। ফলত পরবর্তী বহু ব্রিটিশ-বিরোধী সংঘর্ষে ফেটে পড়েছে তাঁদের ক্ষোভ আর শক্তি। বলতে কী, মুসলিমরা তখনও হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের ও দারুল ইসলাম (ইসলামি রাজ্য) প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকায় ভারতবর্ষকে দারুল হারব (বিধর্মী শাসিত রাজ্য হিসেবে সমরভূমি) বলে কল্পনা করতেন। তাঁরা হিন্দুদের মতো সহজে ব্রিটিশ শাসনকে মেনে নিতে পারেননি এবং দীর্ঘকাল ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষা-সংস্কৃতি থেকে বিমুখ থেকেছেন। পরিণামে তাঁদের নিজস্ব সংগীত-শিল্প-সাহিত্য বিকশিত হবার সুযোগ পেয়েছে। গজল আর বাঈজী-সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত থেকেছে।

মারাঠারা বাঈজী সংস্কৃতিকে হৃদয়ঙ্গম করতে দিল্লি আর লখনউ থেকে কিছু বীজ তুলে নিয়ে গিয়ে পুঁতেছিলেন পুনা ও বম্বেতে। কিন্তু তা অঙ্কুরিত হবার আগেই বিনষ্ট হয়েছিল। শেরবাঈ, মুগুবাঈ, হীরাবাঈ কিংবা গাঙ্গুবাঈ অথবা তামাঞ্জা জান তো পরের ঘটনা। মস্তানী বাঈকে পেশোয়া বাজীরাও অনেক চেষ্টায় তাঁর রক্ষিতা হতে সম্মত করিয়েছিলেন। তাঁদেরই পুত্র বাহাদুর খান, যিনি পানিপথের তৃতীয় লড়াইয়ে আফগানদের সঙ্গে লড়েছিলেন এবং পরে ঝাঁসির নবাব বংশ ধ্বংস করেছিলেন। সিপাহি বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত মারাঠি পতাকা উত্তোলিত ছিল।পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১) পরাজয় সুনিশ্চিত জেনে, গোয়ালিয়র রাজবংশের সংস্থাপক মাধাজি সিন্ধিয়া যুদ্ধভূমি থেকে পালানোর সময় ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়েছিলেন এক রূপবতী বাঈজীকে। কাশ্মিরের দুহিতা বেগম সমরু ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া। একের পর এক ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষী যুবকের তিনি শয্যাসঙ্গিনী হয়েছিলেন। এইরকম আরও কিছু বাঈজীর সন্ধান মারাঠা-ইতিহাসে পাওয়া যায়।কিন্তু সত্যি বলতে কী, মারাঠারা মুসলমানদের ঐতিহ্যপুষ্ট বাঈজী-সংস্কৃতিকে জিইয়ে রাখতে পারেননি। সেই সংস্কৃতির জল দিল্লি থেকে গড়িয়ে বয়ে গিয়েছিল আওধের দিকে।

হিন্দুস্তানে ইংরেজ আগমনের পরেও প্রাচ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল একমাত্র আওধের গুজিস্তা দরবারে। এদেশের প্রাচীন তহজীব ও সংস্কৃতির অবশিষ্ট অংশটুকু জীবিত ছিল লখনউ দরবারে। লখনউ শুধু আওধের নয়, তামাম হিন্দুস্তানের শেষ দরবার। লছমন টিলা বা লক্ষণপুরের নাম পালটে কোন

সময়ে 'লখনউ'-এর জন্ম, তা জানি না, কিন্তু ইতিহাস থেকে জেনেছি এই দরবারের উত্থান ও পতনের মর্মন্তুদ কাহিনি। সেই কাহিনি বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে বহুলাংশে প্রাসঙ্গিক।

১৫৯০ সনে আকবর যখন হিন্দুস্তানকে বারোটি প্রান্তে ভাগ করেন তখন আওধ প্রদেশের রাজধানী হয় অযোধ্যা। ১৭৩২ সনে নবাব সাদাত খাঁ বুরহান-উল-মুল্ক সুবেদার নিযুক্ত হলে আওধের এই রাজধানী স্থানান্তরিত হয় ঘাগরা নদীর ধারে। সেখানেই বাঈজী ও গজল-ঠুংরি সংস্কৃতির পত্তন হয়েছিল নবাবের পৃষ্ঠপোষকতায়।নৃত্য ও গীত পটিয়সী রমণীদের জন্য বুরহান একটি নগর গড়ে তুলেছিলেন। নগর না বলে তাকে বস্তি বলাই সংগত। কেবলমাত্র গাইয়ে-বাজিয়েদের বসবাসের অধিকার ছিল সেখানে। মির্জা সাকীম আবদুল মনসুর খাঁ সফদরজঙের জমানায় এই বস্তির নাম রাখা হয় ফৈজাবাদ। সফদরজঙও নৃত্যগীতের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। সৈন্যদল মজবুত করা, নতুন ঘোড়সওয়ার তৈরি আর নগর জুড়ে ইমারত খাড়া করা—এই তিন ছিল নখনউয়ের বাদশাদের প্রধান কাজ। সফদরজঙের নবাবজাদা সুজাউদ্দৌলা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আবদুল হলীম শরর লিখেছেন—'ফৈজাবাদ সুজাউদ্দৌলার রাজধানী হল, সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার জনসংখ্যা হু হু করে বেড়ে গেল। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোক এসে ফৈজাবাদে বসতি গেড়ে বসলো। দিকে দিকে আকাশছোঁয়া ইমারৎ গজিয়ে উঠলো। কয়েক বছরের মধ্যে ফৈজাবাদের চেহারাই পালটে গেলো। শহরে মৃগয়া আর সান্ধ্যবিহারের জন্য সাতখানা বাগিচা তৈরি হল। লখনউ সড়কের পাশে আসফবাগ ও বুলন্দবাগ নামে দুটি উপনগর গড়ে উঠলো, মুমতাজ নগরে চালু হল বাজার—চারদিকে এক সাংস্কৃতিক বাতাবরন রচিত হল। নবাব আর আমির ভদ্রজনেরা মেতে উঠলেন গান-বাজনা নিয়ে।' [৬৯]

আফসউদ্দৌলার জমানায় এই বাতাবরণের কোনো হেরফের ঘটেনি। বরং একদিকে যেমন শাসনশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে শহরের সৌন্দর্য, শান-শওকৎ। একদিকে ব্রিটিশ রাজসিংহের আগ্রাসী থাবা সমগ্র শাসনব্যবস্থাকে কব্জা করতে তৎপর, অন্যদিকে নর্তকী বিলাসে মেতে উঠেছে সমস্ত লখনউবাসী ।এই সন্ধিক্ষণেই আবির্ভূত হয়েছিলেন তদানীন্তন ভারতবর্ষের স্বনামধন্য গজলিয়া চুম্মন বাঈ। তাঁর ডেরা ছিল ইমামবাড়ায়। আফসউদ্দৌলা শিল্পের কদর জানতেন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় লেখা হয়েছিল 'উসুল-উল-নগমাত-উল-আফসিয়া'। ভারতীয় সংগীতশিল্প নিয়ে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপূর্বে লেখা হয়নি।

১৭৯৮ সনে আফসউদ্দৌলার দেহাবসানের পর নবাব ওয়াজির আলি খাঁ আওধের শাসক হলেন। কিন্তু কিছুদিনের শাসনে তিনি এমন কতকগুলি কাজের নমুনা দিলেন যাতে তাঁর প্রজারা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। গোপনে মন্তব্য প্রচারিত হল—তিনি আসনে আফসউদ্দৌলার ঔরসজাত সন্তানই নন। চার মাসের মধ্যে নবাবি হস্তান্তরিত হল। এলেন সাদাত আলি খাঁ। আর এসেই আওধের অর্ধেকটা তুলে দিলেন ব্রিটিশের হাতে। রাজকার্য তিলাঞ্জলি দিয়ে সাদাব আলি বেনারসের বাঈজীদের নিয়ে মেতে থাকলেন।প্রায় এক মন সোনার বিনিময়ে তিনি হায়দরাবাদের কোঠা থেকে কিনে নিয়ে এসেছিলেন চন্দা বাইকে। চন্দাই ছিলেন আঠারো শতকের শেষ বাঈজী। অসাধারণ রূপসী চন্দকে ঘিরে থাকতেন যেসব রাজপুরুষ তাঁদের সকলের দীর্ঘশ্বাস ও কামকাতর দৃষ্টি উপেক্ষা করে তিনি শুধু সংগীতকেই প্রেম দান করেছিলেন। ইংরেজ যুবাপুরুষেরাও তাঁর অনুরাগী ছিলেন। তার প্রমাণ, সেনাবাহিনী ব্যান্ডে তখন এমন একটি সুর বাজত যার নামকরণ হয়েছিল 'চন্দার ব্যান্ড'। লর্ড ওয়েলেসলির আদেশে এই সুর তোলা হয়েছিল।[৭০]

সাদাতের মৃত্যুর পর তার পুত্র গাজীউদ্দীন ১৮১৪ সনে সিংহাসন লাভ করেন। বাপের জমানো সমস্ত টাকা তিনি ব্যয় করেছিলেন ইমারত নির্মাণ ও নাচগানের পেছনে।মেহফিল বসত মজলিশ বাগে। শিল্পীদের প্রতি অদ্ভুত নির্দেশ ছিল গাজীউদ্দীনের—তাঁকে নাচ বা গানের মাধ্যমে কাঁদাতে না পারলে শিল্পীদের তিনি গোমতীর জলে ডুবিয়ে মারতেও দ্বিধা করতেন না।[৭১] তাঁর শাসনকালে দুজ্জু খাঁ ও গুলাম রসুল খাঁ কাওয়ালি ঢঙের গজল গেয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন। গাজীউদ্দীনের সময় থেকে আওধের শাসকের পদবি 'নবাব' কেটে

'বাদশাহ' হয়েছিল। ১৮২৭ সনে তাঁর পুত্র নাসিরউদ্দৌলা হায়দর বাদশাহি পেলেন। ইনি জ্যোতিষচর্চা করতে ভালোবাসতেন। আর আসক্ত ছিলেন নারীবিলাসে। এ তথ্য সর্বজনবিদিত যে তাঁর জীবনলীলা সাঙ্গ হয়েছিল এক প্রতিমাসদৃশ্য রূপসী বাঈজীর হাতে। সেই বাঈজীর নাম মেহেন্দি বাই। মেহেন্দির দেহ ছিল আশ্চর্যরকম ভাবে যৌব ও জৈবতায় স্পন্দ্যমান। লখনউয়ের কোঠায় তাঁর নাচ দেখে দর্শকরা এতদূর মোহিত হয়ে উঠতেন যে কেউ কেউ লাফিয়ে উঠে তাঁকে আলিঙ্গন না-করে পারতেন না। পীন, বর্তুল ও পরস্পর আশ্লিষ্ট স্তন, ক্ষীণ কটি, গভীর নাভি, বিশাল উরু ও জঘন—সংস্কৃত কাব্যে বর্ণিত নায়িকার যাবতীয় লক্ষণ এসে মিশেছিল মেহেন্দির মধ্যে।আরও আশ্চর্য ছিল তাঁর ঠুংরি ও গজলের গলা। একদিন রাত্রিবিহারের সময় তিনি বিষ দিয়ে হায়দরের জীবন হরণ করেন। মৃত্যুকালে হায়দর নিঃসন্তান ছিলেন। এর পর বাদশাহ হন মোহম্মদ আলি শাহ, ১৯৩৭ সনে, যখন তাঁর বয়স তেষট্টি।লখনউয়ের অঙ্গসজ্জায় ইনিও তৎপর হয়েছিলেন এবং বলা বাহুল্য, গানবাজনার পৃষ্ঠপোষকতাতেও।

'আরব্য উপন্যাস পড়তে পড়তে যে ছবিগুলি মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে, সেগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে লখনউ নগরীতে'—লিখেছেন সমীপকালীন এক বিদেশিনী, এমা রবার্টস। চার দিশায় অট্টালিকা, মহল, মসজিদ, ইমামবাড়া, গম্বুজ, মিনার তথা বাগবাগিচা আর ফোয়ারার ছড়াছড়ি। প্রজারা নিজেদের শহরের গর্বভরে নাম দিয়েছে, 'আখতার নগরী'। অর্থাৎ, স্বর্গীয় শহর। কেউ-বা বলছে 'হিন্দুস্তান কা বাবুল',—ভারতের ব্যাবলিন। হজরতগঞ্জ, আমিনাবাদ আর চকবাজারে হরদম দেশবিদেশের সওদাগরদের জমাত। চতুর্দিকে শের আর শায়রদের জলসা, বাঈজী নাচ, পতংবাজী, মুর্গা লড়াইয়ের হুজুম।

সত্যিই, লখনউ নগরীর একটা নিজস্ব ছাঁদ আছে। এক ঝলকেই আন্দাজ করা যায় এক-দেড়শো বছর আগে সেখানকার মানুষের মধ্যে আধুনিকসুলভ কেমন শিল্পবোধ ছিল। চওড়া রাস্তার দু-পাশে সোজা লাইন ধরে বাড়ির পর বাড়ির লম্বা সারি। কেউ কারো গায়ে গাদাগাদি করে নেই। একটা থেকে আর-একটা বেশ দূরে। অলঙ্কৃত, কিন্তু ঠুনকো নয়—খিলানগুলি পর্যন্ত ভারি মজবুত। নগরের মধ্যে কেউ এসে ঢুকলে তার গা ঢাকা দিয়ে থাকা শক্ত, সবারই নজরে পড়বে। এই রাস্তার ওপর দিয়ে ফিটনে চড়ে আসত বাঈজীদের দল, তাঁদের নতুন নতুন কুঁড়িদের নিয়ে। সঙ্গে আসত তবলচি, সারেঙ্গিয়া আর তানপুরা নিয়ে বুড়ো ওস্তাদ মিয়ারা। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ পেয়ে খিড়কি আর দরজা খুলে দাঁড়িয়ে পড়ত কৌতূহলী নাগরিকরা। দুই সারি বাড়ির মাঝখানের রাস্তা হেঁটে যেত ফিটনের সওয়ারি। লোকে হাঁ করে দেখত কার বাড়িতে ঢোকে জুড়িগাড়ি। খোঁজ নিত, এই বাঈটাকে নতুন দেখছি, কোত্থেকে এলো—বেনারস না হায়দরাবাদ?

আমজাদ আলি শাহর জমানা তখন। শুধু রাজনর্তকী আর বাঈজীই কেন, বারবনিতাদেরও মর্যাদা অঢেল। তিন ধাঁচের বারবণিতা ছিল লখনউয়ে। খ্যাতিমান রূপোপজীবিনীদের বলা হতো কাঞ্চনী। দ্বিতীয় চুনেওয়ালি, তৃতীয় নাগরনি।

আমজাদ আলির জমানারই এক প্রখ্যাত বাঈজী বা তওয়াইফের কথা এখানে বলব। নাম উমরাও জান। লখনউয়ের রাজনর্তকী উমরাওয়ের জন্ম ফৈজাবাদের এক অতি সাধারণ পরিবারে। পিতৃদত্ত নাম ছিল আমিরন। ভাগ্যের ফেরে মাত্র এক থলি মোহরের বিনিময়ে বিক্রি হয়ে কিশোরী আমিরন চলে এসেছিলেন খানুম সাহেবের কোঠিতে, গণিকালয়ে। সেখানে নাচেগানে-পড়াশোনায় চৌকস হয়ে ওঠেন। উঠতি যৌবনে প্রেমে পড়েন নবাব সুলতানের। কিন্তু খানুম সাহেবের কোঠার কঠোর বিধিনিষেধ ডিঙিয়ে সে প্রেম জয়ী হতে পারেনি। শেষে ফৈয়জ আলি নামের এক ডাকাতের সঙ্গে তিনি পালিয়ে যান। এক গভীর অরণ্যে ফৈয়জ নিহত হয়। অসহায় উমরাওকে আবার লখনউয়ের নবাব দরবারে 'ভেঁট' বা উপহার হিশেবে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে এই 'তওয়াইফে'র যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনের বেড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। উমরাও জান অদার কবর রয়েছে বারাণসীর সিগরা গোরস্থানে। এই মর্মন্তুদ জীবনকাহিনী নিয়ে ১৯৮১ সালে তৈরি হয় 'উমরাও জান অদা'—এক উল্লেখযোগ্য ফিচার ফিল্ম। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত মির্জা হাদি রুসওয়ারের

(১৮৫৭-১৯৩১) উপন্যাস অবলম্বনে উত্তর প্রদেশেরই এক তরুণ ও কমিটেড পরিচালক মুজফফর আলি ছবিটি তৈরি করেছিলেন। উমরাও জানের লীড চরিত্রটি অসামান্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন রেখা। রেখা, ফারুক শেখ, নাসিরুদ্দিন শাহ, রাজ বব্বর, শওকত কাইফির অভিনয়ধন্য সেই ছবি, খৈয়ামের সুর আর আশা ভোঁসলের অবিস্মরণীয় কণ্ঠ যাকে অমরত্ব দিয়েছে। উমরাও জানকে ঘিরে সেই সময়কার লখনউ নবাব-ঘরানার অবক্ষয়ের একটা স্বচ্ছ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন পরিচালক মুজফফর। তিনি বলেছিলেন, 'উনিশ শতকের সেই মূল্যবোধ ও জীবনের সার্বিক ধ্বংসের চেহারাটা চোখের সামনে থাকলে অন্য মাত্র পাবে ছবিটা। ইংরেজরাজ ধীরে ধীরে থাবা ফেলছে ভারতের শাসননীতিতে, আর অলস ফুর্তিবাজ বাদশাহ-জমিদার-জায়গিরদার-আমিরের দল নিরুৎকণ্ঠায় ভেসে চলেছেন। এ-ছবি সেই ছবি।' এর পরেও, ২০০৬ সনে একই কাহিনী নিয়ে আর একটি ছবি তৈরি হয় জে পি দত্তর নির্দেশনায়, তাতে উমরাও চরিত্রে ছিলেন ঐশ্বর্যা রায় বচ্চন।

এই সময় লখনউয়ের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মহম্মদ আলি যখন নিজের লখনউকে হিন্দুস্তানের ব্যাবিলন বানানোর জন্য শূন্যোদ্যানের নকশা মোতাবিক বর্তমান ঘণ্টা ঘরের পাশে মেহরাব বা খিলানের একের পর এক বৃত্ত গেঁথে বিশাল সাততলা প্রাসাদ গড়ে তুলছেন, সেই রাজকীয় যজ্ঞ পণ্ড করতে তেড়ে এল হাজার হাজার ইংরেজ সেপাই। ইংরেজ ও পারসিক স্থাপত্যরীতির মিশেলে এক নতুন অট্টালিকা তৈরি হল বাদশাহের নতুন ইমামবাড়া চৌহদ্দিতে।[৭২] মহম্মদ আলির এই পরাজয় লখনউয়ের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা—সে অন্য গল্প। বরং বলা যাক চামেলি বাইয়ের কথা—যিনি ছিলেন একাধারে গজল গায়িকা ও মহম্মদের নর্মসহচরী। দূর দেশ থেকে লোক আসত তাঁর গান শুনতে। মহম্মদের পুত্র আমজাদ আলি শাহের জমানায় চামেলি ছিল খ্যাতির সিংহাসনে। অবশ্যি আমজাদের শাসনকালে বিন্দয়া জান, সুমন বাই এবং রাহেলা বানোও অসামান্য যশ লাভ করেছিলেন।

অওধ বা লখনউয়ের নবাবী ইতিহাসের সূচনা বুরহান-উল-মুল্ক থেকে এবং নবাব ওয়াজিদ আলি শাহতে (১৮২২-১৮৭৩) এসে তার পরিসমাপ্তি। ইংরেজদের ভণ্ডামি, শঠতা আর চাতুরী দেখে যেমন রীঢ়ামিশ্রিত বিবমিষা জাগে, সেসময়কার দেশীয় রাজা আর নবাবদের দেখে তেমনি জাগে ক্ষোভসংপৃক্ত করুণা। অলস, অকর্মণ্য, আর নিজেদের শখ-আহ্লাদ বিলাসিতা ও লাম্পট্য বজায় রাখতে ফিরিঙ্গি প্রভুদের চরণে চড়া হারে জরিমানা আর উপঢৌকন দিতে দিতে আখেরে গোটা রাজ্যখানাই তাঁরা ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

আমজাদের পর অওধের একাদশতম নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ যখন তখতে বসেন, ১৮৪৮ সনে, তখনই শোনা গিয়েছিল লখনউ দরবারের বিসর্জনের বাজনা।শোহরত হয়েছিল ব্রিটিশের বিজয়ডঙ্কা। ওয়াজিদ আলির দেশকালের একটি নিখুঁত রেখাচিত্র মেলে প্রেমচন্দের ‘শতরঞ্জ কে খিলাড়ি’ গল্পে—‘লখনউ বিলাসিতার সমুদ্রে ডুবে ছিল। ছোটো-বড়ো, ধনী-দরিদ্র সবাই বিলাসিতায় মগ্ন ছিল। কেউ নাচ-গানের আসর বসাত, কেউ বা আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকত। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছিল আমোদ-প্রমোদের প্রাধান্য।শাসনকার্যে, সাহিত্যে, সামাজিকতায়, কলাকৌশলে, শিল্প-উদ্যোগে, আচার-অনুষ্ঠানে সর্বত্র বিলাসিতা পরিব্যাপ্ত ছিল।’

ছবিটা একেবারে নিখুঁত। ওয়াজিদ আলি শাহ নাচগান আর বাঈজীদের নিয়ে এমনই মশগুল ছিলেন যে ফিরিঙ্গি রেজিমেন্টের ষড়যন্ত্রের কণামাত্র টের পাননি। সিপাহী বিদ্রোহের অজুহাতে ইংরেজরা নবাবকে নজরবন্দী করে রাখলেন ফোর্ট উইলিয়ামের আর্মহার্স্ট কুঠিতে। 'লক্ষ্ণৌর বাদশা কয়েদ থেকে খালাস হয়ে মুচিখোলায় আসায় শহর বড় গুলজার হয়ে উঠলো।'—লিখছেন হুতোম। আর ওয়াজিদ আলির শখ-আহ্লাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে 'কমলাকান্তে' লিখছেন : 'ওয়াজিদালিশাহা লক্ষ্ণৌ নগরী হইতে স্বচ্ছন্দে চতুর্দ্দোলারোহণে মুচিখোলায় আগমন করিয়া, স্বয়ানুরূপ পিঞ্জরস্থ বুলবুলিকে সঘৃত পলান্ন প্রদান করেন।'

নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ স্বয়ং ছিলেন শখ-আহ্লাদ আর অসঙ্গতির পরাকাষ্ঠা। ওয়াজিদের জীবনের তিনটি স্তম্ভ—নবাবী ঠাটবাট, সংগীত ও শিল্পপ্রেম এবং তাঁর অগণিত প্রেমের দাস্তান। তিনটিকে একে-অপর থেকে

পৃথক করা অসম্ভব।সহবাস-ব্যাপারে তাঁর বাছবিচার কিছুই ছিল না। নিজের অগণিত প্রেম ও যৌবনের নানান অসঙ্গতির কাহিনী মসিলিপ্ত করে 'ইশকনামা' গ্রন্থের মাধ্যমে দেশময় ছড়িয়ে দিয়েছেন। রেণ্ডী, দাসী, বাঈজী—বিভিন্ন নিচু স্তরের নারীর সঙ্গেও তাঁর দেহালাপ চলত।[৭২] শুধু বাদশাহ কেন, তাঁর আমলে গোটা লখনউ হয়ে উঠেছিল মণ্ডী বা বাজারের মতো। এই আমলেই বাইজিদের ওপর আর্থনীতিক ও সামাজিক নিপীড়ন শুরু হয়েছিল। নাচ-গান ছেড়ে অনেক বাইজিকে ভিন্ন জীবিকা ধরতে হয়েছিল। আবার অনেককে সামাজিক স্বীকৃতির অভাবে এই পঙ্কতিলককেই নিজের ভবিতব্য বলে মেনে নিতে হয়েছিল।

অগণিত প্রেমের দাস্তান। নবাব খোদ লিখছেন তাঁর প্রথম শরীরী আস্বাদ গ্রহণ ঘটে আট বছর বয়সে। তাঁকে এই ঘাটের প্রথম জল খাওয়ান তাঁর মায়ের এক প্রৌঢ়া পরিচারিকা যাঁর ওপর ছিল বালক ওয়াজিদের সেবাযত্নের দায়িত্ব, নাম রহীমন। ওয়াজিদ সোজাসুজি জানাচ্ছেন—এগারো থেকে তিনি নিজে উড়তে শেখেন। পরিচারিকা, দাসী, বাবার বাঁদি, বাঈজী, রেণ্ডী—কোনো বাছবিচার ছিল না। তাঁদের নামের সূচি এমন বিস্তর, গল্প ফুরোবার নয়। অধুনা লখনউয়ের যে বিল্ডিংটি ভারতখণ্ডে সংগীত বিশ্ববিদ্যালয় নামে চিহ্নিত, নবাব ওয়াজিদ আলি শাহর জমানায় সেটি ছিল তাঁর 'পরীখানা'। এই ভব্য অট্টালিকায় তাঁর পরীরা বাস করতেন। পরী, অর্থাৎ নবাবের বাছাই-করা সুন্দরী বাঁদিরা। তাঁদের মধ্যে কেউ দৈবাৎ গর্ভবতী বা শিশুর জনয়ত্রী হয়ে পড়লে, তাঁকে বলা হতো 'মহল'। বেগম হজরত মহল এভাবেই বাঁদি থেকে মহল অবধি যাত্রাটি সম্পন্ন করেছিলেন। আবার যেসব রমণী ছিলেন নবাবের অত্যন্ত প্রিয়, তাঁদেরকে বলা হতো খাসমহল, অর্থাফ স্পেশাল ওয়াইফ। নবাব ওয়াজিদ আলি প্রায় তিনশোটি বিবাহ করেন এবং তালাকও দেন গুচ্ছ-গুচ্ছ। এর মধ্যে কতিপয় ছিল নিকাহ, আর ১১২ জনের সঙ্গে মুতাহ। মুতাহ, অর্থাৎ স্বল্পমেয়াদি শাদি। অবশ্য নিকাহ বা মুতাহ, কোনোটিরই মেয়াদ নির্দিষ্ট ছিল না। 'লাস্ট জেনারেশন' গ্রন্থের লেখিকা নিধি দুগ্গর জানাচ্ছেন, শাহর সবচেয়ে প্রিয় বেগম সরফরাজ মহল একজন হিন্দু কিশোরী ছিলেন। দশ বছর বয়সে নবাবের সঙ্গে নিকাহ সম্পন্ন হলে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তার পরপরই নবাব তাঁকে তালাক দিয়ে দেন। অন্যদিকে নবাবের প্রথম মুতাহ-করা বিবি মাশুক মহলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক টিকেছিল তিরিশ বছর। নারী-ব্যাপারে সচরাচর পুরুষেরা শ্বেতাঙ্গিনীদেরই প্রাধান্য দিয়ে থাকে, কিন্তু নবাব ওয়াজিদ আলির পছন্দ ছিল গাঢ়বর্ণ ত্বকের নারী। এ-ব্যতিরেকে, বিশাল স্তনের প্রতি তাঁর ছিল অপরিমেয় আকর্ষণ। তিনি আরব বণিকদের আফ্রিকান দাসীদেরও বিয়ে করে নিজস্ব পরীখানায় তুলেছিলেন। তেমনি এক আফ্রিকান বিবির নাম ছিল অজায়ব খাতুন।

ওয়াজিদ আলি ১৮৪৭ থেকে ১৮৫৬, মোট ন'বছর নবাব পদে আসীন ছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি একটি দুর্বল মসনন লাভ করেছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তী নবাবেরা ইংরেজদের সঙ্গে টক্কর নিয়ে বারম্বার মুখ থুবড়ে পড়তেন এবং খেসারত স্বরূপ দরবার থেকে মোটা জরিমানা অর্পণ করতে হতো ইংরেজ প্রভুর পদতলে। ওয়াজিদ আলি শাহর অবশ্য ন্যায় তথা সৈন্যব্যবস্থার প্রতি বেশ কড়া নজর ছিল। তাই ফি দুপুরে লখনউয়ের ময়দানে পলটনের প্যারেড করিয়ে সেলামি উসুল করতেন। তবে, একজন কুশল শাসক হবার সবরকম গুণ তথা বৈশিষ্ট্য থাকা সত্বেও বিলাসিতা এবং কলাপ্রেম তথা রাজপাটের প্রতি অত্যধিক ঔদাসীন্যের কারণে শাসন-ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ সিদ্ধ হয়েছেন।

কিন্তু ব্যসন বা বিলাসিতাই নবাবের একমাত্র টাইমপাস ছিল না। তিনি ছিলেন পারসিক বংশজ। উদার ও দয়ালু নবাব শুধু নন, তিনি ছিলেন আদ্যন্ত শিল্পী। কবি, ঠুমরি ও গজল লিখিয়ে, গায়ক, সুরকার, নাট্যকার, কত্থক নাচিয়ে, সাহিত্যিকও। রেখতা, শের-শায়রি, গজল, ঠুমরি, নাটক, আত্মজীবনীর পাশাপাশি নাচ, গান, পশুপাখি, সুগন্ধী, এমনি আরও নানান বিষয় নিয়ে তিনি লিখেছেন শতাধিক গ্রন্থ। তিনি তাঁর দরবারে একদিকে যেমন বেশ কিছু লেখক ও কবিকে সংরক্ষণ প্রদান করেছিলেন, তেমনি বহু নর্তকী, বাঈজী ও তবলচি তথা গাইয়েকেও রোজগার প্রদান করেছেন। কিংবদন্তী শাস্ত্রীয় নর্তক পণ্ডিত বিরজু মহারাজের পূর্বপুরুষদের, দুর্গাপ্রসাদ ও ঠাকুরপ্রসাদকে ঠাঁই দিয়েছিলেন নিজের দরবারে; তাঁদের কাছ থেকে তালিম

নিয়েছিলেন শাস্ত্রীয় নৃত্যের। ওয়াজিদ আলি শাহকে বলা হয়েছে 'ঠুমরির জনক'। বাংলায়ও ঠুমরি গীতধারার প্রবর্তক তিনিই। তাঁর জমানায় ঠুমরি গাওয়া হতো কত্থক নৃত্যের অনুষঙ্গ হিশেবে। বেশ কিছু উঁচু দরের ঠুমরির স্রষ্টাও ছিলেন এই বাদশা। তাঁর জমানায় লখনউয়ের সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রায় হিন্দু-মুসলিমের পুরাণ, উপকথা, লোকগাথার বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। নবাব ওয়াজিদ আলি শাহই হিন্দুস্তানি থিয়েটারের প্রবর্তক। তিনি যে 'রাধা কানহাইয়া কা কিসসা' মঞ্চস্থ করেন, সেটিই ছিল উর্দুর প্রথম নাটক। কৃষ্ণ ছিলেন নবাবের রোল মডেল। যমুনাতটে পূর্ণিমা রাতে গোপিনীদের সঙ্গে কৃষ্ণের লীলা নবাবের চিরকাল অবশেসন ছিল। কৃষ্ণের এই রাসলীলা থেকেই লখনউয়ে 'রহস'-এর সৃষ্টি। ওয়াজিদ আলির রহস বস্তুত অপেরা, যেখানে তিনি ব্রজভূমে কৃষ্ণের জীবন নিয়ে প্রচলিত নৃত্যের সঙ্গে কত্থকের কমপোজিশন মিলিয়েছিলেন।

আসলে নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ আক্ষরিক অর্থেই ছিলেন শিল্পপাগল। দরবারে ঢুকে কারুক্কে দেখতে না পেলে চেল্লামিল্লি শুরু করে দিতেন। আমি যে অন্ধ হয়ে যাচ্ছি! তিনি সবচেয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠতেন রমণীসঙ্গের জন্য। ব্যাকুল নাচগানের জন্য। কোথায় গাইয়েরা, তবলচি, সারেঙ্গিবাদক কোথায় গেল? কোথায় তাম্বুরা? কোথায় সুরশৃঙ্গার? কোথায় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা সুন্দরী বাঈজীরা? কজন টপ্পা গাইয়েকে হাজির কর চট করে, কিছু খেয়াল গাইয়েকে ডাকো। গজল আর ঠুমরি গায়করাও আসুক। হে আল্লাহ, সারা জীবন যেন নাচগানের পরিবেশ পাই! বাঈজী আর গাইয়েদের নিয়েই যেন কাটিয়ে দিতে পারি সারাটা জীবন!

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিনা প্রতিরোধে অওধকে নিজের সাম্রাজ্যে তাংড়ে নিল আর সদ্য-রাজ্যহারা নবাব ওয়াজিদ আলি কী করলেন? তিনি কোম্পানির বারো লক্ষ টাকা বাৎসরিক পেনশন নিয়ে লখনউ নগরীতেই নিজের পরীখানায় স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতে পারতেন গুচ্ছ-গুচ্ছ সুন্দরী রমণী, নাচগান, পাখপাখি আর অন্যবিধ শখ-আহ্লাদ নিয়ে। কিন্তু তা না করে ছুটলেন অজানা শহরের উপান্তে হুগলী নদীপাড়ে পড়ে থাকা ততোধিক বেগানা এক পরিত্যক্ত বস্তি, মেটিয়াবুরুজে। তাঁর প্রিয় প্রজাদের চিরতরে আলবিদা জানাবার প্রাক্কালেও তাঁর চোখে অশ্রু আর অধরে তাঁরই লেখা সেই বিখ্যাত ঠুমরিটি—

'বাবুল মোরা নৈহর ছুটো জায়'

মনে আদ্র, কিন্তু কলম সান্দ্র—নিজের মা, যুবরাজ, খাস-বেগম ও সৎ বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে ১৮৫৬ সালে মেটিয়াবুরুজ রওনা হয়ে গেলেন। এইভাবে ভারতবর্ষের শেষ দরবারের পতন ঘটল—

‘পরীনহুফতা রুখাঁ-ও-দেও দরকরিশমা-ও-নাজ
বসৌখত অকলজ হ্যয়রৎ কি ইচে বুলাজবীস্ত।’

'পরীনহুফতা রুখাঁ-ও-দেও দরকরিশমা-ও-নাজ
বসৌখত অকলজ হ্যয়রৎ কি ইচে বুলাজবীস্ত।'

সাশ্রুনেত্রে লখনউবাসী বিদায় জানালেন তাঁদের শেষ নবাবকে। অতঃপর শুরু হয় তাঁর বিদায়ী শোভাযাত্রা। মা বেগম আউলিয়া, যুবরাজ কমর কদ্র, খাসমহল সহ আরও কতিপয় বেগম, আত্মীয়-পরিজন তথা শ-পাঁচেক লোকলশকর নিয়ে ১৮৫৬ সনে অজানা শহর কলকাতার গার্ডেন রিজ নামের ততোধিক বেগানা এক বস্তির উদ্দেশে রওনা দিলেন। প্রথম রাতে পৌঁছলেন উত্তর প্রদেশের উন্নাও। গঙ্গাতীরভূমে নামাজ পড়লেন নবাব। পরদিন সেতু পেরিয়ে পৌঁছলেন কানপুর, সুহৃদ মিস্টার ব্রাডনের বাংলোয়। ক'দিন পরে কানপুর থেকে জলপথে এলাহাবাদ। সেখানে জনগণ আর পড়শি রাজ্যের অধীশ্বরদের সখেদ অভ্যর্থনা হাসিল করে ক'দিন কাটিয়ে এলেন বারাণসীতে। আরও ক'দিন কেটে গেল কাশীনরেশ ঈশ্বরীপ্রসাদ নারায়ণ সিংয়ের রাজকীয় আতিথ্যে এবং ভব্য সমারোহে। তারপর আবার যাত্রা শুরু। তাঁর মা, তাঁর প্রধানা বেগম ও দুই যুবরাজকে সঙ্গে নিয়ে নবাব বেনারস থেকে জলপথের কলকাতার উদ্দেশে পাড়ি জমালেন ম্যাকলয়েড কোম্পানির এক স্টিমারে। অন্যান্য সহযাত্রীরা রওনা দেন বিশাল বিশাল বজরায়, এবং কয়েকজনের একটি দল যাত্রা করেন সড়কপথে। গাড়িঘোড়া, বজরা, স্টিমার—সে এক বিচিত্র ও ভব্য শোভাযাত্রা।

বিশদিন বদে, ৬ মে ১৮৫৬ সন্ধ্যায় রমজানের চাঁদ দেখা দিলে নবাবের স্টিমার এসে ভিড়ল কলকাতার বাবুঘাটে। অনুগত উজির-নাজির আমির ওমরাহ ছাড়াও নবাবের সঙ্গে ছিলেন মা মালকা-ই-কিসবর (বেগম আউলিয়া), ভাই সিকন্দর হসমত, যুবরাজ কমর কদ্র, খাসমহল সহ পাঁচ-ছজন বেগম এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও শ্বশুর আলি নকী খান। অন্যান্য বেগমরা থেকে গিয়েছেন লখনউতেই। কথিত আছে, প্রাথমিক পর্যায়ে নবাব সদলবলে আস্তানা গেড়েছিলেন বেলগাছিয়ায়। সেখান থেকে মেটিয়াবুরুজে বর্ধমান রাজার একটি বাগানবাড়িতে। 'গুজস্তা লখনউ'-এর লেখক আবদুল হলিম 'শরর' জানাচ্ছেন, মেটিয়াবুরুজে হুগলী নদীর ধারে দু-আড়াই মাইল জুড়ে বেশ কয়েকখানা বাড়ি ছিল। গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া ঐ বাড়িগুলি নবাবকে প্রদান করলেন। দুটি বাড়ি খাস নবাবের জন্য, একটি তাঁর খাসমহলের আর একটি আলি নকী খাঁর থাকবার জন্য।[৭৪]

মেটিয়াবুরুজের ইতিবৃত্ত কলকাতা থেকেও পুরনো। মূল কলকাতা থেকে তিন-চার মাইল দূরে দক্ষিণে ভাগীরথী কিনারে জায়গাটার আসন নাম ছিল গার্ডেনরিচ। নদীর দুই তীরে দুটি কেল্লা ছিল মাটির। নাম ছিল 'আলিগড় কেল্লা' আর 'থানা'। একটি রাজা প্রতাপাদিত্যের অন্যটি ডাচদের হাতে তৈরি। বৃটিশ আমলে লর্ড ক্লাইভ কেল্লা দুটির দখল নিয়েছিলেন। অবশ্য, কলকাতা পত্তনের পর কেল্লা দুটি ধ্বংস হয়ে গেছিল এবং পড়ে ছিল মাটির দুটি বিশাল টিপি বা বুরুজ। আসলে মাটিয়া বুর্জ, অর্থাৎ মাটির কেল্লা, থেকে পরবর্তী কালে এই মেটিয়াবুরুজ। ফিরিঙ্গিদের অনুকম্পায় হাসিল বারো লক্ষ টাকা বাৎসরিক পেনশনের ওপর নির্ভর করে রাজ্যহারা নবাব কলকাতা শহরের উপান্তে এই পরিত্যক্ত মেটিয়াবুরুজেই পাতলেন তাঁর ওস্তাগর সাম্রাজ্য এবং গড়ে তুললেন তাঁর সাধের লখনউ নগরীর দ্বিতীয় সংস্করণ। মনের ভিতর তখনও ধিকিধিকি আশ হয়ত ছিল, একদিন ফিরে পাওয়া যাবে হারানো অওধ।—

'দর-ও-দিওয়ার পর হসরত সে নজর করতে হ্যঁায়
খুশ রহো অহলে-বতন হম তো সফর করতে হ্যঁায়'

সেই সফর আর শেষ হয়নি। শেষমেস এই কলকাতা শহরের প্রান্তশায়ী মেটিয়াবুরুজেই কাটিয়ে দেন জীবনের বাকি তিরিশটা বছর।[৭৫]

কোথায় কাশ্মিরী উল আর কোথায় বগলের চুল! কোথায় কেতাদুরস্ত শাহী শহর লখনউ, আর কোথায় ধ্যাদধেড়ে মেটিয়াবুরুজ! কিন্তু অভাবিত হলেও, নবারের হাতে পড়ে যথেষ্ট ত্বরিত গতিতে এই মেটিয়াবুরুজই হয়ে উঠল ছোটো লখনউ। নবাব ওয়াজিদ আলি শাহর একার উদ্যোগেই অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মেটিয়াবুরুজ হয়ে উঠেছিল এক অসামান্য নগরী। একদম লখনউ আদলে তৈরি হয়েছিল প্রশস্ত রাস্তাঘাট। সেই রাস্তার দু-পাশ রাতের বেলা সেজে উঠত গ্যাসের আলোয়। ছিল নিজস্ব বাজার, বাগবাগিচা, দুর্গ, মিনার, মসজিদ, ইমামবাড়া। এমনকি চিড়িয়াখানাও। এশিয়াটিক সোসাইটির কুইরেটর ব্লিথের মাধ্যমে সেই চিড়িয়াখানার জন্তুজানোয়ারদের খোঁজ নিতেন নাকি খোদ চার্লস ডারউইন। মেটিয়াবুরুজে গড়ে উঠেছিল নবাবী ছাপাখানা—'মতরা-ই-সুলতানি'। ওয়াজিদ আলি ছিলেন ধর্মভীরু শিয়া মুসলমান। তিনি সেখা গড়ে তুলেছিলেন একের পর এক মসজিদ আর 'মাদ্রাসা সুলতান-এ-অওধ'। সেখানে নিছক ইসলামের শিক্ষাই দেওয়া হতো না, শেখানো হতো প্রতীচ্যের বিজ্ঞানও। ঘোড়সওয়ারি আর দেহগঠনের কসরতের পাশাপাশি চলত ক্যালিগ্রাফির তালিম। বাড়িতে বাড়িতে বড় বড় হাঁড়ায় তৈরি হতো খাস লখনউই শাহী বিরিয়ানি। বিভিন্ন রকমের রান্নার শখ ছিল ওয়াজিদ আলির। 'দমপোখত' বা ঢিমে আঁচে রান্না, বিশেষত বিরিয়ানি, তিনিই নিয়ে আসেন কলকাতায়। বিরিয়ানিতে আলুর প্রচলন তাঁরই হাতে। ওয়াজিদ আলির ঘুড়ি ওড়ানোর শখ ছিল। ঘুড়ির সুতো অবধি বয়ে এনেছিলেন গার্ডেনরিচে, যা দিয়ে পরে সেখানে শুরু হয় নতুন কেতার পোশাক তৈরির ব্যবসা। কলকাতার এমনি আরও অনেক ঐতিহ্যের সূচনাই ওয়াজিদ আলি শাহর হাত ধরে। চরম বিপর্যয়ের মধ্যেও জীবনের রসে তালভঙ্গ হতে দেননি নবাব। ওয়াজিদ আলির জীবনচর্যার উদ্ধারও তাই

কোনও অস্তমিত রাজমহিমার কাশিদা বা গুণকীর্তন নয়, বাঙালির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের শিকড়সন্ধানও। নিছক স্বপ্নবিলাস নয়, এক ভিন্নতর জাগরণ।

কলকাতার সংস্কৃতি সমৃদ্ধতর হওয়ার মূলে নবাব ওয়াজিদ আহি শাহর অবদান অবিসংবাদিত। এখানে বসে তিনি শায়রি, গজল, মসনবি, নজম, মারসিয়ার বন্যা বইয়ে দেন। তাঁর দেখাদেখি তাঁর ছেলেও শায়রি শুরু করে। পথেঘাটে গুলতানি মারা ছোঁড়া-ছোকরাদের মুখেও শের-শায়রি, ছ্যাকড়াগাড়ির সহিসও মুসাফিরকে শোনাচ্ছেন মৌসিকী-এ-নজম। অবিকল সেই লখনভী মাহোল। এছাড়া সমস্ত মেটিয়াবুরুজে সেদিন শায়রি, গজল, নজম আর কাওয়ালির বাতাবরন। আর ওয়াজিদের ঠুমরির তো জবাবই নেই। নবাব ওয়াজিদ আলিই কলকাতায় ঠুমরির ভগীরথ এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁর অন্যতম সুহৃদ সংগীতবেত্তা রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৪০-১৯১৪) পাথুরিয়াঘাটা থেকে মেটিয়াবুরুজে আসতেন ওয়াজিদের লখনউই ঠুমরির টানে। আরও দুই সুহৃদ যদুভট্ট ওরফে যদুনাথ ভট্টাচার্য (১৮৪০-১৮৮৩) এবং অঘোরনাথ চক্রবর্তী (১৮৫২-১৯১৫) নবাবের দরবারি ঠুমরির রীতিমতো ফ্যান ছিলেন। ওয়াজিদের দাক্ষিণ্যে মেটিয়াবুরুজ হয়ে উঠেছিল ধ্রুপদী কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। মেটিয়াবুরুজ থেকে লখনউয়ের ঠুমরি ছড়িয়ে পড়ে কলকাতার বুকে। ওয়াজিদ আলি বিখ্যাত সেতারি কুতুব আলি খানের কাছে সেতার শিখেছিলেন। সেনি ঘরানার উস্তাদ বসত খান মেটিয়াবুরুজে রবাব নিয়ে আসেন। সুরশৃঙ্গারও তাঁরই আনা, ওয়াজিদ আলি এই যন্ত্রটিকে জনপ্রিয় করেন। ছিলেন বিখ্যাত বিনকার ও রবাবিয়া কাসিম আলি খান। ওয়াজিদের আমন্ত্রণে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দরবারে সুরবাহার বাজিয়ে যান। এই দরবারেই নাকি উস্তাদ নিয়ামতুল্লা খান আধুনিক সরোদ সৃষ্টি করেন। ওয়াজিদ তবলাকেও জনপ্রিয় করেন কলকাতায়। সানাই, এসরাজে জড়িয়ে ছিল তাঁর নাড়ির টান।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ভাগীরথী তটে বইতে শুরু করল গোমতী তীরের সুরভিত গন্ধবাহ।অবশ্য, 'মেটিয়াবুরুজে যেন লক্ষ্ণৌয়ের সূর্যাস্তের আভা।' আসলে মেটিয়াবুরুজের চার দেওয়ালে ঘেরা জগৎ ছিল বাইরের দুনিয়া থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন। ওয়াজিদ আলি শাহ যতদিন বেঁচে ছিলেন (মৃত্যু ১৮৮৭) এখানে টিকে ছিল মুঘল দরবারি সংস্কৃতির পড়ন্ত ছায়া। যে ছায়া খোদ এই সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র দিল্লি থেকে বিদায় নিয়েছিল বাহাদুর শাহ জাফরের জমানা শেষ হবার অনেক আগেই।[৭৬]

নবাবী আমল ফুরিয়ে যাওয়ার পরও লখনউয়ের সাংস্কৃতিক স্বাস্থ্য অটুট থেকেছে। ওয়াজিদ আলি বিদায় নেবার পর তাঁর অন্যতম বেগম, বীরাঙ্গনা হজরত মহল নবাবের তখতে বসালেন ছেলে মির্জা বিজরিস কদ্র বাহাদুরকে এবং ইংরেজদের চরমশত্রু বাগী সিপাহীদের হেফাজতে বিজরিসের নবাবী খানিককাল চললও বটে, কিন্তু লখনউ ছেড়ে ভাগলেন যখন, শেষমেস নেপালের সরহদে পৌঁছেই হাঁফ ছেড়েছিলেন। তবে লখনউয়ের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এত তাড়াতাড়ি চিড় ধরেনি। লখনউয়ে তখন ইংরেজদের সেই বাগী ফৌজ ছাড়াও স্থানীয় জমিদার ও তালুকদারদের রমরমা শুরু হয়ে গেছে। বৃটিশ ও পারসিক স্থাপত্য রীতির মিশ্রনে গড়ে উঠল নতুন নতুন ইমারৎ। চতুর্দিকে কবুতরবাজি, ঘুড়িবাজি, আফিম-চরস, ব্যভিচার আর বিলাস-ব্যসনের ছররা। এমনকি বৃটিশ অফিসাররাও পাইক বরকন্দাজ, বাবুর্চি খানসামা, হুকুমবরদার এইসব লোকলশকরদের নিয়ে এক-একজন খুদে নবাব ব'নে বসল। ফলে লখনউয়ের সংস্কৃতিতে ঘটল আর-এক নয়াল মিশ্রসংস্কৃতির মিশেল।

ইংরেজ শাসন কায়েম হতে বাঈজীরা হারালেন রাজনর্তকীর সম্মান। উদ্ভব হলো এক নতুন ধনিক শ্রেণীর, যারা মনে করত টাকা দিয়ে বাঈজী কেনা যায়। এই ধনী, অশিক্ষিত জমিদার আর বণিকরাই হয়ে উঠল বাঈজী আর গজল-ঠুমরি সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

লখনউ নগরীর একটি নিজস্ব ছাঁদ আছে। এক ঝলকেই আন্দাজ করা যায় একশো বছর আগে সেখানকার মানুষের মধ্যে আধুনিকসুলভ কেমন শিল্পবোধ ছিল। চওড়া রাস্তার দু'পাশে সোজা লাইন ধরে বাড়ির লম্বা

সারি। কেউ কারও গায়ে গাদাগাদি করে নেই। একটা থেকে আর একটা বেশ দূরে। অলংকৃত, কিন্তু ঠুনকো নয়—খিলানগুলি পর্যন্ত ভারি মজবুত। নগরের মধ্যে কেউ এসে ঢুকলে তার গা ঢাকা দিয়ে থাকা শক্ত, সবারই নজরে আসবে।এই রাস্তার ওপর দিয়ে ফিটনে চড়ে আসত বাইজিদের দল, তাঁদের নতুন নতুন কুঁড়িদের দল। সঙ্গে আসত তবলচি, সারেঙ্গিয়া আর তানপুরা নিয়ে বুড়ো ওস্তাদ মিয়ারা।ঘোড়ার খুরের শব্দ পেয়ে খিড়কি আর দরজা খুলে দাঁড়িয়ে পড়ত কৌতূহলী নাগরিকেরা। দুই সারি বাড়ির মাঝখানের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতো ফিটনের সওয়ারি।লোকেরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখত কার বাড়িতে ঢোকে জুড়িগাড়ি।খোঁজ নিত, এই বাইটাকে নতুন দেখছি, কোত্থেকে এসেছে—বেনারস না হায়দরাবাদ?

উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে বাইজি আর গজলের ওপর থেকে লখনউয়ের একাধিপত্য নষ্ট হতে থাকে। বাঈজীরা ছড়িয়ে পড়েন দিল্লি, আগ্রা, জয়পুর, লখনউ, হায়দরাবাদ, বেনারস, বম্বে, পুনে, মহীশূর, এলাহাবাদ, জয়পুর, বিকানীর, মুজফফরপুর, ছাপরা, যোধপুর, আজমগঞ্জ, লাহোর, ইসলামাবাদ, করাচি—অবিভক্ত ভারতবর্ষের নানান জায়গায়। ফলত গজলের প্রসারও ঘটেছিল তেমনি ব্যাপকভাবে। ওই সময়কার বেনারসের সরস্বতী বাঈয়ের গান শুনে আমাদের অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুগ্ধ হয়েছিলেন। সরস্বতী বাঈ শীতের সময় কলকাতায় আসতেন। বিদ্যাধরী ছিলেন বেনারসের আর শ্যামলতা এলাহাবাদের নামকরা বাঈজী। বেনারসেরই শিউকুঙর বাঈ গজল গেয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন। জয়পুরের চুম্মনবাঈ, আগ্রার রুমানী জান ও মালকাজান, বেনারসের জদ্দন বাঈ, বম্বের বিন্দুদেবী, ছাপরার রামকলী প্রমুখ কয়েকজন সফল বাঈজীর নাম এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য—অবশ্যি এঁদের গজল তেমন সুখ্যাতি পায়নি।

এখানে বলি সে-যুগের দুর্দান্ত সুন্দরী নৃত্যপটীয়সী এক গন্ধর্বকন্যার কাহিনি। নাম তাঁর গওহরজান। তৎকালীন হিন্দুস্তানে বিপুল খ্যাতি অর্জনকারিনী এই বাঈজী আজ প্রায় কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছেন। জন্মসূত্র গওহর ছিলেন আর্মেনিয়ান খ্রিস্টান, আসল নাম মিস ইডিলিয়ান অ্যাঞ্জেলিনা ইউওয়ার্ড। জন্ম বেনারসে। মা ভিক্টোরিয়া ইমাংগার্স স্বামী হারানোর পর হায়দরাবাদের নিজাম মীর মেহবুব আলির আগ্রহে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। তখন অ্যাঞ্জেলিনা কিশোরী। এবার মা ও মেয়ের নতুন নামকরণ হল, যথাক্রমে বিবি মালকাজান ও গওহরজান। নিজাম বাহাদুর দুজনকেই নিয়ে আসেন কলকাতায়।

মালকাজান আগ্রাওয়ালী ছিলেন ডাকের সুন্দরী, তাঁর মেয়েও হয়েছিলেন আগুনের মতো রূপবতী। গওহরজান ছিলেন বহুভোগ্যা রমণী। প্রথম যৌবনে প্রেম দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল মাত্র দুজন পুরুষকে ঘিরে। সেই দুজন ভাগ্যবানের মধ্যে একজন ছিলেন তাঁর খাস তবলচি তরুণ রূপবান আব্বাস মিঞা, অন্যজন বহরমপুরের জমিদার নিমাই সেন।প্রথম জনের সঙ্গে প্রেমপর্ব গওহরের জীবনে মামলা-মোকদ্দমা এবং দারুণ বিপর্যয় এনে দিয়েছিল। গওহর এমনই স্বাধীনচেতা ও মুক্তবিহারিণী রমণী ছিলেন যে কোনো একজনের প্রণয়ীর সঙ্গে চিরতরের জন্য ঘর বাঁধার স্বপ্ন তাঁর আদৌ মনঃপূত ছিল না। এই কারণে জনসমাজের 'রক্ষণশীল ভদ্রজনদের' কাছে তিনি যথেষ্ট নিন্দিত ছিলেন। খ্যাতি ও কুখ্যাতি দুই জুটেছিল তাঁর কপালে।[৭৭]

গওহরজানের বিলাসিতা প্রসঙ্গে বেশ কয়েকটি গল্প চালু আছে। তিনি অজস্র টাকা রোজগার করেছেন নিজের পেশায়। কলকাতায় চিৎপুর রোড এবং ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে 'গওহর বিল্ডিংস' নামে প্রকাণ্ড বাড়ি দুটি তাঁরই কীর্তি। বেলা করে ঘুম থেকে উঠতেন। এক ডজনের বেশি চাকর-বাকর ছিল। সান্ধ্য ভ্রমণের জন্য চার-ঘোড়ায় টানা শৌখিন জুড়ি গাড়ি, ফিটন, টমটম, ল্যান্ডো ছিল বেশ কয়েকটি। তিনি সখবশত কোনও কোনও দিন কোচোয়ানের আসনে বসে এক হাতে ঘোড়ার লাগাম আঁটোকরে ধরে ও অন্য হাতে চাবুক নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন ময়দানের দিকে। শোনা যায়, একবার বড়োলাটের গাড়ি তাঁর গাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় হিরে জহরতে মোড়া সুন্দরী গওহরজানকে কোনো রাজকুমারী ভেবে লাটসাহেব টুপি খুলে আনত হয়ে অভিবাদন জানিয়েছিলেন। পরে গওহরের পরিচয় ফাঁস হয়ে যাওয়ায় কলকাতা পুলিশ কমিশনার বাঈজীদের চার ঘোড়ায় গাড়িতে ময়দানে বেড়ানো নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।[৭৮]

বয়ঃপ্রাপ্তির পর গওহরজান খুব কম সময়ের মধ্যে বাঈজী মহলের শীর্ষ স্থানটি দখল করেছিলেন। মুজরো নিতে বা পেশার খাতিরে তাঁকে মাঝে মাঝে বেনারস লখনউ যেতে হলেও তাঁর বাসস্থান ও কর্মস্থল ছিল কলকাতা শহরে। অবশ্যি শেষ জীবনে তিনি মহীশূর রাজ-দরবারে রাজনর্তকী ও গায়িকা রূপে কলকাতা ছেড়ে মহীশূরে চলে যান। গওহরজান থেকে কলের গানের বিকাশপর্ব শুরু। উর্দু, ইংরেজি, বাংলা ও হিন্দি চার ভাষাতেই অবলীলাক্রমে গান গাইতে পারতেন তিনি। ধ্রুপদ গাইতেন প্রাণ ঢেলে। হাফিজের গজলেও ছিল সমান দক্ষতা। দারুণ জনপ্রিয় ছিল তাঁর রেকর্ড। প্রতিটি রেকর্ডের শেষে তিনি সগর্বে ঘোষণা করতেন—'My name is Gauhar Zan'.

১৯২৩ সনে এই কিংবদন্তি নায়িকার মৃত্যু ঘটে। সেই সঙ্গে মৃত্যু ঘটে পূর্ব ভারতের বাঈজী প্রথার। তখন রীতিমতো কলের গানের যুগ শুরু হয়ে গেছে। প্রথম গ্রামাফোন ডিস্কে যাঁদের গান উঠেছিল তাঁদের মধ্যে দুজন ছিলেন নামকরা গজল গায়িকা। দুজনের নামই জোহরাবাই—ছোটোজোহরা আর বড়ো জোহরা। এঁরাও নিয়মিত বেনারস-কলকাতা-বেনারস করতেন, সময়াবকাশে পাটনাও যেতেন।বিখ্যাত গায়িকা রোশন আরা, যিনি দেশবিভাগের পর পাকিস্তানে চলে যান। ছোটোজোহরার কন্যা।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে গজল গানে বিখ্যাত হয়েছিলেন আর এক কিংবদন্তি সুন্দরী বাঈজী ছপ্পন ছুরি। এঁর সম্পর্কে দুটি গল্প প্রচলিত আছে। একটি গল্পে জানা যায়, আশ্চর্য লাবণ্যে ভরা দেহ ছিল তাঁর। কোথাও খামতি ছিল না, এক ছটাক মেদবাহুল্য ছিল না। সর্বত্র এক পুষ্ট ভাব। গোড়ালি থেকে চুল পর্যন্ত টের মিলত সুষমার। যৌবনপুষ্ট দেহ ঠিকরে বেরোত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এক মদির আবেদন। তাঁর স্বামী নপুংসক থাকায় তাঁর শরীর উপভোগ করতেন অর্থবান সাহেসবুবোরা। বিনিময়ে যা আয় হত লুটেপুটে খেতেন তাঁর শাশুড়ি ও স্বামী। একবার বখরা ভাগ নিয়ে বচসা চলে শাশুড়ি-বউয়ের মধ্যে। শাশুড়ি তখন ছেলেকে বলেন—'এ দজ্জাল মাগীকে দূর করো!' মাতৃআজ্ঞা পালন করতে ছপ্পন ছুরির স্বামী তাঁর শরীরে ছাপ্পান্ন বার ছুরিকাঘাত করে বাড়ির বাইরে ছুড়ে ফেলে দেন। সে-যাত্রায় বেঁচে যান ছপ্পন ছুরি। বীভৎস ভাবে ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়েও তাঁর কথক নৃত্য বোদ্ধা মহলে অবহেলিত হয়নি। তিনি সমাদৃত হন এবং ক্রমে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে ভারতময়। গজলচর্চার শুরু তার পরে। লোকের ধারণা, তাঁর সুন্দর রূপটা অক্ষত থাকলে হয়তো এমন দরদ দিয়ে গজল গাইতে পারতেন না।

অন্যদিকে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শংকরলাল ভট্টাচার্য 'শেষ বাঈজী' নামে বেড়ে একটা গপ্পো ফেঁদেছেন—'একদিন এক বাঈজীকে ছত্রাখান অবস্থায় পাওয়া গেল তার ঘরে, দেহে ছাপ্পান্নটি ছুরির ক্ষত। খুব সুন্দরী ছিল, প্রেমিকও ছিল প্রচুর, ছুরির ঘা থেকে বোঝা যায় হত্যাকারী গভীর প্রেমিক।' সেই বাঈজীর নাম রানী এবং হত্যাকারী প্রেমিকটির নাম শঙ্করলাল। গল্পটির দু-একটি অংশের উদ্ধৃতি এখানে দিচ্ছি—'শঙ্করলাল মেপে মেপে, জায়গা খুঁজে খুঁজে রানীর দেহে একটার পর একটা কোপ মারছে আর রানী কোপগুলো গুনে যাচ্ছে। এক ... দো ... তিন ... সাত ... আঠারো ... বত্তিশ ... পঁচপন ... রানী তৃতীয়বার ছুরির ঘা খেয়ে বলেছিল, তোমার যত খুশি মারো বাবু শুধু চোখে মেরো না। আমি তোমায় দেখতে দেখতে মরতে চাই। আমার চোখ নিও না বাবু ...। রানী পঞ্চান্ন পর্যন্ত গুনেছিল, তারপর একদম চুপ হয়ে গেল। সাতবারের পর সে আর আয়নার নীচে থেকে নড়তে পারেনি। তার আগে ঘরের এদিক ওদিক ছুটে বেড়িয়েছে। দরজার ছিটকিনিটা খোলার জন্য যখন ও ওপরে হাত বাড়িয়েছিল তখনই শঙ্করলাল ওর হাতের ওপর প্রচণ্ড কোপটা বসায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনটে আঙুল ছিটকে মাটিতে গিয়ে পড়ে। শঙ্করলাল ছুরির শেষ আঘাত হেনেছিল রানীর বুকের ঠিক মাঝখানে, দুই রক্তাক্ত, সুডৌল, গোল সূর্যের মাঝখানে। তখন বুকের দুই বোঁটা দিয়েও রক্ত ঝরছে রানীর। শঙ্করলাল দুই বোঁটাতে শিশুর মতন দুটি চুম্বন দিল ...' এর পর আর এক জায়গায় আছে—'প্রথম আঘাতটাই ছিল শঙ্করের অভিপ্রেত, বাকি চুয়ান্নটি লজ্জা ও পাপবোধ থেকে, ছুরির নিজস্ব হঠকারিতা থেকে।... রানী কোপগুলো গুনছিল দেখে কিছুটা নেশা হয়েছিল শঙ্করেরও। অন্তত ছাপান্ন ঘা মারার বাসনা জেগেছিল ওরও। কিন্তু পঞ্চান্ন বারের পর রানীর চোখ দুটো ছাড়া আর জায়গা ছিল না। চোখ

খারাপ শঙ্করের, তাই পৃথিবীর সমস্ত মানুষের চোখের জন্য ওর বড়ো মায়া। আর রানী চেয়েছিল চোখ দুটি যেন বেঁচে থাকে।'[৭৯]

ছপ্পন ছুরির সমীপকালীন জানকী বাঈ বিখ্যাত হয়েছিলেন গজলেরই জন্য। তিনি বেশ্যা ছিলেন না—কিন্তু তাঁর সহেলিরা দেহের ব্যাবসা করত, যাদের লালন করত জমিদার ও ধনী ব্যবসায়ীরা এবং এই ব্যাবসায় মদত জোগাত নারীকল্যাণ সমিতি। জানকী বাই গভর্নরের কাছে এই বলে আবেদন জানান যে নারী সমিতি ও জমিদাররা স্বৈরিণীদের উৎখাত করে প্রকৃতপক্ষে সংগীতের ওপর আক্রমণ করছেন—কেননা এদেরই মধ্যে নাচগান বেঁচে আছে। সরকার এর প্রতিকারের জন্য বাঈজীদের কোঠায় সেনা মোতায়েন করেন। গজল-ঠুংরির বিকাশে এটা হয়েছিল সহায়ক। শুরু হয়েছিল জিয়া বেগমের যুগ।ইনি ছিলেন আম্বালার বাইজি। গোটা তিরিশের দশকটা মাত করে রেখেছিল ত্রিয়া বেগমের গজল। এঁর জমানায় বাঈজীদের চারিত্রিক অধঃপতন কেউ রুখতে পারেনি। নব্য সভ্যতার চাপে তাঁরা ক্রমে অন্ধকারে তলিয়ে যেতে শুরু করেছিলেন। অবশ্যি গজলের চর্চা ছিল অব্যাহত।

১৯২০-এর শেষ আর তিরিশের শুরুতে লখনউয়ের মিস দুলারী গ্রামাফোনে গজল গেয়ে বিখ্যাত হলেন। 'মিস' কথাটা তখন খুব চলেছিল। থিয়েটারে, সিনেমায়, রেকর্ডে সর্বত্র মিস মিস মিস। প্রসঙ্গত, দেশবন্ধুর সহোদরা অমলা দাস, 'মিস দাস', নামেই রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন। বম্বের মূক ছবি এই মিসদের জন্যেই সম্ভব হয়েছিল। কাগজে এঁদের পরিচয় ছাপা হত কোনো রাজা বা নবাবের ভগিনী অথবা কন্যা হিসেবে। কলকাতায় গোড়ার দিকে সিনেমার মিস কাজ্জন নামে এক বাঈজী অভিনয় করতেন। প্রখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী ও পরে সংসদ-সদস্যা নার্গিস দত্ত ছিলেন জদ্দন বাঈয়ের কন্যা।

চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকে বিখ্যাত হয়েছিলেন জম্মুর মালকাজান ও জয়পুরের শমশাদ বেগম। পূর্ব ভারতে বাঈজী প্রথা ঘুচে গেলেও, মহারাষ্ট্রে তার কিছুটা চল ছিল। পুনেতে মারাঠারা জোর করে দিল্লির কিছু বাঈজীকে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানকার অনিকা বানু ও বুরগাইজানের খ্যাতি ছিল গজলের জন্যে।পেশোয়ারের তামাঞ্জা জান ছিলেন স্বনামধন্যা। তামাঞ্জা শব্দটির অর্থ নির্মল। সত্যিই তিনি ছিলেন নির্মল রূপের অধিকারিণী। পা থেকে মাথা পর্যন্ত যাবতীয় সম্পদ তাঁর দেহের যথাযথ স্থানে ও সুন্দরভাবে বিদ্যমান ছিল।অনেকের মতে, সৃষ্টিকর্তা যেন বিশ্বের সব সৌন্দর্য একাধারে দেখবার লোভ সামলাতে পারেননি। নিখিলের তাবৎ সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য আহরণ করে এই রমণীকে গড়েছিলেন। হবিবুর শেখ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অতিরঞ্জিত ভাষায় লিখেছেন—'তামাঞ্জাজান ছিলেন আল্লার শেষ সৃষ্টি গজেন্দ্রগামিনী তামাঞ্জার পদসঞ্চারে অঙ্গ-দুলনে মনে হত লাবণ্যের নদীতে ছোটো ছোটো বীচিকলা। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে পুরুষের বুকের হাড় চূর্ণিত হত। তামাঞ্জা যে সালোয়ার কামিজ পরতেন তাতে বসানো থাকত চোখ ধাঁধানো চুমকি। যখন নড়তেন, মনে হত বিদ্যুৎ ঠিকরে বেরোচ্ছে। প্রত্যেকটি আঙুলে ছিল হিরের আংটি, কানের দুলও হিরের। তামাঞ্জার কাছে ইংরেজদেরই আনাগোনা ছিল বেশি। সকলের তিনি নর্মসহচরী ছিলেন। গানের গলা ছিল অসম্ভব রকমের মিঠে। গালিব, মীর, শকীল ও দতের গজল গাইবেন দরদ ঢেলে। সে-সব গান আজ কোথায় হারিয়ে গেছে।'[৮০]

বাঈজী প্রথাটা ছিল সামন্ততন্ত্রের প্রতীক, তাই এর পতন ছিল অবশ্যম্ভাবী। প্রথমে দেখা দিল অর্থনৈতিক সংকট, নাচগান ছেড়ে অনেকে নেমে গেলেন গণিকাবৃত্তিতে; আবার কেউ কেউ আঁকড় ধরে রইলেন শুধু গানকে। বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে গানের জগতে বাইজিদের অনুপ্রবেশ বাড়তে থাকে। শুরু হল কমলা ঝরিয়া, মলিকা পুখরাজ, মাস্টার মদনের দিন। কলের গানে তখন হরেক কিসিমের রং, হরেক সুর। তখন এই গান ঘিরেই উত্তেজনার চরম। ঘরে ঘরে মেহফিলের মেজাজ।কখনও কোনো গগনচুম্বী ইমারত থেকে মুজরোর বোলের সঙ্গে ভেঙ্গে আসত কমলা ঝরিয়ার কুহুতান—'আইয়ে আকর মেরী খুশকিসমতী বন জাইয়ে' কিংবা 'কাসিম লায়া থা খবর এ্যয়সী খবর ভী ক্যা খবর'। কোথাও কোনো গাব্বাগোব্বা মহল

থেকে ভেসে আসত মলিকা পুখরাজের—'বে সুবাঁ না হো জায়ে' অথবা মাস্টার মদনের মিহি গলায়—'য়্যুঁ ন রহ রহকর মুঝে তড়পাইয়ে'।

এই প্রসঙ্গে একটা ব্যক্তিগত ক্ষোভ আর বেদনার কথা উল্লেখ করছি। বিগত যুগে যেসব বাঈজী গজল ঠুংরি দাদরা টপ্পা কাজরী চৈতী হোরী ভোজপুরী বুন্দেলখণ্ডী ঔষী বান্দ্রা খামসা বাবান বাহাই শুনিয়ে তামাম হিন্দুস্তানকে মাতিয়ে রেখেছিল, আজকের 'রক্ষণশীল ভদ্রজনেরা' তাঁদের ঘৃণা করে। এখনকার বাঈজীদের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা সামাজিক স্বীকৃতির অভাব। সমাজের এক অংশ তাঁদের বাঈজী কিংবা তবায়েফ বলে সমাজে নীচের তলায় দাবিয়ে রাখে। যাঁরা আক্ষরিক অর্থে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের ধারাবাহক সংরক্ষক, তাঁরাই কার্যত সংগীত সমাজের হরিজন। যাঁদের কাছে তালিম পেয়ে অন্যরা হল 'শিল্পী', কিন্তু নিজেরা তাঁরা বরাবরের মতন কোঠাবন্দি 'বাঈজী'। টিভি রেডিওতে তাঁদের গান গাওয়ার এক্তিয়ার নেই, বড়ো বড়ো জলসায় তাঁরা সামান্যতম উল্লেখিত নন। যাঁদের কাছে সংগীত দুনিয়ার বৃহৎ ঋণের কণামাত্রও শোধ করার প্রচেষ্টা হয়নি ১৯৮৪-র আগে পর্যন্ত। সেইসব কিংবদন্তি প্রায় বাঈজীদের অনেকে আজও জীবিত আছেন। কিন্তু সমাজের লাথি খেয়ে অনেকেই এখন গানবাজনার প্রতি উদাসীন। ছেলেমেয়েদের নাচগান না শিখিয়ে স্কুল-কলেজে পাঠাচ্ছেন পড়াশোনা করতে। এক গৌরবের যুগের ধ্বংসাবশেষের মতো এক-একজন তাঁদের কোঠা আগলে পড়ে আছেন। দেখলে চোখে জল আসে।

এইসব স্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া বাঈজীদের সমাজে ফিরিয়ে আনার একটা আন্দোলন গত ১৯৮৪ থেকে চলেছে। গোড়ার দিকে আন্দোলনের নেতৃত্বে যিনি ছিলেন তিনি কিন্তু সেই অর্থে বাঈজী নন, তার নাম রীতা গাঙ্গুলী।—'রীতা লখনউয়ের প্রবাসী বাঙালি লেখক, স্বাধীনতাযোদ্ধা, জার্মান সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিশারদ ড. কে এল গাঙ্গুলীর দুহিতা। তাঁর বড়ো বোন প্রসিদ্ধ রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী গীতা ঘটক।রীতার সংগীত ও নৃত্য নিয়ে পড়াশোনা শান্তিনিকেতনে। রীতার বিবাহ ভিন্ন প্রদেশে হলেও এবং গানের চর্চা উত্তর ভারতীয় রাগধারী সংগীতে হলেও তিনি মনে প্রাণে, সমাজ ও সংস্কৃতিতে বাঙালিই।'[৮১]

'বাঈজীর শিল্পীসত্তার বিকাশের অনুকূল করে তুলতে হবে সমাজকে'—এই হল রীতার স্লোগান। বাঈজীদের সমাজে প্রতিষ্ঠার ব্রতকে রীতা গুরুবন্দনার অঙ্গ মনে করেন। তিনি বলেন, 'আমি নিজেও যে পরিবেশে যে-তালিম পেয়েছি তাতে আমিও এক বাঈজী। কিন্তু সমাজ বাঈজী বলতে যা বোঝে আমরা সে বাঈজী নই।' নিজের গবেষণাকর্মে তিনি বাঈজীদের নতুন নামকরণ করেছেন 'পেশাদার মহিলা সংগীতশিল্পী'। রীতার গবেষণায় অর্থ সাহায্য দিতে এগিয়ে এসেছে ফোর্ড ফাউন্ডেশন। বাঈজীদের বংশলতিকা রচনায় বহুদিন ধরে ব্যাপৃত আছেন তরুণ গজলিয়া চন্দ্রনাথ। গত ১৯৮৪ সালের ৬ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম নিখিল ভারত বাঈজী বা পেশাদার মহিলা সংগীতশিল্পী সম্মেলন, রীতা গাঙ্গুলীর তত্ত্বাবধানে। এই মহোৎসবে গজল ঠুংরি কাজরী চৈতী প্রভৃতি গানে অংশ নিয়েছিলেন বম্বের শমশাদ বেগম, লখনউয়ের জারিনা আনোয়ারি ও কুমার জাহান, বেনারসের বাগেশ্বরী দেবী, বিকানীরের আল্লা জিলাই বাই, জয়পুরের আফরোজ বেগম, এলাহাবাদের শান্তী দেবী জৈন, মুজফফরপুরের ব্রিজবালা দেবী। বম্বের চন্দ্রকলা, যোধপুরের গৌরী বাঈ, আজমগড়ের রামেশ্বরী দেবী, মুজফফরপুরের রানী দেবী ও জীনৎ বানু, ছাপরার নুরাদন বানু ও ঊর্মিলা দেবী প্রমুখ। সাকুল্যে বাইশ জন। এঁদের অধিকাংশেরই বয়স ষাট ছাড়িয়ে গেছে। প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা বাঈজীদের কণ্ঠে গান শুনে দিল্লিবাসী একেবারে হাঁ। তাঁরা যেন সারা জীবনে এই স্তরের, এই রসের, এই ঠমকের গান শোনেনি।

বাঈজীদের কোঠা-নিষিক্ত সেই স্বরের, সেই রসের, সেই ঠমকের গজল কাজী নজরুল ইসলাম আর অমর গায়ক কুন্দনলাল সায়গলের কণ্ঠে ভিন্ন মাত্রা লাভ করল। বাদশা-নবাব, আমির-উমরাহদের দরবার ও দহলিজ, বাঈজীদের নাচঘর বা কোঠায় নিয়ত ধ্বনিত গজল আম-জনতা বা সাধারণের নাগালের বাইরে ছিল। গ্রামোফোন কোম্পানি এসে আম আদমির বৈঠকখানায় গজলকে পৌঁছে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তখনও

তা অধিকাংশ মানুষের এক্তিয়ারের বাইরেই থেকে গেছে। বস্তুত, বাঈজীদের মেহফিল যদি গজলের বিষ্ণুপদ হয়, তাহলে সিনেমায় গজলের ভগীরথ সায়গল আর বেগম আখতার। অনভিজাত ভারতীয় শ্রোতাদের কাছে গজলকে পৌঁছে দেওয়ার যাবতীয় কৃতিত্ব এই দুজনের। এছাড়া সেসময় গজল গায়কীর দুনিয়ায় প্রভূত উচ্ছ্বাস নিয়ে এসেছিলেন মলিকা পুখরাজ, কমলা ঝরিয়া, মাস্তার মদন প্রমুখ।

তো, দেখা যাচ্ছে, একসময় গজলকে বাঁচিয়ে রেখেছিল বাঈজীদের মেহফিল, পরে বিগত শতকের তিরিশ থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত গজলের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার মূলে ছিল প্লেব্যাক গানে তার অনর্গল ব্যবহার। ক্রমে ক্রমে যমুনা বয়ে এসেছে বহুদূর। সময়টা গেল-শতকের সাতের দশক। বম্বের তলপেট থেকে ক্রমাগত মন্থিত হচ্ছে একের পর এক 'মশালা' ফিল্ম। মঞ্চ থেকে সরে গেছেন অনিল বিশ্বাস, নৌশাদ আলি, রোশনলাল নাগরথ, মদনমোহন কোহলী, ওমকার প্রসাদ ন্যইয়র, হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, শংকর জয়কিশন, রামচন্দ্র চিতলকর, বক্স-অফিস কাঁপানো সব নাম! ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছেন সলিল চৌধুরী, শচীন দেববর্মণ, রবিশংকর শর্মা, মহম্মদ জহুর খৈয়াম, আরও অনেকে। পঙ্কজকুমার মল্লিক, রাইচাঁদ বড়াল, খেমচাঁদ প্রকাশের তৈরি করা প্লেব্যাক গানের মডেলটা বদলে গিয়েছিল অনেকটাই। কিন্তু ভিত্তিটি মোটামুটি একই ছিল। মেলোডির চূড়ান্ত মহিমা। গড়নটির মধ্যে প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে গমাগম করে মতলা, রদীফ, কাফিয়া, কাশিদার নির্দিষ্ট ছাঁচটি। অর্থাৎ, দিনের শেষে গজলই বাদশা। এখানেও মেলোডিই শেষ কথা। যদিও এই ঐতিহ্যটি হাজার বছরের প্রাচীন, এবং গোটা নির্মাণটির মধ্যে নিহিত রয়েছে এক ধরনের নিমীলিত ও ফুরিয়ে যাওয়া সামন্তগন্ধী সুবাস। তাকেই ধরে রাখল হিন্দী সিনেমার গানের ভুবন। এরই মাঝখানে কোনও মতে গুঁজে পড়ে রইল গজল নামক গীতিধারাটিও। পূর্বোক্ত সুরকারদের মধ্যে অনেকেই এই গীতিধারাটি নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, বিশেষত মদনমোহন, নৌশাদ, রোশন, রবি এবং খৈয়াম। এঁদের সুরসৃষ্টির আধার ছিলেন মহম্মদ রফি, তালাত মাহমুদ, মান্না দে, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলের মতো দিগ্বিজয়ী শিল্পীরা। এঁদের যুগলবন্দি থেকে ভারতীয় লোকপ্রিয় সংগীতে গজলের যে জঁরটি রচিত হয়েছিল তার স্বীকৃতি ও প্রাসঙ্গিকতা প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পরেও অম্লান।

সত্তর দশকের শেষদিকে হিন্দী ছায়াছবির গানের জগতে ভাঁটার পর্ব শুরু হয়ে যায়। গগনস্পর্শী নামগুলি একে একে বিদায় নিতে থাকে। স্তিমিত হতে থাকে মুগ্ধকর গজলের রেশ। সেই অনার্তব সময়ে কতিপয় উচ্চকোটির শিল্পী শ্রোতাদের প্রত্যাশা আর গানের যোগানের মধ্যে ব্যবধানটি পূরণ করার সদিচ্ছায় নেমে পড়েন। তাঁদের মধ্যে প্রধান নামগুলি, যেমন মেহদি হসন, গুলাম আলি, জগজিৎ সিং প্রমুখ ভারতীয় সংগীত ঐতিহ্যে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। এছাড়া শাস্ত্রীয় সংগীতে, এবং অবশ্যই গজলে, সবিশেষ নৈপুণ্য নিয়ে হাজির হয়েছেন হরিহরণ। এ-ব্যতিরেকে, গুণগত সিদ্ধির নিরীখ নাকতোলা করলে, অনুপ জলোটা, ভূপেন্দ্র, চন্দন দাস, পংকজ উধাস, রূপকুমার রাঠোর, তালাত আজিজ, চিত্রা সিং, মিতালী সিং, সোনালী রাঠোর প্রমুখের নামও বাদ দেওয়া যায় না।

আমরা সায়গল (১১ এপ্রিল ১৯০৪-১৮ জানুয়ারি ১৯৪৭) থেকেই শুরু করব। কুন্দনলাল সায়গল সেসময় ছায়াছবির হার্টথ্রব হিরো, অথচ তেমনি সুদক্ষ গায়ক। গজল গানে তাঁর সহজাত নৈপুণ্য ছিল। বস্তুত তাঁর গায়নের বা সুর লাগানোর কৌশলটিই ছিল বনেদি গায়কীর অনুসারী।[৮২] আক্ষরিক অর্থেই সায়গলে এসে গজল যেন নবজন্ম লাভ করল। 'সায়গল সৃষ্টিশীল মন নিয়ে গজলের এমন এক নতুন শৈলী, মতান্তরে ফরমুলা চালু করলেন—যাতে একাধারে বাংলার শস্য-শ্যামলা ধরিত্রীর সোঁদা গন্ধ ছিল, আওধের উদারতা ও ভাবালুতা ছিল, আবার পঞ্জাবের বীররস ও উচ্ছলতার ছোঁয়াও ছিল।কোথাও ছিল মীরের সরলতা, কোথাও বা গালিবের গভীরতা।'[৮৩]

সংগীতের জগতে সায়গল এত অবিস্মরণীয় প্রতিভা। জন্ম পঞ্জাবের জলন্ধরে।হরিশ্চন্দ্র বালি তাকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন। তখন তিনি বাংলা জানতেন না, ইংরেজি জানতেন, কথা বলতেন হিন্দি-

উর্দুতে। হঠাৎ একদিন তিনি একা কলকাতা বেতার অফিসে এসে উপস্থিত। ‘কলকাতা বেতারের প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর তখন নৃপেন মজুমদার। পঙ্কজকুমার মল্লিক তখন কলকাতা বেতারের সংগীত বিভাগে কিছু কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। নৃপেন ডেকে পাঠালেন পঙ্কজকুমারকে। বললেন—পঙ্কজ, দ্যাখো তো, এই ছেলেটি রেডিয়োতে গাইতে চায়, তুমি ওর অডিশন নাও তো একটু। পঙ্কজকুমার ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন—কী ধরনের গান গেয়ে থাকেন আপনি? জবাব এল—গীত, ভজন, গজল, ঠুংরি এইসব। পঙ্কজকুমার তাঁর গান শুনলেন, শুনে মুগ্ধ হলেন। ছুটে গেলেন নৃপেন্দ্রনাথের কাছে। বললেন—নৃপেনদা, আপনি নিজে এসে একবার শুনে যান। প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ রাইচাঁদ বড়ালও তখন কলকাতা বেতারের সঙ্গে সংযুক্ত। তাঁকে নিয়ে নৃপেন এলেন। গান শুনলেন। চমৎকৃত হয়ে বললেন—ওহে, ছেলেটাকে আজই মাইক্রোফোনে বসিয়ে দাও। সেদিনই সন্ধ্যায় ব্রডকাস্ট করা হল একজন অজানা-অচেনা পঞ্জাবি যুবকের দুখানা গজল।’[৮৪]

এ দেশে তখনও সিনেমায় প্লে-ব্যাক প্রথা চালু হয়নি, গায়ক-অভিনেতার খুব কদর। সায়গল ঢুকলেন নিউ থিয়েটার্সে। ফিলম দুনিয়ায় সায়গলের আবির্ভাবে রাইচাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি ‘পুরাণ ভকৎ’ ছবিতে সায়গলকে দিয়ে প্রথম গান গাইয়েছিলেন। ১৯৩৫ সনে মুক্তি পায় প্রমথেশ বড়ুয়ার ‘দেবদাস’। এই ছবিতে দুখানা গানে সায়গল মাত করে দিয়েছেন—‘গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে তোমার রাঙা কপোলখানি’ এবং ‘কাহারে জড়াতে চাহে দুটি বাহুলতা’। গায়ক-অভিনেতা হিসেবে সায়গল বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছেন। ১৯৩৬ সনে নির্মিত ‘দিদি’ (হিন্দি প্রেসিডেন্ট) ছবিতে তার প্রথম আত্মপ্রকাশ। পঙ্কজকুমারের মতে, সায়গল অভিনয়ে মোটামুটি, কিন্তু গানে অসাধারণ। এ-বিষয়ে সম্ভবত কারও দ্বিমত নেই।

বিশেষত, গজলের দুনিয়ায় সায়গলের সমকক্ষ অন্য কেউ ছিলেন না। তাঁর মধুকণ্ঠে গজল এক নতুন ব্যঞ্জনা লাভ করেছে, জনপ্রিয় হয়েছে—

> ‘জানে ক্যয়সে য়্যে দর্দ ছুপায়ে রখুঁ দিল মেঁ
> এক শখস ওয়দিম জ্বলায়ে রখুঁ দিল মেঁ।’

সায়গলের দরদঘন গজলগুলির জনপ্রিয়তার প্রমাণ মেলে আজও যখন লোকের মুখে মুখে শুনি—‘দুনিয়া মেঁ হুঁ দুনিয়া কা তলবগার নহীঁ হুঁ’ কিংবা ‘নুকতাচী হ্যয় গমে দিল উসকো সুনায়ে ন বনে’ অথবা—

> ‘শুক্রিয়া হস্তী কা লেকিন তুনে য়্যে কর দিয়া
> পরদে হী পরদে মেঁ আপনা রাজ আসফাঁ কর দিয়া।’

সায়গলের গজলের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ—তাঁর অনন্য গায়কী। এমনই স্বতন্ত্র তাঁর শৈলী যে অনুকরণ করা কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। পঞ্চাশের দশকে সি এইচ আত্মা সেই শৈলী আয়ত্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেননি। নৈবেদ্যর চূড়ায় সন্দেশের যতটুকু মূল, গজলের দুনিয়ায় আত্মাজীর গানের অস্তিত্ব তার বেশি কিছু নয়। সায়গলের অনন্যতা এখানেই। তাই বলা যায়, গজলের দুনিয়ায় তাঁরে অনুপস্থিতি খুব বেদনাদায়ক।

অল্পায়ু প্রতিভাধরের উদ্দেশে প্রায়ই খেদোক্তি শোনা যায়—তিনি অকাল প্রয়াত না হলে সম্ভাবনা ছিল দিগ্বিজয়ের। মহম্মদ রফির ক্ষেত্রে এ আক্ষেপ বহুলাংশে সমর্থিত। হিন্দী ফিলমী গানের এই দুর্দিনে রফির মতো একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মৃত্যু (৩১ জুলাই ১৯৮০) এক বিরাট ক্ষতি। রফির জন্ম ২৪ ডিসেম্বর ১৯২৪ পঞ্জাবের কোটালা সুলতানসিং গ্রামে। সংগীতে হাতেখড়ি বড়ো দাদা হামিদ মিয়ার কাছে। সায়গল তখন সংগীতাকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। একবার লাহোরে তাঁর প্রোগ্রাম ছিল। রফি সেই অনুষ্ঠানে চারটি গান শোনান। গান শুনে সায়গল তাঁকে বুকে চেপে ধরে বলেন—তেরী আওয়াজ মেঁ বড়া দম হ্যয়, তু এক রোজ নাম কমায়েগা। এই ভবিষ্যদবানী ফলেছিল রফির জীবনে। ফিলমে আসেন ১৯৪১ সনে, প্রথম ছবি পঞ্জাবী ‘গুলবলোচ’। এর পর বম্বে এসে গাইলেন ‘গাঁও কী গোরী’, ‘লয়লা মজনু’, ‘সমাজ কো বদল ডালো’ ও ‘জুগনু’ ছবিতে। জুগনু-র গান ‘য়্যহাঁ বদলা বফা কা’ তখন দারুণ আলোড়ন তুলেছিল। রফির প্রসঙ্গে সবচেয়ে বড়ো কথা হল—সেটা ছিল সায়গল ও সুরইয়াদের যুগ, সুরের চেয়ে গলারই দাম ছিল বেশি—

রফির আগমনে অবস্থাটা পাল্টে গেল। যাঁরা শাস্ত্রীয় সংগীতে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁদের পক্ষে অন্য সুরকারের নির্দেশে গান করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। সায়গলের একাধিপত্য নষ্ট হল। সূচিত হল রফি-লতা-মুকেশের যুগ। রফি ছিলেন নরফনমৌলা গায়ক—সব ধরনের গানে তাঁর দক্ষতা ও জনপ্রিয়তা অবিসংবাদিত।[৮৫]

মহম্মদ রফির গজল মানে সিনেমার গজল, বন্দেশী গজল—সেখানে তাঁর মোকাবিলা করার মতো কেউ ছিল না। রফির পরিচ্ছন্ন ও আড়ষ্টতাবর্জিত কণ্ঠে মীড় ও বারিক মুরকিগুলির অদ্ভুত সামঞ্জস্য ছিল। মীড় ওঠানোর সময় স্বরগুলিতে যে কাঁপন হত, তা অন্যান্য গায়কের গলায় দুর্লভ। তাঁর একটি জনপ্রিয় গজল নিচে উদ্বৃত করছি। গীত ঢঙে ক্যাইফি আজমির লেখা ও মদনমোহনের সুর দেওয়া এই গজলটি তিনি গেয়েছেন 'হকীকৎ' ছবিতে। এতে কোনো স্থায়ী-অন্তরা নেই, আছে শুধু দরদ আর সুরের খেলা—

'ম্যয় য়্যে সোচকর উসকে দর সে উঠা থা
কি উও রোক লেগী, মনা লেগী মুঝকো।
হওয়াওঁ মেঁ লহরাতা আতা হ্যয় দামন
কি দামন পকড়কর বিঠা লেগী মুঝকো।
কদম এ্যয়সে অন্দাজ সে উঠা রহে থে
কি আওয়াজ দেকর বুলা লেগী মুঝকো।
নগর উসনে ন রোকা, ন উসনে মনায়া
ন দামন হী পকড়া, ন বিঠায়া মুঝকো।'

সায়গলের জীবনাবসানের পর নন-ফিলমি গজলে সবচেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন অখতার বাঈ ফৈজাবাদী, যিনি পরবর্তী কালে বেগম অখতার (৭ অক্টোবর ১৯১৪-৩০ অক্টোবর ১৯৭৪) নামে বিখ্যাত হয়ে উঠে গিয়েছিলেন জনপ্রিয়তার শেষ চূড়ায়। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়—'যেমন শ্বেতপাথর ছাড়া অন্য কোনো পাথরে তাজমহলের কল্পনা করা যায় না, তেমনি বেগম অখতার ছাড়া গজলের কল্পনা অসম্ভব।'[৮৬]

এটি অতিশয়োক্তি নয়—বাস্তবিকই বেগম অখতার ছিলেন সংগীতাকাশের 'অখতার' অর্থাৎ নক্ষত্র। জন্ম ফৈজাবাদে। সংগীতচর্চা ছিল ঘরানাগত। বাঈজীদের ঢঙে গাইতেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল অখতার বাঈ। এই নাম তাঁর পছন্দ ছিল না। স্বামী ছিলেন লখনউয়ের নামজাদা ব্যারিস্টার, তিনিও চেয়েছিলেন স্ত্রী 'বাঈ'-এর বদলে 'বেগম' নামে পরিচিত হোন। তিনি অখতারকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। বেগম সাহিবা পারসি থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানিতে গায়িকা রূপে যোগ দেন। মাঝেমধ্যে অভিনয় ও নৃত্যও পরিবেশন করতে হত। অভিনয়-নৃত্য-গীতে বেগম অখতার বিনা মাইকে যে গান গাইতেন তবলা, বাঁশি, বেহালা, ক্ল্যারিওনেট, ঘুঙুর ও হারমোনিয়মের সমবেত যন্ত্রসংগীতের সঙ্গে যে গানের বিশেষ আবেদন ছিল প্রথম সারির ধনী 'বাবু' দর্শকদের কাছে, তাঁরা উচ্ছ্বাসে চেয়ারের হাতলে উঠে বসতেন এবং 'ওয়ানস মোর' ধ্বনি তুলে প্রিয় গান একাধিকবার গাওয়াতেন। আক্ষেপের কথা সেই সময় তিনি গালিব-মীর-জোকের ভাণ্ডার উজাড় করে দেবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করা সত্ত্বেও কলকাতার সাড়া পাননি। কেন-না সেই গান 'বাবু'দের তেষ্টা মেটাতে পারেনি। অখতারে গজল গায়কী ছিল পরিচ্ছন্ন, মার্জিত এবং তাই তার আবেদন ছিল পরিশীলিত ও নান্দনিক চিত্তবিনোদনে সীমিত। তাই তিনি চলে গিয়েছিলেন বম্বে। সেখানকার রেডিয়ো স্টেশনটা ছিল ব্যালার্ড পিয়রের অট্টালিকায়। বড়ো একটি হলের পাশে ঘোষকের কামরা, হলের বাইরে অপেক্ষাগৃহ। বেগম অখতার একদিন সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। বিভিন্ন নামকরা শিল্পীদের—শামসুদ্দীন খাঁ, কামুরাও মঙ্গেশকর, রত্নাকর রামনাথকর, গোবিন্দ ইয়াল্লাপুর, নিমকর, দীনকর রাও এবং রেডিয়ো স্টার শ্রীধর পার্সেকরের বাঁকা হাসি উপেক্ষা করে অখতার গিয়ে ঢুকলেন জুলফিকার খান রোখারির চেম্বারে। গান শুনে মুগ্ধ হলেন বোখারি সাহেব।সেদিনই অখতারের একটি গজল রেকর্ড করা হল—

'দিওয়ানা বনানা হ্যয় তো দিওয়ানা বনা দে....'

গজলের অর্থ গৌণ। শায়র সম্ভবত বহজাদ, শকীলও হতে পারেন। কিংবা আর কেউ। কে এই গজলের রচয়িতা, কেই বা সুরকার তা কখনও জানবার ইচ্ছা হয়নি আমার। কিন্তু কলের গানে প্রথম যেদিন শুনি গানটা, সেদিন সুর ও কথা ছাপিয়ে গায়িকার বেদনাসিক্ত কণ্ঠস্বর, রেকর্ডের ঘস ঘস আওয়াজ সব মিলে আমাকে বস্তুজগৎ থেকে প্রবলবেগে টেনে-হিঁচড়ে কোন দূরদূরান্তে এক অজানা জগতে নিয়ে চলে গিয়েছিল।

ভাব-লয়-স্বর-সুরের ওপর সুন্দর দখল ছিল বেগম অখতারের। এই বিশেষত্বের কারণেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন 'মলিকা-এ-গজল'। গজলের প্রথম স্বর-অনুরণনটা হওয়া উচিত অবগুণ্ঠনবতী নারীর মতো। শ্রোতা সেই ঘোমটার ফাঁকে দৃষ্টি প্রেরণ করার চেষ্টা করবেন। চন্দ্রমুখের ওপর করাল কুশ্রী রাহুগ্রাসের মতো অস্বচ্ছ ওড়নার অবগুণ্ঠন ক্রমে ক্রমে অপসারিত হতে থাকবে। আর গানের যবনিকার পূর্বমুহূর্তে তা সম্পূর্ণ উন্মোচিত হবে। বেগম সাহিবার গলায় এই জাদু ছিল।

আগেই বলেছি বেগম অখতারের গাইবার ঢঙটা ছিল বাইজিদের মতো। কোনো অহংকারী অভিনিবেশ তাতে ছিল না। মঞ্চের ওপর তানপুরা নিয়ে বসার ভঙ্গিটা ছিল কুলীন। প্রথমে আদাব জানাতেন শ্রোতাদের উদ্দেশে। সেটা কমন এটিকেটের মতো—না অতি নম্র, না দাম্ভিক।গানের ফাঁকে ফাঁকে বাঁ হাতের তর্জনী ও মধ্যমা জুড়ে শেরের মিসরা আউড়ে ছুড়ে দিতেন শ্রোতার দিকে। কারুকে মাত করার প্রবৃত্তি তাতে থাকত না, কিন্তু তাতেই শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে বয়ে যেত অদ্ভুত এক শিরশিরানি। উৎফুল্ল শ্রোতাদের মধ্যে 'কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ' গুঞ্জন উঠতো। মুহুর্মুহু ঘটে যেত করতালির করকাপাত। অথচ তান পালটানোর ফালতু সার্কাস বা তানের বাজি ফাটানোর ব্যাপারটা ছিল বেগম সাহিবার উশুলের খেলাপ। গাইতেন খুব আদুরে গলায়—নারীসুলভ, মোহময়ী, স্নেহার্দ্র, শীতল কণ্ঠে। 'আজ যে গজলের ঝোড়ো জনপ্রিয়তা সে তো ফিলমি, অশিক্ষিত, কাব্যরহিত গজল'—বলেছেন রীতা গাঙ্গুলী—'বেগম অখতারের সেই তন্নিষ্ঠ আচারনিষ্ঠ, কাব্যময় গজল কজন শুনেছে?'—

'দর্দ মিন্নত কশ-এ-দওয়া ন হুয়া
ম্যঁয় ন অচ্ছা হুয়া বুরা ন হুয়া।'

বেগম সাহিবার জীবনের শেষ বছরটি কলকাতার মানুষের কাছে চিরস্মরণীয়। তাঁর বয়স তখন ষাটের ওপারে, অথচ তাঁর কণ্ঠে ভর করেছে এক আশ্চর্য যৌবন। সত্তর দশকের মধ্যবর্তী এই সময়টায় তিনি সম্ভবত তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ গানগুলি গাইছিলেন। তাঁর এক অনুষ্ঠানের আলোচনায় 'দেশ' পত্রিকায় শঙ্করলাল ভট্টাচার্য ইয়েটসের পরিণত বয়সের কবিতার প্রসঙ্গ এনেছিলেন। ওই অসম্ভব যৌবনের মধ্যেও একটা মৃত্যুর প্রচ্ছায়া তিনি লক্ষ করেছিলেন। সেবার কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার দিন কতকের মধ্যেই, আহমদাবাদে ৩০ অক্টোবর ১৯৭৪ তাঁর ইন্তেকাল হয়।

আস্তিকেরা যাকে বলে 'ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা' সেই ধরনের কিছু নিশ্চয়ই ছিল বেগম অখতারের মধ্যে। শম্ভুনাথ মিশ্র লিখেছেন—'তাঁর গলায় এমন কিছু ছিল যা অন্যান্য গজল গায়ক বা গায়িকার মধ্যে দুর্লভ। তাঁর আওয়াজে এমন একটা দরদ ছিল, যাতে তিনি যখন গালিব, জিগর, ফয়েজ বা শকীলের গজল গাইতেন —তখন শ্রোতারা রোমাঞ্চ অনুভব করতেন। তাঁর গানে একটা স্বতন্ত্র ভঙ্গী ছিল, ভাবে ছিল স্বতন্ত্র বৈচিত্র্য। হাজার হাজার শ্রোতার মাঝেও মনে হত তিনি প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে গাইছেন।'[৮৭]—এই খাস রবিশ বা স্টাইলের নাম মুক্ত গজল বা খুলী গজল। মেহফিলের গজলও বলা চলে। এই শৈলীতে তরন্নুম ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশি খোলে, শিল্পীর ওস্তাদি প্রকাশ পায়। এতে বাদ্যযন্ত্রের ভূমিকাও যথেষ্ট। মুজরো ঢঙের গজল মানে এই খুনি গজল। বেগম সাহিবা এই ঢঙের গজলেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

একটা কথা তাবড় তাবড় শিল্পীরাও মাঝে মাঝে ভুলে যান যে গজল গাওয়ার সময় মীড়ের ওঠানামা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হয়। মীড়টা যেখান থেকে শুরু করে যেখানে গিয়ে শেষ হয়—একটা নির্দিষ্ট সময়ে, সেই সময়জ্ঞান—এটা একটা মস্ত বড়ো বিবেচ্য বিষয়। বেগম সাহিবা এই ধরনের জ্ঞানী ছিলেন। শুধু স্ববিরোধ নয়, তার সঙ্গে লয়বোধেরও একটা সামঞ্জস্য থাকা চাই। লয়বোধহীন গজলের কোনো দাম নেই।

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ বলেছেন—যে সমস্ত সৃষ্টি কোনো সংগীতের মধ্যে স্বর দিয়ে হয়ে থাকে, সেখানে লয়ের সামঞ্জস্য বিধান অত্যন্ত আবশ্যিক। নইলে সৃষ্টি নিরর্থক। লয়বোধ গণিতশাস্ত্রের মতো কোনো স্থির নিশ্চিত ব্যাপার নয়। অঙ্ক কষে সেটা বোঝানো অসম্ভব। এক অর্থে গানের গতিকে বোঝানোর ক্ষমতাকেই লয়বোধ বলা যায়। ইংরেজিতে যাকে অনুভূতি-স্পেস বলে,—তা কি লিখে বোঝানো যায়? সে গতিবোধ বা স্পেস একটা মেধা, ইনটিউশন বা স্বতোঃলব্ধ জ্ঞান।[৮৮] অন্তরের গভীরে স্তরে স্তরে এই যে লয়ের অনুভূতি, অনুভূতি-জ্ঞান ও উপলব্ধি—এটা না থাকলে গজলের ভাবের প্রকাশই হয় না। এই অনুভূতি, কোনটা কতদূর যেতে পারে বা পারে না—বেগম অখতার ভালোভাবেই জানতেন। পরিমিতির সম্যক জ্ঞান তার মধ্যে পুরোমাত্রায় ছিল।

তাঁর গায়কীয় বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলব। লয়ের যে পথ বা যাকে বলে লয়ভঙ্গ, তা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এক, আধ, চার, একের আট, একের ষোলো এইরকম কিছু বুনিয়াদি ভাগ থাকে। কিন্তু মাত্রাগুলিই সব নয়। শিল্পী ওইসব ভগ্নাংশ নিয়ে যখন গজল গান তখন তার মধ্যে একটা ছবিও আঁকেন—যা রাগের প্রতিকৃতি।এই ভগ্নাংশ আসে সৌন্দর্যবোধ থেকে। এ-কথা অনস্বীকার্য যে শ্রোতারা আজও বেগম সাহিবাকে স্মরণ করে তাঁর সুরেলা টেনে তোলার স্বরকাজ ও অস্থায়ী অন্তরার পর সর্পিল গতিতে বিলম্বিত বিহার-এর বিশেষত্বের জন্যেই। কিন্তু তাঁর স্বরজানের মোহিনী জাদুটা থাকত একটি মাত্র স্বরে—ওপরের ষড়জে। সেই ষড়জ কানে এসে পড়লেই সমস্ত কাজকর্ম, কোলাহল, কথাবার্তা, গুনগুনের একশেষ—

> ‘অয় মোহব্বৎ তেরে অনজাম পে রোনা আয়া
> জানে ক্যুঁ আজ তেরে নাম পে রোনা আয়া।’

বুকের ভেতর কান্না গুমরে ওঠে। এই গজলের শায়র শকীল আজ বেঁচে নেই, আর এটিকে যিনি চোখের জলে ভিজিয়ে গেয়েছিলেন সেই বেগম সাহিবাও ইহলোকে নেই। কিন্তু তীর্থে যারা যেতে পারে না তারা তীর্থ-ফেরত বন্ধুদের আলিঙ্গন করেই তীর্থের স্বাদ মেটায়। আমাদেরকেও তেমনি আজ ঘ্যাসঘেসে রেকর্ডে বেগম সাহিবাকে শুনে তার গায়ে মমতার হাত বুলিয়ে আবার সযত্নে তুলে রাখতে হয়। ব্যথা পাই? থাক সে-কথা। এখন উদ্ধৃত করি মীর তকী মীরের লেখা একটি গজল, যেটি আমার মনে হয়—বেগম অখতারের গাওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ গজল—

> ‘উল্টী হো গয়ীঁ সব তদবীরেঁ, কুছ ন দওয়া নে কাম কিয়া
> দেখা, ইস বিমারি-এ-দিল নে, আখির কাম তমাম কিয়া।
> অহদে-জওয়ানী রো-রো কাটী, পীরী মেঁ লী আঁখেঁ মুঁদ
> য়্যানী রাত বহুত থে জাগে, সুবহ হুই আরাম কিয়া।
> নাহক হম মুজবুরোঁ পর, য়্যহ তোহমত হ্যয় মুখতারী কী
> চাহতে হ্যঁয় সো আপ করে হ্যঁয়, হমকো অবস বদনাম কিয়া।
> য়্যাঁ কে সুপইদ-ও-সিয়াহ মেঁ হমকো, দখল জো হ্যয় সো ইতনা হ্যয়
> রাত কো রো-রো সুবহ কিয়া, অওর দিন কো জুঁ তুঁ শাম কিয়া
> ‘মীর’ কে দীন-ও-মজহব কো অব পুছতে ক্যা হো, উননে তো
> কশকা খঁইচা, দ্যর মেঁ ব্যয়ঠে, কব কা তর্ক ইসলাম কিয়া।

বেগম অখতারের সমীপকালীন তালাৎ মাহমুদের (২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪-৯ মে ১৯৯৮) গজলও বেশ জনপ্রিয় ছিল। আজকের বহু ঠাকুরদার কৈশোর ও যৌবনকে ভরিয়ে রেখেছিল তালাৎ তাঁর বলিষ্ঠ ও পরিচ্ছন্ন কণ্ঠ এবং অনুপম গায়কী দিয়ে। তাঁর গজল ছিল জীবন ও প্রকৃতির সমন্বয়—‘বাস্তবকল্প প্রতিরূপ’। নীরব শেরকে মুখর করতে তাঁর জুড়ি ছিল না—

> ‘ম্যঁয় তো পরেশাঁ হো গয়া তুমহারী ইশকবাজী সে
> অব ছোড়ো ভী দামন, মুঝে বাহর জানে দে।’

এটি যদি মামুদ না গাইতেন তবে আমরা জানতেই পারতাম না, নবাব ওয়াজিদ আলির এক আত্মীয় ইয়াসিন আলি, যিনি মেটিয়াবুরুজের এক জীর্ণশীর্ণ প্রপিতামহ বাড়ির মালিক, কিছু গজল লিখেছিলেন। মামুদের গায়কীর প্রধান খাসিয়ৎ ছিল ভাবলেশহীন কথা ও দরদ ঢেলে গাওয়া। তাঁর গানেই ছিল এক ধরনের ভাবময়তা।তাঁর এক-একটি গজল স্পর্শকাতর ফুলের মতো—সেটি সুন্দর, সুবাসিত—কিন্তু ছুঁলেই ঝরে যাবে। এই বিশেষত্বের কারণে মামুদকে আজও ভোলা শক্ত। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক নির্মলা অরুণ কিংবা মুসদ্দিদ নিয়াজীকে ভুলে যাওয়া হয়েছে সহজ।

অন্যদিকে, বেগম অখতারের ঢঙে গজল গেয়ে নাম করেছেন এরকম শিল্পীর সংখ্যা অগণন। বম্বের শোভা গুরটু (৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫-২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪) তাঁর উপযুক্ত শার্গিদ। শোভার গলায় ক্ষমতা ছিল, গায়নে ছিল বিশিষ্ট উপশাস্ত্রীয় গায়কীর তালিম। অবশ্যি গজলের ভাষায় তেমন দখল ছিল না, যা মাঝে মাঝে কানে লাগত। এই দোষ থেকে মুক্ত হতে পারলে, অমন গলা ভারত-পাকিস্তানে আর দ্বিতীয়টি ছিল না। রাজ খোসলা নির্দেশিত তথা লছমীকান্ত-প্যারেলালের সুরারোপিত ১৯৭৮ সালের হিট ছবি 'ম্যয় তুলসী তেরে আঙ্গন কী' ছবিতে শোভার মুজরো ঢঙের গজল 'সইঁয়া রুঠ গয়ে ম্যঁয় মনাতী রহী' যাঁরা শুনেছেন এ মন্তব্যের তাৎপর্য তাঁরা বুঝবেন।

বেগম অখতারের বিশিষ্ট গায়কীর অবিকল ছাব্বা শোনা যায় জরিনা বেগমের আসরে। জরিনার বিখ্যাত গান 'আজ নহীঁ তো কল হ্যয় আতা মেরে পাস'-এর মুখটা হুবহু বসিয়ে দেওয়া হয়েছে অখতারের গাওয়া 'ওয়াফাওঁ কে বদলে জফা কর রহে হ্যঁয়'-এর মুখে। একই ভাবে অখতারের কণ্ঠস্বর সমেত গায়কী ভেসে উঠতে চায় মধুরাণী দেবীর জনপ্রিয় গান 'হমে তো আপ দিওয়া বনা দিয়ে'-এর ভেতর থেকে।

বেগম অখতার যখন সেবার কলকাতার মেহফিলে গাইছিলেন, তাঁর পেছনে বসে তানপুরায় গলা মিলিয়ে তাঁকে গানে সহযোগিতা করছিলেন এক নজরকাড়া সুন্দরী তরুণী। দর্শকেরা তাঁকে ক্রমান্বয়ে ভুল করছিলেন বেগমের কন্যা বলে। সেই সুন্দরীটি ছিলেন আজকের বাঈজীদের সমাজে প্রতিষ্ঠায় ব্রতী রীতা গাঙ্গুলী (জন্ম ১৯৪০)। গর্ভে ধারণ না করলেও রীতা ছিলেন বেগমের কন্যার মতোনই। 'সিদ্ধেশ্বরী দেবীর এই ছাত্রীটিকে বেগম নিজে গিয়ে চেয়ে এনেছিলেন নিজের গানের সঙ্গে তালিম দেবেন বলে। যেমন করে তারও বছর কয়েক আগে সিদ্ধেশ্বরী চেয়ে নিয়েছিলেন রীতাকে কথক গুরু শম্ভু মহারাজের কাছ থেকে। এই সৌভাগ্য কজন সংগীত শিক্ষার্থীর হয়?'[৮৯] কলকাতার প্রৌঢ় মানুষের মনে এখনও স্মৃতি আছে বেগমের পাশে বসা তরুণী রীতার দড় কণ্ঠধ্বনির, ত্রিসপ্তকব্যাপী সুরেলা চলাচলের, ঠুংরির অনবদ্য মেজাজের, গজলের উর্দুর চোস্ত উচ্চারণের, শিল্পীসুলভ মগ্ন চোখের। রীতা গাঙ্গুলী বেগম অখতারের একনিষ্ঠ অনুগামিনী ও আজকের ফিলমি গজলের উগ্র বিরোধী—'আজকের অধিকাংশ শিল্পীরা তো উর্দু উচ্চারণই জানেন না, তাঁদের গান সুরেলা হোক, জনপ্রিয় হোক, গজল হবে কেন? গজলের সঙ্গে ফিল্মি গানের তাহলে তফাত থাকল কই?' মেহফিলে গানের জটিল জায়গায় সুর ধরতে বলে রীতাকে মস্ত চ্যালেঞ্জের মধ্যে নিক্ষেপ করতেন বেগম অখতার। রীতা তাতে জয়ী হতেন। বেগম আজ নেই, কিন্তু রীতার গজলে এখনও তিনি জীবিত।

বেগম অখতারের উচ্চারণ, ভঙ্গি, সুর ও গায়কী রক্তের মতোই চলে এসেছে তাঁর আর এক কন্যাসমা শিষ্যা শান্তি হীরানন্দের (১৯৩২-১০ এপ্রিল ২০০৭) মধ্যে। বেগম অখতারের কাছে উপশাস্ত্রীয় সংগীতের প্রাথমিক তালিম, পরে অন্ধশিল্পী ইন্দিরা কোহলী ও এজাজ হুসেন খাঁয়ের তালিম—শান্তি তাঁর গানে তিন গুরুর তিন শিক্ষারই ত্রিবেণী সংগম ঘটিয়েছেন। তাঁর গজল পাকিস্তানেও বেশ জনপ্রিয়। সে-দেশের বিখ্যাত গজল গায়িকা ইকবাল বানো ও ফল্লিদা খাতুনের মতে ভারতবর্ষে এই সেদিন পর্যন্ত মজলিশি গজল একমাত্র শান্তিই জিইয়ে রেখেছিলেন। সুখের কথা, শান্তি কখনো বাজারি গজলের স্রোতে ভেসে যাননি।

সেই রাজন্যপোষিত যুগ আর নেই। মালকাজান আগ্রাওয়ালী, গওহরজান, ছপ্পন ছুরি, কমলা ঝরিয়া, বেগম আখতারের দিনও ফুরিয়েছে। গজল গানে এখন অন্য সুর, অন্য রং। এখন গজল শুধু মেহফিলের

গান নয়। এখন গজল একটা ক্রেজ—একটা ফ্যাশন।

এ-কথা বুঝিয়ে দরকার নেই যে সাধারণ মানুষই সত্যিকারের অসাধারণ। অন্তত রুচির দিক থেকে। আজ একরকম, কাল আর এক। বেগমের গানে এখনকার ছেলেদের মন ভরে না, অনেকে তাঁর নামই শোনেনি। যারা প্রথমে কিশোর-আশার মৌতাতে বুঁদ হয়ে ছিল তাদেরও মনটা হেজে গেছে ওই পচা লিরিক আর বাসি গলায়। তাদের দরকার নতুনত্ব—সে যাই হোক না কেন, নতুন হওয়া চাই। সংগীতের কর্মকর্তারাও তাদের মন ভরাতে মাঝেমধ্যে বাজারে ছাড়ছেন 'নতুন কিছু'। সাধারণ মানুষের উদ্ভট খেয়ালের দৌলতে পঞ্চদশী নাজিয়া হাসান প্ল্যাটিনাম গার্ল। মোদ্দা কথা, মালটা নতুন হওয়া চাই—ভালো লাগলে ভালো, খারাপ লাগলে নো কোশ্চেন।

গজলকে ড্রিম ফুলফিলমেন্টের কাজে লাগাতে আশির দশকের মাঝামাঝি (১৯৭৬) এক মস্ত বড়ো পথ দেখাল জগজিৎ-চিত্রা সিং জুটির 'দ্য আনফরগেটাবলস'। হিন্দি ফিলম অহর্নিশ যে স্বপ্নরাজ্যের চাবি ঘোরায়, সেই চাবিকাঠি ফিলমে ছাড়াই প্রথম রপ্ত করল একটি এল পি রেকর্ড। এর পর গজলকে আর রাস্তা বাতলে দিতে হয়নি, সে নিজের খাল নিজেই কেটে চলল।রাজকুমার-ইন্দ্রাণী, রাজেন্দ্র-লীনা, ভুপেন্দ্র-মিতালী, রূপকুমার-সোনালী, তালাৎ আজিজ, পঙ্কজ উধাস, অনুপ জলোটা, পিনাজ মসানি—সবাই উঠে পড়ে লাগলেন Ghazals Era গড়ার কাজে। শ্রোতাদের মন মজে গেল বাহারি গজলে। 'সাত সহেলিয়াঁ খড়ী' খড়ী ছাঁদের ছেঁদো গান তারা আর নেবে না—জগজিৎ-পঙ্কজের মাধ্যমে সেই প্রতিবাদ তাদের। শহরে তো বটেই, শহরতলী আর গ্রামেও টেপ রেকর্ডারে ক্যাসেট ফাঁসিয়ে লোকে গজল শুনছে। জিনস, খেলোয়াড় গেঞ্জি, চার্মস, বিলিতি লাইটার, ব্রুস-লী কিংবা অমিতাভের ছবির মতো এখন 'হর শাম গজল কে নাম'।

গজল কিন্তু একদিনে ক্রেজ হয়নি। একটা হিসট্রি আছে। সত্তর দশকের গোড়ার দিকে, যখন সায়গলের মার্জিত ও পরিশীলিত গজলের রেশ পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি এবং যখন বেগম অখতার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত—সেই সময় মেহেদি হাসন (১৮ জুলাই ১৯২৭-১৩ জুন ২০১২) প্রথম ভারতে আসেন। অবশ্য, জন্মসূত্রে মেহদি হসন ভারতেরই। রাজস্থানের ঝুঁঝনুঁ জেলার লুণা গ্রামে জন্ম। বংশের পাঁচটি প্রজন্ম ইতিপূর্বে কলাবন্ত ঘরানার সংগীতের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সংগীতে মেহদির প্রাথমিক শিক্ষা পিতা উস্তাদ আজিম খান আর কাকা উস্তাদ ইসমাইল খানের কাছে। ভারত-বিভাজনের পর পরিবারটি চলে যায় পাকিস্তানে। সেখানে মেহদি কিছুকাল একটি সাইকেল সারাইয়ের দোকানে কাজ করেন, পরে মোটর মেকানিকেরও চাকরি করেন। কিন্তু গানের প্রতি তাঁর যে জুনূন, তা কিন্তু হৃদয়ে রয়েই গেছিল। ভারতে আগমনের আগেই মেহেদি খুলী গজলের ওপর এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে পাকিস্তানে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ভারতে তখনও স্থায়ী মতলাকে তালবদ্ধ করে খুলী গজল গাওয়ার প্রচলন ছিল। এই রীতিতে অন্তরা মিসরা গাওয়ার সময় তাল পুরোপুরি থামিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু মেহদি যে প্রয়োগটা করেছিলেন তাতে তাল থামে না—নিরন্তর চলতে থাকে। এই পদ্ধতিতে তালের বাইরেও শিল্পী নিজের মুনশিয়ানা প্রকাশ করতে পারেন। পাকিস্তানে গুলাম আলির মতো উচ্চাঙ্গ সংগীতের শিল্পীও এই শৈলীতে গজল গেয়েছেন এবং আমাদের জগজিৎ সিংয়ের খ্যাতি এরই জন্যে।

পাকিস্তানি গজল গায়কীতে তখন তিনটি নাম—মেহদি হাসন, গুলাম আলি এবং ফরিদা খানুম। মেহদির গলা অদ্ভুত মিষ্টি, সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ বোলবাণীর সমন্বয়ে ছন্দের বৈচিত্র্যে লয়ের ওপর অধিকার—সব আছে তাঁর। ত্রিসপ্তকে অনায়াস সঞ্চারী গতির সৌন্দর্যই বা কম কীসের? কণ্ঠের ওটানামায় প্রকাশ পায় তার শিল্পসৃষ্টির নৈপুণ্য। তাঁর অজস্র জনপ্রিয় গজলের মধ্যে একটির উদ্ধৃতি নিচে দিলাম।এই সুন্দর গজলটির রচয়িতা আহমদ ফরাজ—

'অজব জুনুনে মুসাফত মেঁ ঘর সে নিকলা থা
খবর নহীঁ হ্যায় কি সূরজ কিধর সে নিকলা থা।
য়্যই কওন ফির সে উনহেঁ রাস্তোঁ মেঁ ছোড় গয়া
অভি-অভি তো অজাবে-সফল যে নিকলা থা।

য়্যে তীর দিল মেঁ মগর বেসব্ব নহীঁ উতরা
কোই তো হর্ফ লবে-চারগার সে নিকলা থা।
উও ক্যয়সে অব জিসে মজনু পুকারতে হ্যঁয় ফরাজ
তেরী তরহ কোই দিওয়ানা ঘর সে নিকলা থা।'

দেশ ভাগ হলে মানুষের গমনাগমন ব্যাহত হয় মাত্র, শিল্পীর কণ্ঠস্বর সীমান্তের চৌহদ্দি লংঘন করেও গুঞ্জরিত হতে থাকে। মেহদি হসনের মখমল কণ্ঠ অদ্যাপি সীমান্তের দুই পাশে অনুরণিত—

'দিল কী বাত লবোঁ পর লা কর অব হম দুখ সহতে হ্যঁয়
হম নে সুনা থা ইস বস্তী মেঁ দিল ওয়ালে রহতে হ্যঁয়।'
'য়ে মানা জিন্দগী হ্যয় চার দিন কী
বহুত হোতে হ্যঁয় য়্যারো চার দিন ভী'
'দেখ তো দিল কি জাঁ সে উঠতা হ্যয়
য়ে ধুয়াঁ সা কহাঁ সে উঠতা হ্যয়'

গুলাম আলির জন্ম ৫ ডিসেম্বর ১৯৪০ পাকিস্তানের সিয়ালকোটে। গুরু ছিলেন উস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খান। গুলাম আলি গজলে সচরাচর স্বয়ং সুরারোপ করেন। এছাড়া অন্যের সুরেও বেশ কিছু গজল গেয়েছেন। গুলাম আলির লোকপ্রিয়তা তাঁর চটুল অঙ্গের গজলের জন্য। কিন্তু তিনি শাস্ত্রীয় সংগীতে পাকা ওস্তাদি ভরাট গলায় উঁচুদরের নাট্যময়তা বিদ্যমান। রাগরূপ উন্মোচনে যন্ত্রপাতির স্বর সমন্বয়ে যে আবেদন সৃষ্টি করেন গুলাম তা নিঃসন্দেহে মর্মস্পর্শী। মীড়ের টানে যে সূক্ষ্মতর স্বরধ্বনির প্রয়োগ নৈপুণ্য অসামান্য দক্ষতায় বিভাসিত হয়, মধুকণ্ঠে স্বরধ্বনির রেশ ধরে স্বরের বিচিত্র লীলার যে প্রকাশ ঘটে সেখানে তিনি অনন্য। রাগরূপের প্রকাশ বেদনায় গুলাম আলি যেন নিজেকেই প্রকাশ করতে চান। গজলের মকতা অংশে তিনি কণ্ঠে বেদনা বা দরদ ফুটিয়ে তোলার সমস্ত সম্ভাবনার শেষ সীমাটিকে বারবার ছুঁয়ে যান প্রদর্শনের জন্য নয়, অন্তরের প্রেরণার তাগিদে। 'চুপকে চুপকে রাত দিন আঁসু বহানা য়্যাদ হ্যঁয়' এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্যর মহম্মদ ইকবালের লেখা গুলাম আলির একটি শ্রেষ্ঠ গজল এখানে উদ্ধৃত করছি—

'কোই সমঝায়ে য়্যহ ক্যা রঙ হ্যয় ময়খানে কা
আঁখ সাকী কী উঠে নাম হো পয়মানে কা।
গর্মি-এ-শম্মা কা অফসানা সুননেওয়ালোঁ
রুখস দেখা হী নহীঁ তুমনে অভী পরওয়ানে কা।
কিসকো মালুম থী পহলে সে খিরদ কী কীমৎ
আলামে-হোশ পয় অহসান হ্যয় দিওয়ানে কা।
চশমে-সাকী মুঝে হর গাম পয় য়্যাদ আতী হ্যয়
রাস্তা ভুল ন জাউঁ কহীঁ ময়খানে কা।
অব তো হর শ্যাম গুজরতী হ্যয় উসী কুচে মেঁ
য়্যহ নতীজা হুয়া লাসেহ তেরে সমঝানে কা।'

'আজ জানে কী জিদ ন করো'—মশহুর পাকিস্তানি শায়র ফৈয়াজ হাশমীর লেখা এবং সোহৈল রাণার সুরবদ্ধ এই বিখ্যাত গানটি শোনেননি এমন শ্রোতা সম্ভবত নেই বলেই মনে হয়। গজলটি অনেকেই গেয়েছেন, এমনকি এদেশের আশা ভোঁসলেও গেয়েছেন; এবং গোল্ডেন লায়ন পুরস্কার বিজেতা মীরা নায়ারের 'মনসুন ওয়েডিং'-এও এটি ব্যবহৃত হয়েছিল; কিন্তু গজলটিকে প্রথম যিনি জনপ্রিয়তার উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছে দেন, তিনি 'কুইন অফ গজল' ফরিদা খানুম। ১৯২৯ সনে কলকাতায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ফরিদা। পাকিস্তানি মৌসিকীর দুনিয়ায় এঁর খ্যাতি মূলত গজলের কারণে হলেও ইনি দাদরা, খেয়াল এবং ঠুমরির জন্যও সুখ্যাত। গুরু ছিলেন উস্তাদ আশিক আলি খান। ১৯৫০ সালে ২১ বছর বয়সে একটি পাবলিক

কনসার্টের মাধ্যমে ফরিদার আত্মপ্রকাশ। ভারতে আসার আগে ইনি পাকিস্তান ও কাবুলে গজল গেয়ে প্রভূত নাম কুড়িয়েছিলেন।

পাকিস্তানি গজলিয়াদের মধ্যে প্রথম ভারতে এসেছিলেন মেহেদি হাসন। তারপর সাবিরী কাওয়াল, ওস্তাদ সলামৎ আলি খাঁ, গুলাম আলি, ফরিদা খানুম আরও অনেক শিল্পী। সত্তর দশকের দোর গোড়ায় মেহেদির সংবর্ধনা ও সমর্থনেই ভারতবর্ষে বাহারি গজলের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। ভারতকে নিজের সুরে মাতিয়ে দিয়ে গেলেন মেহেদি, তার পরেই দেখতে দেখতে গজলের সুবাসে ভরে গেল ভারত। এদেশীয় গায়ক-গায়িকারা অনতিবিলম্বে উঠেপড়ে লাগলেন মেহেদির সুরে সুর মেলাতে।[৯০]

তরুণ জগমোহন সিং ধিমান ওরফে জগজিৎ সিং (৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১-১০ অক্টোবর ২০১১) তখন পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ ডিগ্রি নিয়ে প্রখ্যাত হাস্যাভিনেতা ওমপ্রকাশের নিমন্ত্রণে সদ্য বম্বে এসেছেন। হোটেল সিঙ্গার হিসেবে কিছুটা খ্যাতিও পেয়েছেন। কিন্তু সে খ্যাতি তো ঠুনকো, তাই তিনি তৃপ্ত ছিলেন না। তিনি সিনেমায় গাওয়ার সুযোগ খুঁজছিলেন, কিন্তু কেউ তাঁকে সে-সুযোগ দেননি। সেই দুঃখ তিনি ভুলতে পারেননি—

> ‘জানে কে সবকুছ, কুছ ভী ন জানে হ্যঁয় কিতনে অনজানে লোগ
> বক্ত পর কাম নহীঁ আতে য়ে অনজানে লোগ।’

গান ছেড়ে মডেলিংয়ে পেশা ধরলেন জগজিৎ। কিছু টাকা জমলে দু-একটা করে রেকর্ড বার করতে লাগলেন। ফিলমে চান্স পেলেন—বাসু চ্যাটার্জির ‘আবিষ্কার’ ছবিতে গাইলেন ‘বাবুল মোরা নৈহর ছুটো যায়’—লুফে নিল সাধারণ মানুষ। এরপর ‘নশীলী রাত’, ‘বহুরূপী’, ‘এক থী রাত’ ছবিতে গেয়েছেন। কিন্তু তবুও তৃপ্তি পাননি। কোনও এক প্রত্যাশিত ভোরের প্রতীক্ষায় তিনি জেগে রইলেন—

> ‘ইক ন ইক শম্মা অধর মেঁ জ্বলায়ে রখিয়ে
> সুবহ হোনে কো হ্যয় মাহওল বনায়ে রখিয়ে।’

এরপর জীবনে এলেন চিত্রা দত্ত ওরফে চিত্রা সোম। বিজ্ঞাপনের দুনিয়ায় দুজনের যে মোলাকাৎ হয়েছিল তা নিয়ে পৌঁছোল মনের দুনিয়ায়—

> ‘অপনে হাথোঁ কী লকীরোঁ মেঁ বসা লো মুঝকো
> ম্যঁয় হুঁ তেরা নসীব, অপনা বনা লো মুঝকো।’

প্রথম বিদেশ সফরের আগে, ১৯৬৯-এ বিয়ে হয়েছিল দুজনের। বিদেশে বিপুল জনসমর্থন লক্ষ করে ফিরে মেহেদি সন্নিধি জগজিৎকে আরও চৌকশ করে তুলল। বের হল প্রথম এল পি The Unforgetables রেকর্ডের প্রথম নগমা ওস্তাদি ঢঙে গাওয়া ‘বাত নিকলেগী তো দূর তলক জায়েগী’ বোদ্ধা শ্রোতা কখনও ভুলতে পারবে? রেকর্ডটির মাধ্যমে জগজিৎ যেন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন। বাস্তবিকই তিনি এই রেকর্ডটির মাধ্যমে গজল রেকর্ডের ইতিহাসে রেকর্ড করেছেন। লোকেরা লাইন দিয়ে ছুটেছে জগজিৎ এল পি কিনতে। The Unforgetables বাজারে নামার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় ৭০ হাজার কপি বিকিয়ে যায়। নন-ফিল্মি গানে ইতিপূর্বে এমনটা হয়নি। আশা বা কিশোরের মতো জনপ্রিয় শিল্পীরও নন-ফিল্মি রেকর্ড এত বিকোয়নি। লন্ডনের অ্যালবার্ট হলে লতার গাওয়া গান নিয়ে যে রেকর্ড হয়েছে তা ছ-সাত বছরে ৭০ হাজারের মতো কেটেছিল। ক্লাসিক্যাল বেস্ট সেলার রবিশঙ্করের এল পি ৫০-৬০ হাজারের বেশি কাটে না। লন্ডন-ফেরত মিউজিশিয়ান বিড্ডু ডিসকোর রিদম ও দোঁ-আঁশলা সুর দিয়ে নাজিয়া হাসনকে দিয়ে গাইয়েছিলেন ‘দিওয়ানে’ যা সতেরো দিনে ‘গোল্ড’ হয়েছিল, অর্থাৎ এক লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছিল এবং ‘প্ল্যাটিনাম’ অর্থাৎ দু’লক্ষ কপি নিঃশেষ হয়েছিল দু মাসে। কিন্তু সেটা পরের ঘটনা, তৎপূর্বে ‘শোলে’ এবং তরুণ জগজিতের এল পি সেই রেকর্ড কায়েম করেছিল। আজ জগজিৎই গজলের বেস্ট সেলার। সুর বা কথার বৈচিত্র্যই এই জনপ্রিয়তার একমাত্র কারণ নয়। তাঁর গলায় ছিল এক অদ্ভুত মিষ্টতা। স্বরসজ্জায় সহজ সৌন্দর্য, চমক সৃষ্টি করার কোনো চেষ্টা ছিল না। গলাবাজিও না। সুর যেন কোনো যুবতি নির্ঝরিণীর ফল্গু ধারা তা টলমল হয়ে

নদীর রূপ ধারণ করত। জগজিতের আওয়াজে ছিল একটা দরদ যা শ্রোতার বুককে আপ্লুত করার পক্ষে যথেষ্ট।[৯১]

তীব্র সময়ানুভূতিই জগজিতের জনপ্রিয়তার প্রধান ভূমিস্বর। তিনি জানতেন তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছে সাধারণ মানুষ এবং তাদের রুচি বড়ো চঞ্চলা। ক্যাসেট কিনে ভালো না লাগলে সেকেন্ড হ্যান্ড শপে ঝেড়ে দেবে। তাই জগজিৎ সদা সতর্ক, তৎপর আরও সমৃদ্ধ হতে। তাঁর স্বতন্ত্র পন্থা ও অভিন্ন অন্বেষায় দীর্ঘকাল সাথী ছিলেন তাঁর প্রেয়সী ও সহধর্মিনি চিত্রা সিং। চিত্রার গলায় একটা যৌবনের ঝাঁঝ আছে, যা লোকের মনকে ছোঁয়। গলায় এমন একটা দরদ আছে যা শ্রোতাদের বিদ্ধ করে। পাকিস্তানি গায়িকা নুরজাহাঁ বেগম চিত্রাকে বলেছেন 'জগজিতের পরছায়া'। চিত্রা জগজিতের সঙ্গে দেশ-বিদেশের সমস্ত প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁকে নিছক জগজিতের পরছায়া বলা অন্যায়। চিত্রা সোম জন্মসূত্রে বাঙালি, এবং কলকাতার। গজল, ক্লাসিকাল, ডিভোশনাল, ফোক সব ধরেনর গানই গেয়েছেন, কিন্তু গজলের জন্যই সত্তর-আশির দশকে তাঁর খ্যাতি তুঙ্গে পৌঁছয়। ১৯৬৮ সালে চিত্রা তাঁর পূর্বস্বামীকে ছেড়ে পরের বছর জগজিৎকে বিয়ে করেন। তারপর জগজিৎ-চিত্রা জুটি গজলের দুনিয়ায় জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে যায়। গজলের জগতে চিত্রাও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। তাঁর আওয়াজ ধারালো তরবারির মতো সূক্ষ্ম। হয়তো বা সেই তীক্ষ্ণ প্রবর কণ্ঠই ঝকঝকে তরবারির মতো আমাদের বুকে আমূল বসে যায়।

জগজিৎ-চিত্রার প্রসঙ্গ উঠতেই পাঁচকাহন হয়ে যায়।কথা শুরু করলেই বহুদূর পর্যন্ত গড়িয়ে যায়—

'বাত নিকলেগী তো দূর তলক জায়েগী
লোগ বেবজহ উদাসী কা সরব পুছেঙ্গে, উংলিয়াঁ উঠেঙ্গী।'

একদিন যাঁরা ছিলেন সাধারণ শিল্পী-দম্পতি, ক্রমে ক্রমে আজ তাঁরা গজল স্টার—

'সরকতী জায়ে হ্যয় রুখ সে নকাব আহিস্তা-আহিস্তা
নিকলতা আ রহা আফতাব আহিস্তা-আহিস্তা।'

গালিব থেকে শুরু করে আধুনিকতম সর্বস্তরের কবির গজল এঁদের গলায়। জগজিৎ কখনও শক্ত ভাষার গজল গান নি, কেননা 'তাতে শ্রোতা মেলে কম'। জনপ্রিয়তার অনিবার্য শর্তই হল 'পাবলিক রেসপন্স', সুতরাং চাই সহজ সরল ভাষার শের।জগজিৎ একবার আমাকে বলেছিলেন—'পাবলিক আমার প্রেরণা, তাঁরা না থাকলে সব বেকার'—

'তুম নহীঁ, গম নহীঁ, শরাব নহীঁ
এ্যয়সী তনহাই কা জবাব নহীঁ।
উও করম গলিয়োঁ পর গিনতে হ্যঁয়
জুল্ম কা জিনকে কুছ হিসাব নহীঁ।

সুরকার হিসেবেও জগজিৎ শাশা, আক্রান্ত, প্রেমগীত, ম্যঁয় অওর মেরী তনহাই প্রভৃতি ছবিতে নাম কুড়িয়েছেন। প্রেমমূলক গীতে তাঁর সুর অনবদ্য। উদাহরণত তাঁর কতিপয় জনপ্রিয় ফিল্মি-গজল—

'কওন কহতা হ্যয় মুহব্বত কী জুবাঁ হোতী হ্যয়
য়্যে হকীকৎ তো নিগাহোঁ সে বয়াঁ হোতী হ্যয়।'
'তুমকো দেখা তো খয়্যাল আয়া
জিন্দগী ধুপ, তুম ঘনা সায়া'
'আজ ফির দিল নে এক তমন্না কী
আজ ফির দিল কো হম নে সমঝায়া।'
'ঝুকী ঝুকী সী নজর বেকরার হ্যয় কি নহীঁ
দবা দবা সা সহী দিল মেঁ প্যার হ্যয় কি নহীঁ'
'তুম ইতনা জো মুস্করা রহে হো

ক্যা গম হ্যয় জিসকো ছুপা রহে হো'
'হোঠেঁ সে ছু লো তুম
মেরা গীত অমর কর দো
বন জাও মীত মেরে
মেরী প্রীত অমর কর দো'

তবে, এ-কথা ঠিক, ভারতীয় গানের জগতে এ-যুগে গজলের যে শীর্ষস্থানীয় জনপ্রিয়তা, এতখানি সম্ভব ছিল না যদি না হিন্দী চলচ্চিত্রে গজলের তাশপোশি ঘটত। আর, এ-কথা আগেই বলেছি, গজলের জাদু হিন্দী সিনেমার জগতে সেঁধ মেরেছিল শতেক বছর আগেই, ভারতীয় সিনেমার প্রায় জন্মলগ্নেই, যা ছিল একান্ত স্বাভাবিক। কেননা গজলের অভিনব ও বিস্ময়কর দুনিয়ায় রয়েছে একাধারে সৌন্দর্যের ঐন্দ্রজালিক রূপক ব্যঞ্জনা, বাস্তবতা, পরাবাস্তবতা এবং সাংগিতিক সুরময়তা। এই চতুর্বিধ লাক্ষণিক কারণেই সেকাল থেকে একাল অবধি হিন্দী ছবির জগতে গীতকার, সুরকার তথা গায়ক-গায়িকাদের কাছে গজলের সম্মানীয় আসনটি আনুপূর্ব লোভনীয় থেকেছে এবং তার ধুরন্ধর প্রয়োগের মুন্সিয়ানাও তাঁরা দেখিয়েছেন। হিন্দী ছবিতে একদিকে যেমন মির্জা গালিব, মীর তকী মীর, দাগ, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, জোশ মলিহাবাদী, ইকবাল, ফিরাক গোরখপুরী, জাঁ নিসার আখতার, কৈফ ভোপালী, সাহির লুধিয়ানভি, মজরুহ সুলতানপুরী, শাহরিয়ার, মুজতর খৈরাবাদী, কৈফি আজমী, নাসির কাজমী, শকীল বদায়ুনী, আহমদ ফরাজ, মহেন্দ্র সিং বেদী, রাজ ইলাহাবাদী, হসরত মোহানী, নিদা ফাজলী, জিগর মুরাদাবাদী, হসন কমাল, গুলজার, জাভেদ আখতার প্রমুখের মতো বলিষ্ঠ ও স্বনামধন্য শায়ররা একের পর এক সুন্দর সুন্দর গজল উপহার দিয়েছেন, তেমনি আজকের স্বল্পনামা লিরিসিস্টরাও নিজেদের পরিচিতি বৃদ্ধির জন্য পরিশ্রম করে চলেছেন। অন্যদিকে, গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে, বেগম আখতার, কমলা ঝরিয়া, কুন্দনলাল সায়গল, নূরজাহাঁ, মেহেদি হসন, উস্তাদ আমানত আলি খান, ফরিদা খানুম, শোভা গুরটু, মহম্মদ রফি, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, গুলাম আলি, জগজিৎ সিং, পংকজ উধাস, পিনাজ মাসানী, ভূপেন্দ্র, মুন্নি বেগম, ইকবাল বানো, উস্তাদ নুসরৎ ফতেহ আলি খান, আগা শাহিদ আলি, টিনা সানি, তালাৎ আজিজ এবং এমনি আরও অসংখ্য উঁচুদরের শিল্পী গোড়া থেকেই হিন্দী ছবিতে গজল গেয়ে নিজেদের এক-একটি স্বতন্ত্র আসন গড়ে তুলেছেন।

ইকবাল বানো জন্মেছিলেন দিল্লিতে, ১৯৩৫ সনে। কিন্তু পাকিস্তানেই তাঁর জীবন ও মৌসিকীর উত্তরণ। মৃত্যুও লাহোরে। সেমি-ক্লাসিকাল শিল্পী ইকবাল বানো ঠুমরী, দাদরা ও খেয়ালও গেয়েছেন, কিন্তু তাঁর মূল পরিচয় গজল গায়িকা হিশেবে। ইকবালের জীবনের শ্রেষ্ঠ গজলের একটি শের এখানে তুলে দিচ্ছি

'হম দেখেঙ্গে, লাজিম হ্যয় কি হম ভী দেখেঙ্গে
ওহ দিন কি জিসকা ওয়াদা হ্যয়, জো লৌহ-এ-অজল মেঁ লিকখা হ্যয়।'

আশা ভোঁসলে ভারতীয় গানের ভুবনে একটি স্বতন্ত্র নাম। ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ সনে জন্ম, হিন্দী বাংলা, মারাঠী, গুজরাটি, পাঞ্জাবী, ভোজপুরী, তামিল, মালয়ালাম, ইংরেজি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় নানান আঙ্গিকের ১৬ হাজারেরও বেশি গান গেয়েছেন। গজলের স্বতন্ত্র অ্যালবাম রয়েছে আশার, এ-বাদে হিন্দী ছবিতেও বহু উচ্চাঙ্গের গজল গেয়েছেন। তাঁর অজস্র ফিল্মী ও নন-ফিল্মী সদাবাহার গজলের মধ্যে 'আজ জানে কী জিদ ন করো', 'দয়ার-এ-দিল', 'ইন আঁখো কী মস্তী', 'খালি হাথ শাম আয়ী', 'ইয়ুঁ সজা চাঁদ', 'লোগ কহতে হ্যঁয়', 'কিসী নজর কো তেরা', 'সাথী রে তুম ন জানা', 'জব সামনে তুম আ জাতে হো', 'রাত চুপ চুপ'—হামেশা জনপ্রিয়তার তুঙ্গে থেকেছে। এখানে উদ্ধৃত করি আশাজীর গাওয়া 'উমরাও জান' ছবির সেই বিখ্যাত গজলটি

'ইন আঁখোঁ কী মস্তী কে মস্তানে হজারোঁ হ্যঁয়
ইন আঁখোঁ সে বাবস্তা অফসানে হজারোঁ হ্যঁয়
ইক তুম হী নহীঁ তনহা, উলফৎ মেঁ মেরী রুসওয়া
ইস শহর মেঁ তুম জৈসে দীওয়ানে হজারোঁ হ্যঁয়

ইক সির্ফ হম হী ময় কো আঁখোঁ সে পিলাতে হ্যঁয়
কহনে কো তো দুনিয়া মেঁ ময়খানে হজারোঁ হ্যঁয়
ইস শম্ম-এ-ফরোজাঁ কো আঁধি সে ডরাতে হো
ইস শম্ম-এ-ফরোজাঁ কে পরওয়ানে হজারোঁ হ্যঁয়'

ভূপেন্দ্র সিংয়ের জন্ম পাটিয়ালার শিখ পরিবারে ৮ এপ্রিল ১৯৩৯। এঁর পরিচয় মূলত হিন্দী ফিল্মের পার্শ্বগায়ক আর সুরকার হিশেবে। ভালো গিটারিস্টও তিনি। স্ত্রী মিতালীও সুশিল্পী। দুজনে মিলে গানের জগতে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন। ১৯৬৮ সুরকার মদনমোহন অল ইন্ডয়া রেডিওতে ভূপেন্দ্রর গান শুনে তাঁকে দিল্লি থেকে বম্বে ডেকে নেন। প্রথম ছবি 'হকিকৎ', যাতে তিনি একটি গজলই গান 'হোকে মজবুর মুঝে উসনে বুলায়া হোগা'। গোড়াতেই হিট। যদিও ভূপেন্দ্রর তাতে পরিচিতি তৈরি হয়নি। এর পর তিনি স্প্যানিশ গিটার আর ড্রাম সহযোগে কতিপয় গজল পেশ করেন। বেরোয় দ্বতীয় এল-পি, সবার দৃষ্টি কুড়োতে সফল হন। 'দিল ঢুঁঢ়তা হ্যয়', 'দো দিওয়ানে শহর মেঁ', 'নাম গুম জায়েগা', 'করোগে য়্যাদ তো' ইত্যাদি নগমার পাশাপাশি তাঁর অজস্র গজলও শ্রোতার মুখে মুখে ফেরে। যেমন—

'দরো-দিওয়ার পে হসরত সে নজর করতে হ্যঁয়,
খুশ রহো অহলে-বতন হম তো সফর করতে হ্যঁয়।'

সুফি ঘরানার উস্তাদ নুসরৎ ফতেহ আলি খানকে (জন্ম ১৩ অক্টোবর ১৯৪৮, পাঞ্জাবের ফৈসলাবাদে) বলা হয়েছে 'শহংশাহ-এ-কওয়াল'। কিন্তু কাওয়ালির পাশাপাশি গজল ও ফিউজনের জন্যও তাঁর খ্যাতি। তাঁর একটি বিখ্যাত গজল

'উনকী তরফ সে তর্ক-এ-মুলাকাত হো গঈ
হম জিসসে ডর রহে থে ওহী বাত হো গঈ'

অনুপ জলোটার মূল পরিচয় 'ভজন সম্রাট' (জন্ম নৈনিতালে, ২৯ জুলাই ১৯৫৩) হলেও একসময় কিছু হালকা ছাঁদের গজল গেয়েও এক শ্রেণীর শ্রোতাদের কাছে হাততালি কুড়িয়েছিলেন। 'রাত গহরায়ী হ্যয়', 'তকদীর' ইত্যাদি তাঁর গজলের অ্যালবাম। ভারতীয় গজলের দুনিয়ায় অনুপ জলোটা ও পংকজ উধাসের উত্থান একই সময়ে, কিন্তু এই শৈলীতে পংকজের সমৃদ্ধি ও অ্যাচিভমেন্ট অনেক বেশি। পংকজ উধাসের জন্ম গুজরাটের জেতপুরে, ১৭ মে ১৯৫১। ১৯৮০-৮১ সালে রিলিজ পাওয়া দুটি অ্যালবাম 'আহট' এবং 'মুকররে'র মাধ্যমে প্রথম পরিচিতি। এযাবৎ মোট ২৮টি অ্যালবাপ রিলিজ পেয়েছে। প্রথম সুপারহিট গজলটি ছিল মহেশ ভট্টের 'নাম' ছবিতে গাওয়া 'চিঁটঠি আয়ী হ্যয়'। তাঁর দুটি জনপ্রিয় গজলের উল্লেখ এখানে করছি

'সব কো মালুম হ্যয় ম্যঁয় শরাবী নহীঁ
ফির ভী কোঈ পিলায়ে তো ম্যঁয় ক্যা করুঁ'
'শরাব চিজ হী এ্যয়সী হ্যয় না ছোড়ী জায়ে
য়ে মেরে য়্যার কে জ্যয়সী হ্যয় না ছোড়ী জায়ে'

সমসাময়িক দিনে চন্দন দাসও গজল গাইয়ে হিশেবে যথেষ্ট মনোযোগের দাবিদার ছিলেন। তাঁর 'আ ভী জাও কে জিন্দগী কম হ্যয়, কল খাব মেঁ দেখা সখী ম্যঁয়নে পিয়া কা গাও রে, জব মেরী হকিকৎ জা জা কর, জব কোঈ ফয়সলা কিজিয়ে, সাথ ছুটেগা ক্যয়সে মেরা আপকা' ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত গজলগুলির অন্যতম। আরেকটি—

'কুছ তবিয়ত হী মিলী থী এ্যয়সী চ্যয়ন সে জীনে কী সুরত না হুঈ
জিসকো চাহা উসে অপনা না সকে জো মিলা উসসে মুহব্বত না হুঈ'

ছায়াছবির নেপথ্য গায়ক ও গজলিয়া হরিহরণ সম্পর্কে বিশদ আলোকনের অবকাশ আছে, তবে স্থানাভাবে সংক্ষেপেই বলি। ৩ এপ্রিল ১৯৫৫ তিরুবনন্তপুরমে জন্মেছিলেন। ক্যারিয়ারের গোড়ার দিকে বেশ কিছু কনসার্ট ও টিভি শো করেছিলেন। ১৯৭৭-এ প্রখ্যাত সুরকার জয়দেব 'গমন' ছবিতে গাওয়ার মাধ্যমে

প্রথম ব্রেক দেন হরিহরণকে। তিরিশটির বেশি গজলের অ্যালবাম রয়েছে তাঁর। বেশির ভাগই নিজের সুরারোপিত। গোড়ার দিকের একটি অ্যালবাম ছিল আশা ভোঁসলের সঙ্গে। হরিহরণের দু-তিনটি বিখ্যাত গজলের একটি করে শেরের উদ্ধৃতি দিই :

'দরো দিওয়ার পে শকলেঁ সী বনানে আয়ী
ফির য়ে বারিশ মেরী তনহাঈ চুরানে আয়ী'
'আজ ভী মেরে কদমোঁ কে নিশাঁ আওয়ারা
তেরী গলিয়োঁ মেঁ ভটকতে থে জহাঁ আওয়ারা'
'ময়কদে বন্দ করেঁ লাখ জমানে ওয়ালে
শহর মেঁ কম নহীঁ আঁখো সে পিলানেওয়ালে'

তালাৎ আজিজ (জন্ম ১১ নভেম্বর ১৯৫৬, হায়দরাবাদ) বেশ কয়েক দশক ধরে গজল গাইছেন। বাবা আবদুল আজিম খান ও মা সাজিদা আবিদ উভয়েই বিখ্যাত কবি। বাড়িতে গানেরও কদর ছিল। জগজিৎ সিং, জান নিসার আখতারের মতো বিখ্যাত গজলিয়ারা প্রায়ই আসতেন। গজলের প্রতি আকর্ষণ তখন থেকেই। আজিজের প্রাথমিক তালিম কিরানা ঘরানায় হলেও পরবর্তীকালে তাঁর অন্যতম গুরু হন মেহদি হসন। মেহদি প্রায়ই আজিজের মধুর কণ্ঠের বিশুদ্ধতার তারিফ করতেন। ফিল্মে গাওয়া তালাৎ আজিজের কয়েকটি বিখ্যাত গজল হলো 'জিন্দগী জব ভী তেরী বজম মেঁ লাতী হ্যয় হমেঁ' (উমরাও জান), 'ছিড়ী রাত বাত ফুলোঁ কী' (বাজার), 'আইনা মুঝসে মেরী' (ড্যাডি), 'না কিসী কী আঁখ কা নূর' (শরারৎ) ইত্যাদি।

গজলের রাজপথে গুজরাটি-কন্যা পিনাজ মশানির যাত্রা শুরু ১৯৮১ সালে। এযাবৎ রিলিজ পাওয়া অ্যালবামের সংখ্যা কুড়ি। বিখ্যাতগুলি হলো 'তু জী মেরা দিল তু হী মেরী জান', 'ধড়কন', 'আপকী বজম মেঁ', 'দিল মেঁ', 'আঁখোঁ মেঁ' ইত্যাদি। বহু ভাষায় গান গেয়ে বিখ্যাত রূপকুমার রাঠোরও (জন্ম ১০ জুন ১৯৭৩, মুম্বাই) গজলের জগতে এক সুবিদিত নাম। রূপ ও তাঁর সহধর্মিনী সোনালীর বেশ কিছু হিট গজলের অ্যালবাম রয়েছে।

আলোচনার একেবারে শেষে এসে মনে পড়ল এমন একজনের নাম, যাঁকে খুব কম লোকেই চেনে। তিনি গুজরাটের ওসমান মীর ওরফে 'ময়ংক' (জন্ম ২২ মে ১৯৭৪)। মানুষটা যেমন অন্য ধরনের, সংগীতক্ষেত্রে তাঁর কাজও একেবারে অন্য ধাঁচের। গ্ল্যামারের তো প্রশ্নই নেই। বেগম আখতারের গজলগুলিকে তিনি নতুন আঙ্গিকে উদ্ধার করেছেন। ওসমান ও তাঁর ছেলে আমির দায়রো মুসলমান হয়েও রামকথা গানে নিবেদিত, এবং সেই নিবেদনও এক অতুলনীয় নান্দনিক ঔৎকর্ষে উত্তীর্ণ। অবশ্য, এ ধরনের প্রতিভার কোনও মূল্য আজকের সমাস শনাক্ত করতে অপারক, এবং তা দিতেও পারে না। মুড়ি-মিছরি আজ এক হয়ে গেছে। ওসমানের বিখ্যাত গজলগুলির মধ্যে 'মুঝে তুম য়্যাদ আতে হো', 'য়্যু হী বে সব্ব', 'তেরী তো চাঁদ সিতারোঁ মেঁ বাত হোতী হ্যয়', 'হো জহাঁ মেঁ', 'দিল মেঁ এক লহর সী', 'জমানে মেঁ তেরে গুম কী', 'কিসী কা দর্দ ছুপানা' ইত্যাদি সবিশেষ উল্লেখনীয়।

আর একজন মাত্র তরুণ গজলিয়ার উল্লেখ করি, আসামের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী অঙ্গরাগ মোহন্ত ওরফে 'পাপন'। অসমিয়া ছাড়াও হিন্দী, বাংলা, মারাঠি আর তামিল ভাষায় গাইছেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত। ২৪ নভেম্বর ১৯৭৫-এ গুয়াহাটিতে জন্ম। আসাম তথা পূর্বাঞ্চলের ধর্মীয় গান সমূহকে ফিউজনের মাধ্যমে হাজির করেছেন পাপন। অসমিয়া ফিল্ম 'রামধেনু' সহ হিন্দী 'সাউন্ডট্র্যাক', 'আই অ্যাম কালাম' ও 'সিস্টেম'-এর মতো ব্যতিক্রমী তথা ভিন্নধর্মী ছবিগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন। নতুন অ্যালবাম 'দোস্ত বন বন কে' রিলিজ পেয়েছে ২০২১-এ। পাপনের গলায় মেহদি হসনের মখমলি জাদু আর জগজিৎ সিংয়ের বেদনাসিক্ত কণ্ঠের মিশেল—দুইই লক্ষ্যনীয়।

উপরিল্লিখিত নামগুলি বাদেও গজলের দুনিয়ায় আরও বেশ কিছু অভিনিবেশ-যোগ্য গজলিয়া ছিলেন এবং রয়েছেন। যেমন—আহমেদ রুশদি, আবিদা পারভিন, আলি শেঠী, আমজাদ পরভেজ, অনুরাধা পোড়য়াল,

আতাউল্লাজ খান, আতিক হুশেন খান, সালমা আগা, কিরণ আহলুওয়ালিয়া, নজমা আখতার, গুলবাহার বানো, বিউটি শর্মা বড়ুয়া, রহমতুল্লাহ দর্দ, মুহম্মদ হুশেন, সাজ্জাদ আলি, ক্যাশিয়াস খান, সফকৎ অমানৎ আলি খান, হামিদ আলি খান, শাহনবাজ অমন, খলিল হায়দর, রুনা লায়লা, আজিজ মিয়া, হাবিব ওয়ালি মোহম্মদ, জশপ্রীত জাজিম শর্মা, ওয়াদাত রমিজ, সোনু নিগম, নিজামি ব্রাদার্স, নায়্যর নূর, ভীমরাও পঞ্চলে, প্রতিভা সিং বাঘেল, শিশির পারেখি, রেশমা, রাহত ফতেহ আলি খান, সাবরি ব্রাদার্স, সাজিদ আলি, জশবিন্দর সিং, গজল শ্রীনিবাস, আদিত্য শ্রীনিবাসন, তাহিরা সাইদ, মনহর উধাস, সুরেশ ওয়াডেকর, শ্রীচঞ্চল, আহমদ ওয়ালি, অলকা য়্যাগনিক, আয়ুষ্মান খুরানা, অরিজিৎ সিং, মোহিত চৌহান, শিল্পা রাও, পরিনীতা চোপড়া, নবতেজ সিং, স্মৃতি মিশ্র—নামের অফুরন্ত কাতার।

পরিশেষে বলি, এই মুহূর্তে নতুন ও অর্বাচীন প্রজন্মের কাছে হয়ত গজল তেমন জনপ্রিয় গানের ধারা নয়; কিন্তু তবু, মানব-মানবীর প্রেমের গজল আজও আমাদের মনকে অভিভূত ও আপ্লুত করে। প্রিয়া-মিলন আর স্রষ্টা-মিলনের অমর গাথা হয়ে গজলের প্রেম-রসে মানুষের মন সিক্ত হয়ে ভলবে নিরবধি, হয়ত-বা অনন্তকাল। মালকা-এ-গজল বেগম আখতারের বিখ্যাত উক্তিটি মিথ্যে হবার নয়—'গজল সহী ঢং সে গাঈ জায়ে তো উসকা নশা সর চঢ়কে বোলতা হ্যয়।' বেশক বেগমজান! উওহ নশা লগে, পর কতঈ ছুটে নহীঁ।

কালজয়ী ও বিখ্যাত কিছু গজল

আমির খুসরো
(১২৫৩-১৩২৫)
জে-হাল-এ-মিস্কীঁ[১] মকুন[২] তগাফুল[৩] দুরায়[৪] নৈনা বনায়ে বতিয়াঁ
কি তাব-এ-হিজ্রাঁ[৫] নদারম অয় জাঁ ন লেহু কাহে লগায়ে ছতিয়াঁ
শবান-এ-হিজ্রাঁ[৬] দরাজ চুঁ জুল্ফ ও রোজ-এ-ওসলত[৭] চুঁ উম্র-এ-কোতাহ
সখী পিয়া কো জো মঁয় ন দেখুঁ তো কৈসে কাটুঁ অঁধেরী রতিয়াঁ
য়কায়ক অজ দিল দো চশম জাদু ব-সদ-ফরেবম[৮] ব-বুর্দ[৯] তস্কীঁ[১০]
কিসে পড়ী হ্যয় জো জা সুনায়ে পিয়ারে[১১] পী কো হমারী বতিয়াঁ
চুঁ শম-এ-সোজাঁ[১২] চুঁ জর্রা হ্যরাঁ জ মেহর-এ-আঁ-মহ[১৩] বগশতম[১৪] আখির
ন নীঁদ নৈনাঁ ন অংগ চৈনাঁ আপ আওয়ে ন ভেজে পতিয়াঁ
ব-হক্ক-এ-আঁ[১৫] মহ কি রোজ-এ-মশহর ব-দাদ[১৬] মারা ফরেব 'খুসরও'
সমীপ মন কে দুরায় রাখুঁ জো জায়ে পাউঁ পিয়া কী খতিয়াঁ

১. দরিদ্রের হাল; ২. কোরো না; ৩. তুচ্ছ জ্ঞান করা; ৪. দুটি পথ; ৫. বিরহবেদনা সহ্য করা; ৬. বিরহ রজনী; ৭. মিলনের মুহূর্ত; ৮. hundred deceptions; ৯. with acquisition, a haul; ১০. আরামপ্রদায়ী; ১১. প্রিয়া; ১২. প্রজ্জ্বলিত বাতি; ১৩. sun of that moon; ১৪. I turn, I become; ১৫. for that right; ১৬. doomsday, day of judgement

কুলি কুতুব শাহ
(১৫৬৬-১৬১১)
পিয়া বাজ প্যায়ালা পিয়া জায়ে না
পিয়া বাজ য়ক তিল জিয়া জায়ে না
কহী থে পিয়া বিন সুবুরী করুঁ
কহয়্যা জায়ে অম্মা কিয়া জায়ে না
নহীঁ ইশক জিস বড়া কোড় হ্যয়
কংধি উস সে মিল বে-সিয়া জায়ে না
'কুতুব' শহ ন দে মুজ দিওয়ানে কো পন্দ
দিওয়ানে কুঁ কুচ পন্দ দিয়া জায়ে না

মহম্মদ রফি সওদা
(১৭১৩-১৭৮১)
গুল[১] ফেঁকে হ্যয় অওরোঁ কী তরফ বল্কি সমর[২] ভী

অয় খানা-বর-অন্দাজ-এ-চমন[৩] কুছ তো ইধর ভী
ক্যা জিদ হ্যয় মিরে সাথ খুদা জানে বগরনা[৪]
কাফী হ্যয় তসল্লী কো মিরী এক নজর ভী
অয় অব্র[৫] কসম হ্যয় তুছে রোনে কী হমারে
তুঝ চশম সে টপকা হ্যয় কভু লখত-এ-জিগর[৬] ভী
অয় নালা[৭] সদ[৮] অফসোস জওয়াঁ মরনে পে তেরে
পায়া ন তনিক দেখনে তীঁ রু-এ-অসর[৯] ভী
কিস হস্তী-এ-মৌহুম[১০] পে নাজাঁ[১১] হ্যয় তু অয় য়্যার
কুছ অপনে শব-ও-রোজ[১২] কী হ্যয় তুজ কো খবর ভী
তনহা তিরে মাতম মেঁ নহীঁ শাম-এ-সিয়হ-পোশ[১৩]
রহতা হ্যয় সদা চাক গরেবান-এ-সহর[১৪] ভী
'সওদা' তিরী ফরিয়াদ সে আঁখোঁ মেঁ কটী রাত
আঈ হ্যয় সহর[১৫] হোনে কো টুক তু কহীঁ মর ভী

১. ফুল; ২. ফল; ৩. A prodigal, a spendthrift of garden; ৪. অন্যথা; ৫. মেঘ; ৬. প্রিয় শিশু; ৭. আর্তনাদ; ৮. শতক; ৯. দ্রষ্টার প্রভাব; ১০. কাল্পনিক জীবন; ১১. গর্ব করা; ১২. রাতদিন; ১৩. কালো আবরণ; ১৪. ভোর; ১৫. প্রত্যূষ

খাজা মীর দর্দ
(১৭২০-১৭৮৫)
অগর য়্যুঁ হী য়ে দিল সতাতা রহেগা
তো ইক দিন মিরা জী হী জাতা রহেগা
মঁয় জাতা হুঁ দিল কো তিরে পাস ছোড়
মিরী য়্যাদ তুঝ কো দিলাতা রহেগা
গলী সে তিরী দিল কো লে তো চলা হুঁ
মঁয় পহুঁচুঙ্গা জব তক য়ে আতা রহেগা
জফা সে গরজ ইম্তিহান-এ-ওয়ফা হ্যয়
তু কহ কব তলক আজমাতা রহেগা
কফস মেঁ কোঈ তুম সে অয় হম-সফীরো
খবর গুল কী হম কো সুনাতা রহেগা
খফা হো কে অয় 'দর্দ' মর তো চলা তু
কহাঁ তক গম অপনা ছুপাতা রহেগা

মীর তকী মীর
(১৭২৩-১৮১০)
হস্তী অপনী হবাব[১] কী সী হ্যয়
য়ে নুমাইশ[২] সরাব কী সী হ্যয়

নাজুকী উস কে লব কী ক্যা কহিয়ে
পংখুড়ী ইক গুলাব কী সী হ্যয়
চশম-এ-দিল[3] খোল ইস ভী আলম পর
য়্যাঁ কী অওকাত খোয়াব কী সী হ্যয়
বার বার উস কে দর পে জাতা হুঁ
হালত অব ইজতিরাব[4] কী সী হ্যয়
নুকশা-এ-খয়্যাল[5] সে তিরা অবরু[6]
বৈত ইক ইন্তিখাব[7] কী সী হ্যয়
মঁয় জো বোলা কহা কি য়ে আওয়াজ
উসী খানা-খরাব[8] কী সী হ্যয়
আতিশ-এ-গম[9] মেঁ দিল ভুনা শায়দ
দের সে বু কবাব কী সী হ্যয়
দেখিয়ে অব্র[10] কী তরহ্ অব কে
মেরী চশম-এ-পুর-আব[11] কী সী হ্যয়
'মীর' উন নীম-বাজ[12] আঁখোঁ মেঁ
সারী মস্তী শরাব কী সী হ্যয়
১. বুদ্বুদ; ২. প্রদর্শন; ৩. হৃদয়ের চোখ; ৪. ব্যাকুলতা; ৫. বিউটি স্পট; ৬. ভ্রূ; ৭. বাছাই করা; ৮. বখাটে; ৯. দুঃখের আগুন; ১০. মেঘ; ১১. অশ্রুপূর্ণ আঁখি; ১২. আধখোলা

গুলাম হমদানি মসহফি
(১৭৪৭-১৮২৪)
লোগ কহতে হ্যাঁয় মোহব্বত মেঁ অসর হোতা হ্যয়
কৌন সে শহর মেঁ হোতা হ্যয় কিধর হোতা হ্যয়
উস কুচে[1] মেঁ হ্যয় নিত সুরত-এ-বেদাদ[2] নঈ
কৎল হর খস্তা বা-অন্দাজ-দিগর হোতা হ্যয়
নহীঁ মালুম কি মাতম হ্যয় ফলক পর কিস কা
রোজ ক্যুঁ চাক গিরেবান-এ-সহর[3] হোতা হ্যয়
উহীঁ অপনী ভী হ্যয় বারীক-তর-অজ-মু[4] গর্দন
তেগ কে সাথ য়হাঁ জিক্র-এ-কমর[5] হোতা হ্যয়
কর কে মঁয় য়্যাদ দিল অপনে কো বহুত রোতা হুঁ
জব কিসী শখস কা দুনিয়া সে সফর হোতা হ্যয়
উস কী মিজগাঁ[6] কা কোঈ নাম ন লো ক্যা হাসিল
মেরা ইন বাতোঁ সে সুরাখ জিগর হোতা হ্যয়
'মুসহফী' হম তো তিরে মিলনে কো আয়ে কঈ বার

অয় দিওয়ানে[৭] তু কিসী ওয়ক্ত ভী ঘর হোতা হ্যয়

১. গলি; ২. ইমেজ; ৩. প্রভাত; ৪. চুলের চেয়েও মিহি; ৫. কোমরের উল্লেখ; ৬. চোখের পলক; ৭. পাগল, প্রেমিক

বাহাদুর শাহ জফর

(১৭৭৫-১৮৬২)

ওয়াঁ রসাই[১] নহীঁ তো ফির ক্যা হ্যয়
য়ে জুদাই নহীঁ তো ফির ক্যা হ্যয়
হো মুলাকাৎ তো সফাই সে
অওর সফাই নহীঁ তো ফির ক্যা হ্যয়

দিলরুবা[২] কো হ্যয় দিলরুবাই শর্ত
দিলরুবাই নহীঁ তো ফির ক্যা হ্যয়

গিলা[৩] হোতা হ্যয় আশনাই মেঁ

আশনাই[৪] নহীঁ তো ফির ক্যা হ্যয়

অল্লাহ অল্লাহ রে উন বুতোঁ কা গুরুর[৫]

য়ে খুদাই[৬] নহীঁ তো ফির ক্যা হ্যয়
মৌত আঈ তো টল নহীঁ সকতী
অওর আঈ নহীঁ তো ফির ক্যা হ্যয়

মগস-এ-কাব[৭] অগনিয়া হোনা হ্যয়

বে-হয়াই[৮] নহীঁ তো ফির ক্যা হ্যয়

বোসা-এ-লব[৯] দিল-এ-শিকস্তা[১০] কো

মোম্যাই[১১] নহীঁ তো ফির ক্যা হ্যয়
নহীঁ রোনে মেঁ গর 'জফর' তাসীর
জগ-হঁসাই নহীঁ তো ফির ক্যা হ্যয়

১. access, reach, approach; ২. চিত্তচোর, প্রেয়সী; ৩. দোষারোপ, নালিশ; ৪. প্রেম; ৫. গর্ব, গুমর; ৬. ঐশ্বরিক; ৭. insect in plate, bowl; ৮. নির্লজ্জতা; ৯. ওষ্ঠচুম্বন; ১০. ভগ্নহৃদয়; ১১. মোম, শিলাজিৎ

শেখ মহম্মদ ইব্রাহিম জৌক

(১৭৯৬-১৮৫৪)

লাঈ হয়্যাত[১] আয়ে কজা[২] লে চলী চলে
অপনী খুশি ন আয়ে ন অপনী খুশী চলে

হো উম্র-এ-খিজ্র[৩] ভী তো হো মালুম ওয়ক্ত-এ-মর্গ[৪]

হম ক্যা রহে য়হাঁ অভী আয়ে অভী চলে

হম সে ভী ইস বিসাত[৫] পে কম হোঙ্গে বদ-কিমার[৬]
জো চাল হম চলে সো নিহায়ৎ বুরী চলে
বেহতর তো হ্যয় য়হী কি ন দুনিয়া সে দিল লগে
পর ক্যা করেঁ জো কাম ন বে-দিল-লগী চলে

লৈলা কা নাকা[৭] দশত৮ মেঁ তাসীর-এ-ইশক[৯] সে
সুন কর ফুগান-এ-কৈস[১০] বজা-এ-হুদী[১১] চলে

নাজাঁ[১২] ন হো খিরদ[১৩] পে জো হোনা হ্যয় হো ওহী
দানিশ[১৪] তিরী ন কুছ মিরী দানিশ-ওরী চলে

দুনিয়া নে কিস কা রাহ-এ-ফনা[১৫] মেঁ দিয়া সাথ
তুম ভী চলে চলো য়ু্যহী জব তক চলী চলে

জাতে হওয়া-এ-শৌক[১৬] মেঁ হ্যাঁয় ইস চমন সে 'জৌক'
অপনী বলা সে বাদ-এ-সবা অব কভী চলে

১. জীবন, অস্তিত্ব; ২. মৃত্যু; ৩. অফুরন্ত জীবন; ৪. মৃত্যুর সময়; ৫. বিছানা; ৬. অনভিজ্ঞ খেলোয়াড়; ৭. মাদী উট; ৮. জঙ্গল; ৯. প্রেমের প্রভাব; ১০. grief of Qais, মজনু; ১১. হুদী-র জায়গা; ১২. গর্ব বা গুমর করা; ১৩. বস্ত্রহীনতার আবরণ, বুদ্ধি; ১৪. বুদ্ধি; ১৫. বিনাশের পথ; ১৬. breeze of longing

মির্জা গালিব
(১৭৯৭-১৮৬৯)

দিল-এ-নাদাঁ[১] তুঝে হুয়া ক্যা হ্যয়
আখির ইস দর্দ কী দওয়া ক্যা হ্যয়

হম হ্যাঁয় মুশতাক[২] অওর ওহ বে-জার[৩]
য়্যা ইলাহী[৪] য়ে মাজরা[৫] ক্যা হ্যয়
মঁয় ভী মুঁহ মেঁ জবান রখতা হুঁ

কাশ পুছো কি মুদ্দআ'[৬] ক্যা হ্যয়
জব কি তুঝ বিন নহীঁ কোঈ মৌজুদ
ফির য়ে হঙ্গামা অয় খুদা ক্যা হ্যয়

য়ে পরী-চেহরা[৭] লোগ কৈসে হ্যাঁয়
গমজা৮ ও ইশওয়া[৯] ও অদা ক্যা হ্যয়

শিকন-এ-জুল্ফ-এ-অম্বরী[১০] ক্যুঁ হ্যয়
নিগহ-এ-চশম-এ-সুরমা[১১] সা ক্যা হ্যয়

সবজা[১২] ও গুল[১৩] কহাঁ সে আয়ে হ্যাঁয়
অব্র ক্যা চীজ হ্যয় হওয়া ক্যা হ্যয়
হম কো উন সে ওফা কী হ্যয় উম্মীদ

জো নহীঁ জানতে ওফা ক্যা হ্যয়
হাঁ ভলা কর তিরা ভলা হোগা
অওর দরবেশ[১৪] কী সদা[১৫] ক্যা হ্যয়
জান তুঝ পর নিসার[১৬] করতা হুঁ
মঁয় নহীঁ জানতা দুয়া ক্যা হ্যয়
মঁয় নে মানা কি কুছ নহীঁ 'গালিব'
মুফত হাথ আয়ে তো বুরা ক্যা হ্যয়

১. অবুঝ মন; ২. আকাঙ্খী; ৩. sick of / apathetic; ৪. খোদা; ৫. ঘটনা, ব্যাপার; ৬. বিষয়; ৭. পরীর মত চেহারা; ৮. ককেটিশ দৃষ্টি; ৯. কায়দা, ঢং; ১০. curl in musky tresses; ১১. look of the kohl in eyes; ১২. ঘাস; ১৩. ফুল; ১৪. দরবেশ; ১৫. আহ্বান, ডাকা; ১৬. কুরবানি, ত্যাগ

মোমিন খাঁ মোমিন

(১৮০০-১৮৫১)

ওহ জো হম মেঁ তুম মেঁ করার[১] থা তুমহে য়্যাদ হো কি ন য়্যাদ হো
ওয়হী য়্যানী ওয়াদা নিবাহ কা তুমহে য়্যাদ হো কি ন য়্যাদ হো
ওহ জো লুৎফ[২] মুঝ পে থে বেশতর[৩] ওহ করম কি থা মিরে হাল পর
মুঝে সব হ্যয় য়্যাদ জরা জরা তুমহে য়্যাদ হো কি ন য়্যাদ হো
ওহ নয়ে গিলে[৪] ওহ শিকায়তেঁ[৫] ওহ মজে মজে কর হিকায়তেঁ[৬]
ওহ হর এক বাত পে রুঠনা তুমহে য়্যাদ হো কি ন য়্যাদ হো
কভী বৈয়ঠে সব মেঁ জো রু-ব-রু[৭] তো ইশারতোঁ[৮] হী সে গুফতুগু[৯]
ওহ বয়ান শৌক[১০] কা বরমলা[১১] তুমহে য়্যাদ হো কি ন য়্যাদ হো
হুয়ে ইত্তিফাক[১২] সে গর বহম তো ওয়ফা[১৩] জতানে কো দম-ব-দম
গিলা-এ-মলামত-এ-অকরিয়া[১৪] তুমহে য়্যাদ হো কি ন য়্যাদ হো
কোঈ বাত এয়সী অগর হুই কি তুমহারে জী কো বুরী লগী
তো বয়াঁ সে পহলে হী ভুলনা তুমহে য়্যাদ হো কি ন য়্যাদ হো
কভী হম মেঁ তুম মেঁ ভী চাহ থী কভী হম সে তুম সে ভী রাহ থী
কভী হম ভী তুম ভী থে আশনা[১৫] তুমহে য়্যাদ হো কি ন য়্যাদ হো
সুনো জিক্র হ্যয় কঈ সাল কা কি ক্যা ইক আপ নে ওয়াদা থা
সো নিবাহনে কা তো জিক্র ক্যা তুমহে য়্যাদ হো কি ন য়্যাদ হো
কহা মঁয় নে বাত ওহ কোঠে কী মিরে দিল সে সাফ উতর গঈ
তো কহা কি জানে মিরী বলা তুমহে য়্যাদ হো কি ন য়্যাদ হো
ওহ বিগড়না ওসল[১৬] কী রাত কা ওহ ন মাননা কিসী বাত কা
ওহ নহীঁ নহীঁ কী হর আন অদা তুমহে য়্যাদ হো কি ন য়্যাদ হো
জিসে আপ গিনতে থে আশনা জিসে আপ কহতে থে বা-ওয়ফা[১৭]
মঁয় ওহী হুঁ 'মোমিন'-এ-মুবতলা[১৮] তুমহে য়্যাদ হো কি ন য়্যাদ হো

১. অঙ্গীকার; ২. মজা, আনন্দ; ৩. অধিকাংশ; ৪. দোষারোপ; ৫. নালিশ; ৬. গল্প-কাহিনী; ৭. মুখোমুখি; ৮. gesticulation; ৯. কথাবার্তা; ১০. শখ, পছন্দ; ১১. খোলাখুলি; ১২. সংযোগবশত; ১৩. প্রতিজ্ঞা পালন; ১৪. আত্মীয়স্বজনদের অপমানজনক দোষারোপ; ১৫. প্রেমিক; ১৬. মিলন, অভিসার; ১৭. বিশ্বাসী; ১৮. Momin-the obsessed

ওয়াজিদ আলি শাহ
(১৮২২-১৮৮৭)

উলফৎ[১] নে তিরী হম কো তো রকখা ন কহীঁ কা
দরিয়া কা ন জঙ্গল কা সমা কা ন জমীঁ কা
ইকলীম-এ-ময়ানী[২] মেঁ অমল হো গয়া মেরা
দুনিয়া মেঁ ভরোসা থা কিসে তাজ-ও-নংগী[৩] কা
তকদীর নে ক্যা কুতুব-এ-ফলক[৪] মুঝ কো বনায়া
মোহতাজ মিরা পাঁও রহা খানা-এ-জীঁ[৫] কা
ইক বোরিয়ে কে তখত পে অওকাত বসর কী
জাহিদঁ[৬] ভী মুকল্লিদ[৭] রহা সজ্জাদা-নশীঁ কা
'অখতর' কলম-এ-ফিক্র কে ভী অশক[৮] হ্যঁয় জারী
ক্যা হাল লিখুঁ অপনে দিল-এ-জার-ও-হজীঁ[৯] কা

১. প্রেম; ২. realm of meaning; ৩. মুকুট ও জহরত; ৪. ধ্রুবতারা; ৫. house of saddles; ৬. ত্যাগী, সংযমী; ৭. অনুগামী, শিষ্য; ৮. নিষ্ঠাবান; ৮. অশ্রু; ৯. melancholic heart

দাগ দেহলভী
(১৮৩১-১৯০৫)

তুমহারে খত মেঁ নয়া ইক সলাম কিস কা থা
ন থা রকীব[১] তো আখির ওহ নাম কিস কা থা
ওহ কৎল কর কে মুঝে হর কিসী সে পুছতে হ্যঁয়
য়ে কাম কিস নে কিয়া হ্যয় য়ে কাম কিস কা থা
ওয়ফা করেঙ্গে নিবাহেঙ্গে বাত মানেঙ্গে
তুমহে ভী য়্যাদ হ্যয় কুছ য়ে কলাম[২] কিস কা থা
রহা ন দিল মেঁ ওহ বেদর্দ অওর দর্দ রহা
মুকীম[৩] কৌন হুয়া হ্যয় মকাম কিস কা থা
ন পুছ-গছ থী কিসী কী ওহাঁ ন আও-ভগত[৪]
তুমহারী বজম[৫] মেঁ কল এহতিমাম[৬] কিস কা থা
তমাম বজম জিসে সুন কে রহ গঈ মুশতাক[৭]
কহো ওহ তজিকরা-এ-না-তমাম[৮] কিস কা থা
হমারে খত কে তো পুর্জে কিয়ে পঢ়া ভী নহীঁ

সুনা জো তু নে ব-দিল ওহ পয়াম কিস কা থা
উঠাই ক্যুঁ ন কয়ামত[৯] অদু[১০] কে কুচে মেঁ
লিহাজ আপ কো ওয়ক্ত-এ-খিরাম[১১] কিস কা থা
গুজর গযা ওহ জমানা কহুঁ তো কিস সে কহুঁ
খয়্যাল দিল কো মিরে সুবহ ও শাম কিস কা থা
হমেঁ তো হজরত-এ-ওয়াইজ[১২] কী জিদ নে পিলওয়াই
য়হাঁ ইরাদা-এ-শর্ব-এ-মুদাম[১৩] কিস কা থা
অগরচে[১৪] দেখনে ওয়ালে তিরে হজারোঁ থে
তবাহ-হাল[১৫] বহুত জের-এ-বাম[১৬] কিস কা থা
ওহ কৌন থা কি তুমহে জিস নে বেওয়ফা জানা
খয়্যাল-এ-খাম[১৭] য়ে সৌদা-এ-খাম কিস কা থা
ইনহী সিফাত সে হোতা হ্যয় আদমী মশহুর
জো লুৎফ আম ওহ করতে য়ে নাম কিস কা থা
হর ইক সে কহতে হ্যঁয় ক্যা 'দাগ' বেওয়ফা নিকলা
য়ে পুছে উন সে কোঈ ওহ গুলাম কিস কা থা

১. প্রতিদ্বন্দ্বী; ২. কথা; ৩. প্রবাসী; ৪. অভ্যর্থনা, অভিনন্দন; ৫. সভা, মজলিশ; ৬. ব্যবস্থা; ৭. উৎসুক; ৮. অসম্পূর্ণ বর্ণনা; ৯. প্রলয়, শেষদিন; ১০. শত্রু; ১১. slow paced time; ১২. Mister preacher; ১৩. intention to always drink together; ১৪. যদ্যপি, যদিও; ১৫. মর্মান্তিক অবস্থা; ১৬. ছাদের তলায়; ১৭. crude or silly ideas

আলতাফ হুসেন হালী
(১৮৩৭-১৯১৪)
হক ওয়ফা কে জো হম জতানে লগে
আপ কুছ কহ কে মুস্কুরানে লগে
থা য়হাঁ দিল মেঁ তান-এ-ওস্ল-এ-অদু[১]
উজ্র উন কী জবাঁ পে আন লগে
হম কো জীনা পড়েগা ফুর্কত[২] মেঁ
ওহ অগর হিম্মৎ আজমানে লগে
ডর হ্যয় মেরী জবাঁ ন খুল জায়ে
অব ওহ বাতেঁ বহুত বনানে লগে
জান বচতী নজর নহীঁ আতী
গৈর উলফৎ[৩] বহুত জতানে লগে
তুম কো করনা পড়েগা উজ্র-এ-জফা[৪]
হম অগর দর্দ-এ-দিল[৫] সুনানে লগে
সখত মুশকিল হ্যয় শেওয়া-এ-তস্লীম[৬]

হম ভী আখির কো জী চুরানে লগে

জী মেঁ হ্যয় লুঁ রজা-এ-পীর-এ-মুগাঁ[৭]

কাফিলে[৮] ফির হরম[৯] কো জানে লগে

সির্র-এ-বাতিন[১০] কো ফাশ কর য়্যা রব

অহল-এ-জাহির[১১] বহুত সতানে লগে

ওয়ক্ত-এ-রুখসৎ[১২] থা সখত 'হালী' পর

হম ভী বৈয়ঠে থে জব ওহ জানে লগে

১. taunt of union with rival, enemy; ২. বিচ্ছেদ, বিরহ; ৩. প্রেম; ৪. নির্যাতন করার অজুহাত; ৫. হৃদয় বেদনা; ৬. রাজি হওয়ার অভ্যেস; ৭. willingness of tavern keeper; ৮. caravans; ৯. কাবা; ১০. রহস্যাবৃত সত্য; ১১. people who belive in appearances; ১২. বিচ্ছেদের মুহূর্ত

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ

(১৯১১-১৯৮৪)

আয়ে কুছ অব্র কুছ শরাব আয়ে

ইস কে বা'দ আয়ে জো অজাব[১] আয়ে

বাম-এ-মীনা[২] সে মাহতাব[৩] উতরে

দস্ত-এ-সাকী[৪] মেঁ আফতাব[৫] আয়ে

হর রগ-এ-খুঁ[৬] মেঁ ফির চরাগাঁ[৭] হো

সামনে ফির ওহ বে-নকাব আয়ে

উম্র কে হর বরক[৮] পে দিল কী নজর

তেরী মেহরা-ও-ওয়ফা[৯] কে বাব আয়ে

কর রহা থা গম-এ-জহাঁ[১০] কা হিসাব

আজ তুম য়্যাদ বে-হিসাব আয়ে

ন গঈ তেরে গম কী সরদারী[১১]

দিল মেঁ য়্যুঁ রোজ ইনক্লাব[১২] আয়ে

জল উঠে বজম-এ-গৈর[১৩] কে দর-ও-বাম

জব ভী হম খানুমাঁ-খরাব[১৪] আয়ে

ইস তরহ অপনী খামুশী গুঁজী

গোয়া হর সম্ত সে জওয়াব আয়ে

'ফয়েজ' থী রাহ সর-ব-সর[১৫] মঞ্জিল

হম জহাঁ পহুঁচে কাময়্যাব আয়ে

১. torment / agony; ২. terrace of the wine decanter; ৩. চাঁদ; ৪. সাকীর বাহু; ৫. সূর্য; ৬. রক্তের শিরা; ৭. দীপমালা, দীপোৎসব; ৮. বইয়ের পাতা; ৯. প্রেম ও আস্থা; ১০. দুঃখের দুনিয়া; ১১. প্রভুত্ব; ১২. বিপ্লব; ১৩. প্রেমহীন মানুষের মেহফিল; ১৪. ভগ্নহৃদয়; ১৫. পূর্ণত

জোশ মলিহাবাদী

(১৮৯৮-১৯৮২)

সোজ-এ-গম নে কে মুঝে উস নে য়ে ইরশাদ[১] কিয়া

জা তুঝে কশমকশ-এ-দহর[২] সে আজাদ কিয়া

ওহ করেঁ ভী তো কিন অলফাজ[৩] মেঁ তেরা শিকওয়া[৪]

জিন কো তেরী নিগহ্-এ-লুৎফ[৫] নে বর্বাদ কিয়া
দিল কী চোটোঁ নে কভী চৈন সে রহনে ন দিয়া
জব চলী সর্দ হওয়া মঁয় নে তুঝে য়্যাদ কিয়া

অয় মঁয় সৌ জান সে ইস তর্জ-এ-তকল্লুম[৫] কে নিসার
ফির তো ফরমাইয়ে ক্যা আপ নে ইরশাদ কিয়া
ইস কা রোনা নহীঁ ক্যুঁ তুম নে কিয়া দিল বর্বাদ
ইস কা গম হ্যয় কি বহুত দের মেঁ বর্বাদ কিয়া

ইতনা মানুস[৬] হুঁ ফিতরত সে কলী জব চটকী
ঝুক কে মঁয় নে য়ে কহা মুঝ সে কুছ ইরশাদ কিয়া
মেরী হর সাঁস হ্যয় বাত কী শাহিদ অয় মৌত
মঁয় নে হর লুৎফ কে মৌকে পে তুঝে য়্যাদ কিয়া
মুঝ কো তো হোশ নহীঁ তুম কো খবর হো শায়দ
লোগ কহতে হ্যঁয় কি তুম নে মুঝে বর্বাদ কিয়া
কুছ নহীঁ ইস কে সিওয়া 'জোশ' হরীফোঁ কা কলাম
ওসল নে শাদ কিয়া হিজ্র নে নাশাদ কিয়া

১. আদেশ; ২. dilemma of world; ৩. শব্দ; ৪. নালিশ; ৫. প্রেমদৃষ্টি; ৬. কথা বলার ধরন; ৭. প্রেমিক

ইকবাল

(১৮৭৭-১৯৩৮)

সিতারোঁ সে আগে জহাঁ[১] অওর ভী হ্যঁয়

অভী ইশক[২] কে ইন্তিহাঁ[৩] অওর ভী হ্যঁয়

তহী জিন্দগী সে নহীঁ য়ে ফজায়োঁ[৪]

য়হাঁ সৈকড়োঁ কারওয়াঁ[৫] অওর ভী হ্যঁয়

কনায়ৎ[৬] ন কর আলম-এ-রংগ-ও-বু[৭] পর

চমন[৮] অওর ভী আশিয়াঁ[৯] অওর ভী হ্যঁয়

অগর খো গয়া ইক নশেমন[১০] তো ক্যা গম[১১]

মকামাৎ-এ-আহ-ও-ফুগাঁ[১২] অওর ভী হ্যঁয়

তু শাহী[১৩] হ্যয় পরওয়াজ[১৪] হ্যয় কাম তেরা
তিরে সামনে আসমাঁ অওর ভী হ্যঁয়

ইসী রোজ ও শব[১৫] মেঁ উলঝ কর ন রহ জা

কি তেরে জমান ও মকাঁ[১৬] অওর ভী হ্যাঁয়
গয়ে দিন কি তনহা থা মঁয় অঞ্জুমন[১৭] মেঁ
য়হাঁ অব মিরে রাজ-দাঁ[১৮] অওর ভী হ্যাঁয়

১. পৃথিবী, দুনিয়া; ২. প্রেম; ৩. পরীক্ষা; ৪. বায়ুমণ্ডল; ৫. যাত্রীদল; ৬. contentment; ৭. বর্ণে ও সুগন্ধে ভরা পৃথিবী; ৮. ফুলবাগিচা; ৯. নীড়, আশ্রয়; ১০. নীড়; ১১. দুঃখ; ১২. place for crying and sighing; ১৩. ঈগল, শ্যেন; ১৪. flight; ১৫. রজনী; ১৬. গৃহ, আশ্রয়; ১৭. মেহফিল, আসর; ১৮. রহস্য, গোপন কথা

ফিরাক গোরখপুরী
(১৮৯৬-১৯৮২)
মৌত ইক গীত গাতী থী
জিন্দগী ঝুম ঝুম জাতী থী
কভী দিওয়ানে রো ভী পড়তে থে
কভী তেরী ভী য়্যাদ আতী থী
জিক্র থা রংগ-ও-বু[১] কা অওর দিল মেঁ
তেরী তসবির উতরতী জাতী থী
থে ন অফলাক[২] গোশ-বর-আওয়াজ[৩]
বে-খুদী[৪] দাস্তাঁ[৫] সুনাতী থী
জলওয়া-গর[৬] হো রহা থা কোঈ উধর
ধূপ ইধর ফীকী পড়তী জাতী থী
হমা-তন-গোশ[৭] জিন্দগী থী 'ফিরাক'
মৌত ধীমে সুরোঁ মেঁ গাতী থী

১. বর্ণ ও সুগন্ধ; ২. স্বর্গ; ৩. ear of sound; ৪. আত্মবিস্মৃতি; ৫. কাহিনী; ৬. আলোকিত; ৭. সমস্ত কান

জাঁ নিসার আখতার
(১৯১৪-১৯৭৬)
অশআর[১] মিরে য়ুঁ তো জমানে কে লিয়ে হ্যাঁয়
কুছ শের ফকত[২] উন কো সুনানে কে লিয়ে হ্যাঁয়
অব য়হ ভী নহীঁ ঠিক কি হর দর্দ মিটা দেঁ
কুছ দর্দ কলেজে সে লগানে কে লিয়ে হ্যাঁয়
সোচো তো বড়ী চীজ হ্যয় তহজীব[৩] বদন কী

বর্না য়ে ফকত আগ বুঝানে কে লিয়ে হ্যঁায়
আঁখোঁ মেঁ জো ভর লোগে তো কাঁটোঁ সে চুভেঙ্গে য়ে
খওয়াব তো পলকোঁ পে সজানে কে লিয়ে হ্যঁায়
দেখুঁ তিরে হাথোঁ কো তো লগতা হ্যয় তিরে হাথ
মন্দির মেঁ ফকত দীপ জলানে কে লিয়ে হ্যঁায়
য়ে ইল্ম[৪] কা সৌদা য়ে রিসালে য়ে কিতাবেঁ
ইক শখস[৫] কী য়্যাদোঁ কো ভুলানে কে লিয়ে হ্যঁায়
১. যৌনসঙ্গম ; ২. নিছক, এমনিই ; ৩. সংস্কৃতি ; ৪. শিক্ষা, জ্ঞান ; ৫. ব্যক্তি

কৈফ ভোপালী
(১৯১৭-১৯৯১)

কৌন আয়েগা য়হাঁ কোঈ ন আয়া হোগা
মেরা দরওয়াজা হওয়াওঁ নে হিলায়া হোগা
দিল-এ-নাদাঁ[১] ন ধড়ক অয় দিল-এ-নাদাঁ ন ধড়ক
কোঈ খত লে কে পড়োসী কে ঘর আয়া হোগা
ইস গুলিস্তাঁ[২] কী য়হী রীত হ্যয় অয় শাখ-এ-গুল[৩]
তু নে জিস ফুল কো পালা ওহ পরায়া হোগা
দিল কী কিসমৎ হী মেঁ লিকখা থা অঁধেরা শায়দ
বর্না মসজিদ কা দিয়া কিস নে বুঝায়া হোগা
গুল[৪] সে লিপটী হুঈ তিতলী কো গিরা কর দেখো
আঁধিয়ো তুম নে দরখতোঁ[৫] কো গিরায় হোগা
খেলনে কে লিয়ে বচ্চে নিকল আয়ে হোঙ্গে
চাঁদ অব উস কী গলী মেঁ উতর আয়া হোগা
'কৈফ' পরদেস মেঁ মত য়্যাদ করো অপনা মকাঁ[৬]
অব কে বারিশ নে উসে তোড় গিরায়া হোগা
১. অবুঝ হৃদয় ; ২. ফুলবাগিচা ; ৩. ফুলভরা ডাল ; ৪. ফুল ; ৫. গাছ ; ৬. বাড়ি

সাহির লুধিয়ানভি
(১৯২১-১৯৮০)

তংগ আ চুকে হ্যঁায় কশমাকশ-এ-জিন্দগী[১] সে হম
ঠুকরা ন দেঁ জহাঁ কো কহীঁ বে-দিলী[২] সে হম
মায়ুসী-এ-ময়্যাল-এ-মোহব্বত[৩] ন পুছিয়ে
অপনোঁ সে পেশ আয়ে হ্যঁায় বেগানগী[৪] সে হম
লো আজ হম নে তোড় দিয়া রিশতা-এ-উমীদ[৫]
লো অব কভী গিলা ন করেঙ্গে কিসী সে হম
উভারেঙ্গে এক বার অভী দিল কে বলবলে[৬]
গো দব গয়ে হ্যঁায় বার-এ-গম-এ-জিন্দগী[৭] সে হম

গর জিন্দগী মেঁ মিল গয়ে ফির ইত্তিফাক[৮] সে
পুছেঙ্গে অপনা হাল তিরী বেবসী সে হম
অল্লাহ-রে ফরেব-এ-মশিয়্যত[৯] কি আজ তক
দুনিয়া কে জুল্ম সহতে রহে খামুশী সে হম

১. crisis, dilemma of life; ২. হৃদয়হীনতা; ৩. sorrow of consequence of love; ৪. strangeness; ৫. আশার সম্বন্ধ; ৬. fervour, ardour, spirit; ৭. জীবনবেদনার ভার; ৮. সংযোগ, এগ্রিমেন্ট; ৯. divine deception

নাসির কাজমী
(১৯২৫-১৯৭২)
অপনী ধুন মেঁ রহতা হুঁ
মঁয় ভী তেরে জৈসা হুঁ
ও পিছলী রুত[১] কে সাথী
অব কে বরস মঁয় তনহা[২] হুঁ
তেরী গলী মেঁ সারা দিন
দুখ কে কঙ্কর চুনতা হুঁ
মুঝ সে আঁখ মিলায়ে কৌন
মঁয় তেরা আইনা হুঁ
মেরা দিয়া জলায়ে কৌন
মঁয় তিরা খালী কমরা হুঁ
তেরে সিওয়া মুঝে পহনে কৌন
মঁয় তিরা তন কা কপড়া হুঁ
তু জীবন কী ভরী গলী
মঁয় জঙ্গল কা রস্তা হুঁ
আতী রুত মুঝে রোয়েগী
জাতী রুত কা ঝোঁকা হুঁ
অপনী লহর হ্যয় অপনা রোগ
দরিয়া হুঁ অওর প্যাসা হুঁ
১. ঋতু, আবহাওয়া; ২. একা, সঙ্গীহীন

দুষ্যন্ত কুমার
(১৯৩৩-১৯৭৫)
হো গঈ হ্যয় পীর পর্বত সী পিঘলনী চাহিয়ে
ইস হিমালয় সে কোঈ গঙ্গা নিকলনী চাহিয়ে
আস য়ে দীওয়ার পর্দোঁ কী তরহ হিলনে লগী
শর্ত লেকিন থী কি য়ে বুনিয়াদ হিলনী চাহিয়ে
হর সড়ক পর হর গলী মেঁ হর নগর হর গাঁও মেঁ
হাথ লহরাতে হুয়ে হর লাশ চলনী চাহিয়ে
সির্ফ হঙ্গামা খড়া করনা মিরা মকসদ নহীঁ

মেরী কোশিশ হ্যয় কি য়ে সুরৎ বদলনী চাহিয়ে
মেরে সীনে মেঁ নহীঁ তো তেরে সীনে মেঁ সহী
হো কহীঁ ভী আগ লেকিন আগ জলনী চাহিয়ে

গুলজার
(১৯৩৪-)
এক পরওয়াজ সুনাঈ দী হ্যয়
তেরী আওয়াজ সুনাঈ দী হ্যয়
সির্ফ এক সফহা পলট কর উস নে
সারী বাতোঁ কী সফাঈ দী হ্যয়
ফির ওহীঁ লৌট কে জানা হোগা
য়্যার নে ক্যয়সী রিহাঈ দী হ্যয়
জিস কী আঁখোঁ মেঁ কটী থী সদিয়াঁ
উস নে সদিয়োঁ কী জুদাঈ দী হ্যয়
জিন্দগী পর ভী কোঈ জোর নহীঁ
দিল নে হর চীজ পরাঈ দী হ্যয়
আগ মেঁ ক্যা ক্যা জলা হ্যয় শব ভর
কিতনী খুশ-রঙ দিখাঈ দী হ্যয়
মহনাজ অঞ্জুম
(১৯৭৭-)
মঁয় অপনে পর ভী উড়ানেঁ ভী খুদ বনাউঙ্গী
নিশানা লেতী কমানেঁ[১] ভী খুদ বনাউঙ্গী
হওয়া সে ফৈজ[২] কী উম্মিদ তক নহীঁ মুঝ কো
সৌ উঁচী নীচী উড়ানেঁ ভী খুদ বনাউঙ্গী
মঁয় হর্ফ[৩] লিখুঙ্গী পহলে বরক[৪] পে ঘায়ল সা
ফির উস কী জখম কী তানেঁ ভী খুদ বনাউঙ্গী
মুকালিমা[৫] ভী নয়া হোগা আপসী সব কা
জহান-এ-নৌ[৬] কী জবানেঁ খুদ বনাউঙ্গী
মঁয় মুঁহদিম[৭] করুঙ্গী সব গনীম দিওয়ারেঁ
কিলে কে গির্দ চট্টানে ভী খুদ বনাউঙ্গী
হঁসী কো মঁয় নে হী শো-কেস মেঁ সজা দিয়া থা
অওর অব খুশি কী দুকানেঁ ভী খুদ বনাউঙ্গী
কহীঁ সে মিলতে হ্যঁয় পাতাল অব তঅল্লুক[৮] কে
মঁয় য়ে অমীক[৯] ঢলানেঁ ভী খুদ বনাউঙ্গী

১. arches ; ২. লাভ, কৃপা ; ৩. শব্দ, দোষারোপ ; ৪. বইয়ের পাতা ; ৫. সংলাপ ; ৬. নতুন পৃথিবী ; ৭. বিধ্বস্ত ; ৮. সম্পর্ক ; ৯. গভীর

ফৈসল ইমতিয়াজ খান
(২০০০-)

আলম রঞ্জ-ও-অলম[১] হ্যয় খৈর হো
য়্যা খুদা কৈসা সিতম হ্যয় খৈর হো
অশক তেরে ঝুটে হ্যঁয় লেকিন মুঝে
এতিবার-এ-চশম-এ-নম[২] হ্যয় খৈর হো
দেখ কর তুঝ কো কহা মহতাব[৩] নে
ক্যা অদা ক্যা পেচ-ও-খম[৪] হ্যয় খৈর হো
মিল গয়া মুঝ কো পতা মঞ্জিল কা পর
রস্তে মেঁ বৈতুস-সনম[৫] হ্যয় খৈর হো
উস কে হোঁটোঁ কো ছুয়া তো য়্যুঁ লগা
চাশনী-এ-জহর-এ-গম[৬] হ্যয় খৈর হো
মঁয় হুঁ খস্তা-হাল[৭] ফৈসল ক্যা করুঁ
মেরা দুশমন তাজা-দম[৮] হ্যয় খৈর হো

১. grief and sorrow ; ২. trust of tearful eye ; ৩. arch, Moon ; ৪. perplexity, difficulty ; ৫. মন্দির, মূর্তিগৃহ ; ৬. দুঃখবিষের স্বাদ ; ৭. ভগ্নহৃদয় ; ৮. টাটকা

শিল্পী : বেগম আখতার
শায়র : মির্জা গালিব

দর্দ মিন্নৎ-কশ-এ-দওয়া[১] ন হুয়া
মঁয় ন অচ্ছা হুয়া বুরা ন হুয়া
জমঅ'[২] করতে হো ক্যুঁ রকীবোঁ[৩] কো
ইক তমাশা হুয়া গিলা[৪] ন হুয়া
হম কহাঁ কিসমৎ অজমানে জায়োঁ
তু হী জব খঞ্জর-আজমা[৫] ন হুয়া
কিতনে শীরেঁ[৬] হ্যঁয় তেরে লব[৭] কি রকীব[৮]
গালিয়াঁ খা কে বে-মজা ন হুয়া
হ্যয় খবর গর্ম উন কে আনে কী
আজ হী ঘর মেঁ বোরিয়া[৯] ন হুয়া
ক্যা ওহ নমরুদ[১০] কী খুদাই থী
বন্দগী মেঁ মিরা ভলা ন হুয়া
জান দী দী হুই উসী কী থী

হক তো য়্যুঁ হ্যয় কি হক অদা ন হুয়া
জখম গর দব গয়া লহু ন থমা
কাম গর রুক গয়া রওয়া[১১] ন হুয়া
রহজনী হ্যয় কি দিল-সিতানী[১২] হ্যয়
লে কে দিল দিল-সিতাঁ[১৩] রওয়ানা হুয়া
কুছ তো পঢ়িয়ে কি লোগ কহতে হ্যঁয়
আজ 'গালিব' গজল-সরা[১৪] ন হুয়া

১. obliged to medicine; ২. সংগ্রহ; ৩. প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রু; ৪. দোষারোপ; ৫. খঞ্জর পরীক্ষা; ৬. মিষ্টি; ৭. ঠোঁট; ৮. প্রেমের পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী; ৯. মাদুর বা চাটাই; ১০. প্রাচীন কালের এক নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী রাজা; ১১. সঠিক, বিধিসম্মত; ১২. fascinating; ১৩. প্রেমিক; ১৪. গজল পাঠ বা আবৃত্তি করে যে

শিল্পী : বেগম আখতার
শায়র : মীর তকী মীর

উলটী হো গয়ী সব তদবীরেঁ[১] কুছ ন দওয়া নে কাম কিয়া,
দেখা, বিমারী-এ-দিল[২] নে আখির কাম তমাম কিয়া।
অহদ-এ-জওয়ানী[৩] রো-রো কে কাটী পীরী[৪] মেঁ লী আঁখে মুঁদ,
য়ানী রাত বহুত থে জাগে, সুবহ হুই আরাম কিয়া।
হর্ফ[৫] নহীঁ জাঁ-বখশী মেঁ উসকী খুবী অপনী কিস্মৎ কী
হমসে জো পহলে কহ ভেজা সো মরনে কা পয়গাম[৬] কিয়া।
নাহক হম মজবুরোঁ পর য়ে তোহমত[৭] হ্যয় মুখতারী[৮] কী
চাহতে হ্যঁয় সো আপ করেঁ হ্যঁয় হমকো অবস[৯] বদনাম কিয়া।
সারে রিঁদ[১০] অওবাশ[১১] জহাঁ কে তুঝ সে সুজূদ[১২] মেঁ রহতে হ্যঁয়
বাঁকে টেঢ়ে তিরছে তীখে সব কা তুঝ কো ইমাম কিয়া।
সরজদ[১৩] হম সে বে-অদবী[১৪] তো বহশত[১৫] মেঁ ভী কম হী হুই
কোসোঁ উস কী ওর গয়ে পর সজদা[১৬] হর হর গাম কিয়া।
কিস কা কাবা কৈসা কিবলা[১৭] কৌন হরম হ্যয় ক্যা এহরাম
কুচে কে উস কে বাশিন্দোঁ নে সব কো য়হীঁ সে সলাম কিয়া।
শৈখ[১৮] জো হ্যয় মসজিদ মেঁ নংগা রাত কো থা ময়-খানে[১৯] মেঁ
জুব্বা[২০] খির্কা[২১] কুর্তা টোপী মস্তী মেঁ ইনআ'ম[২২] কিয়া।
কাশ অব বুর্কা মুঁহ সে উঠা দে বর্না ফির ক্যা হাসিল হ্যয়
আঁখ মুঁদে পর উন নে গো দীদার[২৩] কো অপনে আম কিয়া।
য়াঁ কে সমীদ[২৪] ও সিয়হ[২৫] মেঁ হম কো দখল জো হ্যয় সো ইতনা হ্যয়
রাত কো রো-রো সুবহ কিয়া য়া দিন কো জুঁ তুঁ শাম কিয়া।

সুবহ চমন মেঁ উস কো কহীঁ তকলীফ-এ-হওয়া লে আঈ থী
রুখ[২৬] সে গুল[২৭] কো মোল লিয়া কামত[২৮] সে সর্ব[২৯] গুলাম কিয়া
সাঅদ-এ-সীমীঁ[২৯] দোনোঁ উস কে হাথ মেঁ লা কর ছোড় দিয়ে
ভুলে উস কে কৌল-ও-কসম পর খয়াল-এ-খাম[৩০] কিয়া।
কাম হুয়ে হ্যঁয় সারে জায়েঅ'[৩১] হর সাঅ'ত[৩২] কী সমাজত সে
ইস্তিগ্না[৩৩] কী চৌগুনী উন নে জুঁ জুঁ মঁয় ইবরাম[৩৪] কিয়া।
এয়সে আহু-এ-রম-খুর্দা[৩৫] কী বহশত[৩৬] খোনী মুশকিল থী
সেহর[৩৭] কিয়া এ'জাজ[৩৮] কিয়া জিন লোগোঁ নে তুঝ কো রাম কিয়া।
'মীর' কে দীন-ও-মজহব[৩৯] কো অব পুছতে ক্যা হো উন নে তো
কশকা[৪০] খীঁচা দৈর মেঁ বয়ঠা কব কা তর্ক[৪১] ইস্লাম[৪২] কিয়া।

১. পরিকল্পনা; ২. হৃদয়ের রোগ; ৩. যৌবন; ৪. বার্দ্ধক্য; ৫. নালিশ; ৬. মেসেজ, সূচনা; ৭. দোষারোপ; ৮. মোক্তারি; ৯. শুধুশুধু, অকারণ; ১০. drunkard, carefree; ১১. কুসঙ্গ; ১২. ঈশ্বরের সম্মুখে মাথা নত করা; ১৩. be commited; ১৪. অনাদর; ১৫. ভয়, ত্রাস; ১৬. মাথা নত করা; ১৭. কাবা-র পবিত্র মসজিদ; ১৮. একটি মুসলিম প্রজাতি, মোল্লা, ফকির, সাধু-সন্ত; ১৯. পানশালা; ২০. জোব্বা; ২১. সুফীদের ঝোলা; ২২. পুরস্কার; ২৩. দর্শন; ২৪. শাদা; ২৫. কালো; ২৬. চেহারা; ২৭. ফুল; ২৮. উচ্চতা; ২৯. সাইপ্রেস গাছ; ৩০. রৌপ্যবর্ণ সুন্দর বাহু বা কব্জি; ৩১. রুঢ় ভাবনা; ৩১. হারিয়ে ফেলা; ৩২. এক মুহূর্ত; ৩৩. স্বয়ংসম্পূর্ণ; ৩৪. perseverance; ৩৫. fleeing deer referring to a head strong beloved; ৩৬. ভয়; ৩৭. সম্মোহন, জাদু; ৩৮. মিরাকল, চমৎকার; ৩৯. আস্থা ও ধর্ম; ৪০. হিন্দুদের কপালের টীকা; ৪১. ত্যাগ; ৪২. শান্তি, ইসলাম ধর্ম

শিল্পী : বেগম আখতার
শায়র : শকীল বদায়ুনী
অয় মুহব্বত তিরে অনজাম পর রোনা আয়া
জানে ক্যুঁ আজ তিরে নাম পে রোনা আয়া
য়্যুঁ তো হর শাম উমিদোঁ মেঁ গুজর জাতী হ্যয়
আজ কুছ বাত হ্যয় জো শাম পে রোনা আয়া
কভী তকদির[১] কা মাতম[২] কভী দুনিয়া কা গিলা[৩]
মঞ্জিল-এ-ইশক[৪] মেঁ হর গাম[৫] পে রোনা আয়া
মুঝ পে হী খতম হুয়া সিলসিলা-এ-নৌহাগরী[৬]
ইস কদর গর্দিশ-এ-অয়্যাম[৭] পে রোনা আয়া
জব হুয়া জিক্র জমানে মেঁ মোহব্বত কা 'শকীল'
মুঝ কো অপনে দিল-এ-নাকাম[৮] পে রোনা আয়া

১. ভাগ্য; ২. মৃত্যুশোক; ৩. দোষারোপ; ৪. প্রেমের গন্তব্য; ৫. পদক্ষেপ; ৬. process of lamentation; ৭. ভাগ্যের বদল; ৮. হৃদয়ের ব্যর্থতা, পরাজয়

শিল্পী : গুলাম আলি

শায়র : ইকবাল সফী পুরী

কোঈ সমঝায়ে কি ক্যা রঙ হ্যয় ময়খানে[১] কা
আঁখ সাকী কী উঠে নাম হো পয়মানে[২] কা।
গর্মী-এ-শম্মা কা অফসানা[৩] সুননেওয়ালো
রকস[৪] দেখা হী নহীঁ তুমনে অভী পরওয়ানে কা।
কিসকো মালুম থী পহলে সে খিরদ[৫] কী কীমত
আলম-এ-হোশ[৬] পৈ অহসান হ্যয় দিওয়ানে কা।
চশমে-সাকী[৬] মুঝে হর গাম[৭] পৈ ইয়াদ আতী হ্যয়
রাস্তা ভুল ন জাউঁ কহীঁ ময়খানে কা।
অব তো হর শাম গুজরতী হ্যয় উসী কুচে মেঁ
য়হ নতীজা হুয়া নাসেহ[৮] তেরে সমঝানে কা।
মঞ্জিল-এ-গম[৯] সে গুজরনা তো হ্যয় আসাঁ[১০] ইকবাল
ইশক হ্যয় নাম খুদ অপনে সে গুজর জানে কা।

১. পানশালা; ২. পানপাত্র; ৩. উষ্ণতা; ৪. নৃত্য; ৫. বুদ্ধি; ৬. চেতনা; ৭. প্রেয়সীর মদির আঁখি; ৮. প্রেম ত্যাগ করা যে উপদেশ দেয়; ৯. কষ্টাকর গন্তব্য; ১০. সহজ

শিল্পী : মেহদি হসন
শায়র : আহমদ ফরাজ

অজব জুনূন-এ-মসাফত[১] মেঁ ঘর সে নিকলা থা
খবর নহীঁ হ্যয় কি সূরজ কিধর সে নিকলা থা
য়ে কৌন ফির সে উনহী রাস্তোঁ মেঁ ছোড় গয়া
অভী-অভী তো অজাব-এ-সফর[২] সে নিকলা থা
য়ে তীর দিল মেঁ মগর বে-সব্ব[৩] নহীঁ উতরা
কোঈ তো হর্ফ লব-এ-চারাগর[৪] সে নিকলা থা
য়ে অব জো আগ বনা শহর শহর ফৈলা হ্যয়
য়হী ধুয়াঁ মিরে দীওয়ার-ও-দর সে নিকলা থা
মঁয় রাত টুট কে রোয়া তো চৈন সে সোয়া
কি দিল কা জহর মিরী চশম-এ-তর সে নিকলা থা
য়ে অব জো সর হ্যাঁয় খমীদা কুলাহ কী খাতির
য়ে য়েব ভী তো হম অহল-এ-হুনর সে নিকলা থা
ওহ কৈস[৫] অব জিসে মজনুঁ[৬] পুকারতে হ্যাঁয় 'ফরাজ'
তিরী তরহ কোঈ দীওয়ানা ঘর সে নিকলা থা

১. উন্মাদের মত যাত্রা; ২. কষ্ট; ৩. অকারণ; ৪. উপশম; ৫. মজনুর নাম; ৬. প্রেমিক

শিল্পী : জগজিৎ সিং ও চিত্রা সিং
শায়র : মহেন্দ্র সিং বেদী

আয়ে হ্যাঁয় সমঝানে লোগ
হ্যাঁয় কিতনে দীওয়ানে লোগ
বক্ত পে কাম নহীঁ আতে হ্যাঁয়
য়ে জানে-পহচানে লোগ
জৈসে হম ইন মেঁ পীতে হ্যাঁয়
লায়ে হ্যাঁয় পয়মানে লোগ
ফর্জানোঁ সে ক্যা বন আয়ে
হম তো হ্যাঁয় দীওয়ানে লোগ
অব জব মুঝ কো হোশ নহীঁ হ্যায়
আয়ে হ্যাঁয় সমঝানে লোগ
দৈর-ও-হরম[১] মেঁ চৈন জো মিলতা
ক্যুঁ জাতে ময়খানে[২] লোগ
জান কে সব কুছ কুছ ভী ন জানেঁ
হ্যাঁয় কিতনে অনজানে লোগ
জীনা পহলে হী উলঝন[৩] থা
অওর লগে উলঝানে লোগ
১. দেবালয়; ২. পানশালা; ৩. সমস্যাসঙ্কুল ও জটিল
শিল্পী : জগজিৎ সিং / রাজেন্দ্র মেহতা ও লীনা মেহতা
শায়র : রাজ ইলাহাবাদী
মঁয় খুদ হী অপনী তলাশ মেঁ হুঁ মেরা কৌঈ রহনুমা[১] নহীঁ হ্যায়
ওহ ক্যা দিখায়েঙ্গে রাহ মুঝকো জিনহে খুদ অপনা পতা নহীঁ হ্যায়
মসর্রতোঁ[২] কী তলাশ মেঁ হ্যায়, মগর য়ে দিল জানতা নহীঁ হ্যায়
অগর গম-এ-জিন্দগী[৩] ন হো তো জিন্দগী মেঁ মজা নহীঁ হ্যায়
বহুত দিনোঁ সে মঁয় সুন রহা থা সজা ওহ দেতে হ্যাঁয় হর খতা[৪] পর
মুঝে তো ইসকী সজা মিলী হ্যায় কে মেরী কোঈ খতা নহীঁ হ্যায়
শউর-এ-সজদা[৫] নহীঁ হ্যায় মুঝকো তু মেরে সজদোঁ কী লাজ রখনা
য়ে সর তেরে আস্তাঁ[৬] সে পহলে কিসী কে আগে ঝুকা নহীঁ হ্যায়
য়ে ইনকে মন্দির, য়ে ইনকে মসজিদ, য়ে জরপরস্তোঁ[৭] কী সজদাগাহেঁ
অগর য়ে ইনকে খুদা কা ঘর হ্যায় তো ইনমেঁ মেরা খুদা নহীঁ হ্যায়
দিল আইনা হ্যায়, তুম অপনী সুরত, সঁওয়ার লো অওর খুদ হী দেখো
জো নুক্স হোগা দিখাঈ দেগা য়ে বেজুবাঁ বোলতা নহীঁ হ্যায়
য়ে আপ নজরেঁ বচা বচা কর বগৌর ক্যা দেখতে হ্যাঁয় মুঝকো
তুমহারে কাম আ সকে তো লে লো হমারে য়ে কাম কা নহীঁ হ্যায়
১. পথ-প্রদর্শক; ২. আনন্দ; ৩. জীবনের বেদনা; ৪. দোষ, অপরাধ; ৫. উপাসনা করার পদ্ধতি; ৬. দেবালয়ের আঙন, দহলীজ; ৭. অর্থ-পূজারী, লোভী

শিল্পী : গুলাম আলি

শায়র : হসরত মোহানী

চুপকে চুপকে রাত দিন আঁসু বহানা য়্যাদ হ্যয়
হম কো অব তক আশিকী[১] কা ওহ জমানা য়্যাদ হ্যয়।

বা-হজারাঁ[২] ইজতিরাব[৩] ও সদ-হজারাঁ[৪] ইস্তিয়াক[৫]
তুঝ সে ওহ পহলে-পহল দি ল কা লগানা য়্যাদ হ্যয়।

বার বার উঠনা উসী জানিব নিগাহ-এ-শৌক[৬] কা
অওর তিরা গুর্ফে সে ওহ আঁখেঁ লড়ানা য়্যাদ হ্যয়।

তুঝ সে কুছ মিলতে হী ওহ বেবাক হো জানা মিরা
অওর তিরা দাঁতোঁ মেঁ ওহ উঁংলী দবানা য়্যাদ হ্যয়।

খিঁচ লেনা ওহ মিরা পর্দে কা কোনা দফঅ'তন[৭]
অওর দুপট্টে সে তিরা ওহ মুঁহ ছুপানা য়্যাদ হ্যয়।

জান কর সোতা তুঝে ওহ কসদ-এ-পা-বোসি[৮] মিরা
অওর তিরা ঠুকরা কে সর ওহ মুস্কুরানা য়্যাদ হ্যয়।

তুঝ কো জব তনহা কভী পানা তো অজ-রাহ-এ-লিহাজ[৯]
হাল-এ-দিল[১০] বাতোঁ হী বাতোঁ মেঁ জতানা য়্যাদ হ্যয়।

জব সিওয়া মেরে তুমহারা কোঈ দীওয়ানা ন থা
সচ কহো কুছ তুম কো ভী ওহ কার-খানা[১১] য়্যাদ হ্যয়।

গৈর কী নজরোঁ সে বচ কর সব কী মর্জী কে খিলাফ
ওহ তিরা চোরী-ছুপে রাতোঁ কো আনা য়্যাদ হ্যয়।

আ গয়া গর বস্ল[১২] কী শব[১৩] ভী কহীঁ জিক্র-এ-ফিরাক[১৪]
ওহ তিরা রো রো কে মুঝ কো ভী রুলানা য়্যাদ হ্যয়।

দোপহর কী ধুপ মেঁ মেরে বুলানে কে লিয়ে
ওহ তিরা কোঠে পে নংগে পাঁও আনা য়্যাদ হ্যয়।

আজ তক নজরোঁ মেঁ হ্যয় ওহ সোহবত-এ-রাজ-ও-নিয়াজ[১৫]
অপনা জানা য়্যাদ হ্যয় তেরা বুলানা য়্যাদ হ্যয়।

মিঠী মিঠী ছেড় কর বাতেঁ নিরালী প্যার কী
জিক্র দুশমন কা ওহ বাতোঁ মেঁ উড়ানা য়্যাদ হ্যয়।

দেখনা মুঝ কো জো বরগশতা[১৬] তো সৌ সৌ নাজ[১৭] সে
জব মনা লেনা তো ফির খুদ রুঠ জানা য়্যাদ হ্যয়।

চোরী চোরী হম সে তুম আ কর মিলে থে জিস জগহ
মুদ্দতেঁ[১৮] গুজরীঁ পর অব তক ওহ ঠিকানা য়্যাদ হ্যয়।

শৌক[১৯] মেঁহন্দী কে ওহ বে-দস্ত-ও-পা[২০] হোনা তিরা
অওর মিরা ওহ ছেড়না ওহ গুদগুদানা য়্যাদ হ্যয়।

বাওজুদ-এ-ইদ্দিয়া-এ-ইত্তকা[২১] 'হসরত' মুঝে
আজ তক অহদ-এ-হওস[২২] কা ওহ ফসানা য়্যাদ হ্যয়।

১. প্রেম; ২. সহস্র-সহ; ৩. ব্যাকুলতা; ৪. শত সহস্র; ৫. অনুরাগ, লালসা; ৬. প্রেমময় দৃষ্টি; ৭. সহসা, অকস্মাৎ; ৮. পায়ে চুমু খাওয়ার ব্যগ্রতা; ৯. by way of being considerate; ১০. হৃদয়ের দশা; ১১. vulva; ১২. মিলন; ১৩. রাত; ১৪. বিচ্ছেদের উল্লেখ; ১৫. গোপন সহযোগিতা; ১৬. প্রতিকূল; ১৭. হাবভাব, গর্ব; ১৮. সময়; ১৯. কামনা; ২০. অসহায়; ২১. inspite of claim of being cautious; ২২. কামনার দিনগুলি

শিল্পী : কুন্দনলাল সায়গল
শায়র : সিমাব অকবরাবাদী

শুক্রিয়া হস্তী কা! লেকিন তুমনে য়ে ক্যা কর দিয়া
পর্দে হী পর্দে মেঁ অপনা রাজ ইফশা কর দিয়া

মাংগ কর হম লায়ে থে অল্লাহ সে ইক দর্দ-এ-ইশক[১]
ওহ ভী অব তকদীর নে অওরোঁ কা হিসসা কর দিয়া

দো হী অঙ্গারে থে হাথোঁ মেঁ খুদা-এ-ইশক[২] কে
এক কো দিল এক কো মেরা কলেজা কর দিয়া

জব তজল্লী[৩] উন কী বক্র-অর্জানিয়োঁ পর আ গঈ

আবলে[৪] সে দিল কে পৈদা তুর-এ-সীনা[৫] কর দিয়া

অপনী ইস বারফতগী-এ-শৌক[৬] কা মমনুন[৭] হুঁ
বাকিয়াত-এ-ইশক কা থা লমহা লমহা ইক সদী

হর নফস[৮] মেঁ মঁয় নে ইক অরমান পুরা কর দিয়া

মর্হমত[৯] ফরমা কে অয় 'সীমাব' গম কী লজ্জতেঁ[১০]

জীস্ত[১১] কী তলখি[১২] কো ফিতরৎ[১৩] নে গওয়ারা কর দিয়া

১. প্রেমের বেদনা; ২. প্রেমের দেবতা; ৩. manifestation; ৪. blisters; ৫. Toor Mountain-allusion; ৬. প্রেম খোয়ানোর দশা; ৭. কৃতজ্ঞ; ৮. আত্মা; ৯. মঞ্জুর, দয়া; ১০. স্বাদ; ১১. জীবন; ১২. কটুতা; ১৩. প্রকৃতি

শিল্পী : তালাৎ মাহমুদ
শায়র : রশিদ রামপুরী

ইন হসিনোঁ কী মোহব্বত কা ভরোসা ক্যা
কোঈ মগর বলা সে ইনহেঁ পরওয়া ক্যা হ্যায়

য়্যাদ আতা হ্যয় শব-এ-বসল[১] কিসী কা কহনা
খৈর হ্যয় সে ইস ওয়ক্ত ইরাদা ক্যা হ্যয়

ওহ অয়াদৎ[২] কো মিরী আয়েঙ্গে এয়সে হী তো হ্যয়
নামা-বর ওয়াকই সচ কহতা হ্যয় বকতা ক্যা হ্যয়

দুশমন-এ-মেহর[৩] দগাবাজ সিতমগর[৪] কাতিল[৫]
জানতে ভী হো জমানা তুমহে কহতা ক্যা হ্যয়

উঠ গয়ে হজরৎ-এ-'মহমুদ'[৬] জমানে সে 'রশীদ'

ন হো উস্তাদ তো ফির লুৎফ[৭] গজল কা ক্যা হ্যয়

১. মিলনের রাত; ২. রুগীর হাল জানতে চাওয়া; ৩. বার্তা-বাহক; ৩. প্রেমের শত্রু; ৪. অত্যাচারী; ৫. খুনী; ৬. জনাব মহমুদ; ৭. আনন্দ

শিল্পী : তালাৎ আজিজ
শায়র : শাহরিয়ার

জিন্দগী জব ভী তেরী বজম[১] মেঁ লাতী হ্যায় হমেঁ
য়ে জমীঁ চাঁদ সে বেহতর নজর আতী হ্যায় হমেঁ

সুর্খ[২] ফুলোঁ সে মহক উঠতী হ্যঁয় দিল কী রাহেঁ
দিন ঢলে য়্যুঁ তিরী আওয়াজ বুলাতী হ্যায় হমেঁ

য়্যাদ তেরী কভী দস্তক কভী সরগোশী[৩] সে
রাত কে পিছলে-পহর রোজ জগাতী হ্যায় হমেঁ

হর মুলাকাত কা অঞ্জাম[৪] জুদাই ক্যুঁ হ্যায়
অব তো হর ওয়ক্ত য়হী বাত সতাতী হ্যায় হমেঁ
১. আসর, মজলিশ; ২. লাল; ৩. চুপিচুপি; ৪. পরিণতি

শিল্পী : মহম্মদ রফি
শায়র : মজরুহ সুলতানপুরী

আ নিকল কে ময়দাঁ[১] মেঁ দো-রুখী[২] কে খানে সে
কাম চল নহীঁ সকতা অব কিসী বহানে সে

অহদ-এ-ইনক্লাব[৩] আয়া দৌর-এ-আফতাব[৪] আয়া

মুন্তজির[৫] থীঁ য়ে আঁখেঁ জিস কী ইক জমানে সে
অব জমীন গায়েগী হল কে সাজ পর নগমে

ওয়াদিয়োঁ মেঁ নাচেঙ্গে হর তরফ তরানে[৬] সে

অহল-এ-দিল[৭] উগায়েঙ্গে খাক সে মহ ও অঞ্জুম[৮]

অব গুহর[৯] সুবুক[১০] হোগা জৌ কে এক দানে সে

মনচলে বুনেঙ্গে অব রঙ-ও-বু[১১] পৈরাহন[১২]
অব সঁওর কে নিকলেগা হুস্ন কার-খানে সে

আম হোগা অব হমদম সব পে ফৈজ[১৩] ফিতরত[১৪] কা

ভর সকেঙ্গে অব দামন[১৫] হম ভী ইস খজানে সে

মঁয় কি এক মেহনত-কশ মঁয় কি তীরগী-দুশমন[১৬]

সুবহ-এ-নৌ[১৭] ইবারত[১৮] হ্যায় মুস্কুরানে সে

খুদ-কুশী[১৯] হী রাস আঈ দেখ বদ-নসীবোঁ কো

খুদ সে ভী গুরেজাঁ[২০] হ্যঁয় ভাগ কর জমানে সে

অব জুনূঁ[২১] পে ওহ সাঅত আ পড়ী কি অয় 'মজরুহ'

আজ জখম-এ-সর[২২] বেহতর দিল পে চোট খানে সে

১. ময়দান, খোলা মাঠ; ২. লাল; ২. দোধারী; ৩. বিপ্লবের যুগ; ৪. সূর্যের গতি; ৫. প্রতীক্ষারত; ৬. মেলোডি, সুর; ৭. প্রেমিক হৃদয়; ৮. নক্ষত্র; ৯. পুঁতি, মোতি; ১০. হাল্কা, ডেলিকেট; ১১. বর্ণ ও সুগন্ধী; ১২. পরিচ্ছদ; ১৩. সৌন্দর্য; ১৩. কৃপাদৃষ্টি; ১৪. প্রকৃতি; ১৫. আঁচল; ১৬. আশাবাদী; ১৭. নতুন প্রভাত; ১৮. প্রতীক; ১৯. আত্মহত্যা; ২০. পলায়ন; ২১. উন্মাদনা; ২৩. মাথার ক্ষত

শিল্পী : গুলাম আলি
শায়র : আকবর ইলাহাবাদী
হঙ্গামা হ্যায় ক্যুঁ বরপা থোড়ী জো পী লী হ্যায়
ডাকা তো নহীঁ মারা চোরী তো নহীঁ কী হ্যায়
ন-তজরবা-কারী[১] সে ওয়াইজ[২] কী য়ে হ্যাঁয় বাতেঁ
ইস রঙ কো ক্যা জানে পুছো তো কভী পী হ্যায়
উস ময় সে নহীঁ মতলব দিল জিস সে হ্যায় বেগানা
মকসুদ[৩] হ্যায় উস ময় সে দিল হী মেঁ জো খিঁচতী হ্যায়
অয় শৌক ওহী ময় পী অয় হোশ জরা সো জা
মেহমান-এ-নজর[৪] ইস দম এক বর্ক-এ-তজল্লী[৫] হ্যায়
ওয়াঁ দিল মেঁ কি সদমে দো য়াঁ জী মেঁ কি সব সহ লো
উন কা ভী অজব দিল হ্যায় মেরা ভী অজব জী হ্যায়
হর জর্রা চমকতা হ্যায় অনওয়ার-এ-ইলাহী[৬] সে
হর সাঁস য়ে কহতী হ্যায় হম হ্যাঁয় তো খুদা ভী হ্যায়
সূরজ মেঁ লগে ধব্বা ফিতরত[৭] কে করিশমে[৮] হ্যাঁয়
বুত[৯] হম কো কহেঁ কাফির[১০] অল্লাহ কী মর্জী হ্যায়
তালীম[১১] জো নহীঁ হোতী নিয়্যত কী খরাবী হ্যায়
সচ কহতে হ্যাঁয় শৈখ 'অকবর' হ্যায় তাঅত-এ-হক লাজিম
হাঁ তর্ক-এ-ময়-ও-শাহিদ[১২] য়ে উন কী বুজুর্গী হ্যায়

১. অনভিজ্ঞতা; ২. ধর্মোপদেশক; ৩. বাঞ্ছিত কাজ, উদ্দেশ্য; ৪. ভাগ্যের অতিথি; ৫. আলো বিসারিত করে যে বিদ্যুৎ; ৬. radiance of God; ৭. প্রকৃতি; ৮. চমৎকারিত্ব, জাদু; ৯. আইডল, আদর্শ; ১০. প্রেমাস্পদ; ১১. শিক্ষাদান; ১২. quitting wine and gay men

শিল্পী : আশা ভোঁসলে
শায়র : শাহরিয়ার
ইন আঁখোঁ কী মস্তী[১] কে মস্তানে[২] হজারোঁ হ্যাঁয়
ইন আঁখোঁ সে বাবস্তা[৩] অফসানে[৪] হজারোঁ হ্যাঁয়
ইক তুম হী নহীঁ তনহা[৫], উলফৎ[৬] মেঁ মেরী রুসওয়া[৭]
ইস শহর মেঁ তুম জৈসে দীওয়ানে[৮] হজারোঁ হ্যাঁয়
ইক সির্ফ হম হী ময়[৯] কো আঁখোঁ সে পিলাতে হ্যাঁয়

কহনে কো তো দুনিয়া মেঁ ময়খানে[১০] হজারোঁ হ্যাঁয়
ইস শম্ম-এ-ফরোজাঁ[১১] কো আঁধি সে ডরাতে হো
ইস শম্ম-এ-ফরোজাঁ কে পরওয়ানে হজারোঁ হ্যাঁয়

১. intoxication ; ২. intoxicated, drunk ; ৩. সম্বন্ধযুক্ত ; ৪. গল্প ; ৫. একা, নিঃসঙ্গ ; ৬. প্রেম, ভালোবাসা ; ৭. ৮. crazy, প্রেমিক ; ৯. সুরা, মদ ; ১০. পানশালা ; ১১. shining, respeiendent lamp

শিল্পী : ভূপেন্দ্র সিং
শায়র : নিদা ফাজলী

কভী কিসী কো মুকম্মল[১] জহাঁ[২] নহীঁ মিলতা
কহীঁ জমীন কহীঁ আসমাঁ নহীঁ মিলতা
জিসে ভী দেখিয়ে ওহ অপনে আপ মেঁ গুম হ্যায়
জবাঁ মিলী হ্যায় মগর হম-জওয়াঁ[৩] নহীঁ মিলতা
তমাম শহর মেঁ এয়সা নহীঁ খুলুস[৪] ন হো
জহাঁ উমীদ হো ইস কী ওহাঁ নহীঁ মিলতা
কহাঁ চরাগ জলায়োঁ কহাঁ গুলাব রখেঁ
ছতেঁ তো মিলতী হ্যাঁয় লেকিন মকাঁ নহীঁ মিলতা
য়ে ক্যা অজাব হ্যায় সব অপনে আপ মেঁ গুম হ্যাঁয়
জবাঁ মিলী হ্যায় মগর হম-জওয়াঁ[৪] নহীঁ মিলতা
চরাগ জলতে হী বীনাঈ বুঝনে লগতী হ্যায়
খুদ অপনে ঘর মেঁ হী ঘর কা নিশাঁ নহীঁ মিলতা

১. পারফেক্ট, সুসম্পূর্ণ ; ২. সংসার, দুনিয়া ; ৩. এক-ভাষাভাষী ; ৪. সততা, অকপটতা

শিল্পী : জগজিৎ সিং
শায়র : অমীর মিনাঈ

সরকতী জায়ে হ্যায় রুখ সে নকাব[১] আহিস্তা আহিস্তা
নিকলতা আ রহা হ্যায় আফতাব আহিস্তা আহিস্তা
জওয়াঁ হোনে লগে জব ওহ তো হম সে কর লিয়া পর্দা
হয়া য়ক-লখত[২] আঈ অওর শবাব[৩] আহিস্তা আহিস্তা
শব-এ-ফুর্কত[৪] কা জাগা হুঁ ফরিশতোঁ[৫] অব তো সোনে দো
কভী ফুরসৎ মেঁ কর লেনা হিসাব আহিস্তা আহিস্তা
সওয়াল-এ-ওসল[৬] পর উন কো অদু[৭] কা খৌফ[৮] হ্যায় ইতনা
দবে হোঁটোঁ সে দেতে হ্যাঁয় জওয়াব আহিস্তা আহিস্তা
ওহ বেদর্দী সে সর কাটেঁ 'অমীর' অওর মঁয় কহুঁ উন সে
হুজুর আহিস্তা আহিস্তা জনাব আহিস্তা আহিস্তা

১. অবগুণ্ঠন ; ২. সমস্ত একসঙ্গে ; ৩. যৌবন ; ৪. বিরহ যামিনী ; ৫. স্বর্গের পরী ; ৬. ঐক্যের জন্য আবেদন ; ৭. শত্রু, প্রতিদ্বন্দ্বী ; ৮. আতঙ্ক

শিল্পী : বেগম আখতার
শায়র : জিগর মুরাদাবাদী

দুনিয়া কে সিতম[১] য়্যাদ অপনী হী ওফা য়্যাদ
অব মুঝ কো নহীঁ কুছ ভী মোহব্বত কে সিওয়া য়্যাদ

মঁয় শিকওয়া[২] ব-লব[৩] থা মুঝে য়ে ভী ন রহা য়্যাদ
শায়দ কি মিরে ভুলনে ওয়ালে নে কিয়া য়্যাদ
ছেড়া থা জিসে পহলে-পহল তেরী নজর নে

অব তক হ্যায় ওহ ইক নগমা-এ-বে-সাজ-ও-সদা[৪] য়্যাদ

জব কোঈ হসীঁ হোতা হ্যায় সরগর্ম-এ-নওয়াজিশ[৫]
উস ওয়ক্ত ওহ কুছ অওর ভী আতে হ্যাঁয় সিওয়া য়্যাদ

ক্যা জানিয়ে ক্যা হো গয়া অরবাব-এ-জুনুঁ[৬] কো
মরনে কী অদা য়্যাদ ন জীনে কী অদা য়্যাদ

মুদ্দত হুই ইক হাদসা-এ-ইশক[৭] কো লেকিন
অব তক হ্যায় তিরে দিল কে ধড়কনে কী সদা য়্যাদ

হাঁ হাঁ তুঝে ক্যা কাম মিরী শিদ্দত-এ-গম[৮] সে
হাঁ হাঁ নহীঁ মুঝ কো তিরে দামন কী হওয়া য়্যাদ

মঁয় তর্ক-এ-রহ-ও-রসম-এ-জুনুঁ[৯] কর হী চুকা থা

ক্যুঁ আ গঈ এয়সে মেঁ তিরী লগজিশ-এ-পা[১০] য়্যাদ
ক্যা লুৎফ কি মঁয় অপনা পতা আপ বতাউঁ
কীজে কোঈ ভুলী হুঈ খাস অপনী অদা য়্যাদ

১. অত্যাচার; ২. নালিশ; ৩. ঠোঁটস্থ; ৪. সুর ও স্বর বিহীন গান; ৫. পুরস্কৃত; ৬. people of frenzy; ৭. প্রেমের দুর্ঘটনা; ৮. intensity of sorrow; ৯. renunciation of ways of frenzy; ১০. tremor of the feet

শিল্পী : মহম্মদ রফি
শায়র : মুজতর খৈরাবাদী

ন কিসী কী আঁখ কা নূর[১] হুঁ ন কিসী কে দিল কা করার[২] হুঁ

কিসী কাম মেঁ জো ন আ সকে মঁয় ওহ এক মুশত-এ-গুবার[৩] হুঁ

ন দওয়া-এ-দর্দ-এ-জিগর[৪] হুঁ মঁয় ন কিসী কী মিঠী নজর হুঁ

ন ইধর হুঁ মঁয় ন উধর হুঁ মঁয় ন শকেব[৫] হুঁ ন করার হুঁ
মিরা ওয়ক্ত মুঝ সে বিছড় গয়া মিরা রঙ-রূপ বিগড় গয়া

জো খিজাঁ[৬] সে বাগ উজড় গয়া মঁয় উসী কী ফসল-এ-বহার হুঁ

পয়ে ফাতিহা[৭] কোঈ ক্যুঁ কোঈ চার ফুল চঢ়ায়ে ক্যুঁ

কোঈ আ কে শমঅ জলায়ে ক্যুঁ মঁয় ওহ বেকসী কা মজার হুঁ
ন মঁয় লাগ হুঁ ন লগাও হুঁ ন সুহাগ হুঁ ন সুভাও হুঁ
জো বিগড় গয়া ওহ বনাও হুঁ জো নহীঁ রহা ওহ সিংগার হুঁ
মঁয় নহীঁ হুঁ নগমা-এ-জাঁ-ফজা[৮] মুঝে সুন কে কোঈ করেগা ক্যা
মঁয় বড়ে বিরোগ কী হুঁ সদা মঁয় বড়ে দুখী কী পুকার হুঁ
ন মঁয় 'মুজতর' উন কা হবীব হুঁ ন মঁয় 'মুজতর' উন কা রকীব হুঁ
জো বিগড় গয়া ওহ নসীব হুঁ জো উজড় গয়া ওহ দয়ার হুঁ

১. জ্যোতি ; ২. শান্তি ; ৩. এক মুঠি ধুলো ; ৪. cure for anguish ; ৫. ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ; ৬. ঝরাপাতা ; ৭. prayers made on grave ; ৮. প্রাণবন্ত গীত

শিল্পী : লতা মঙ্গেশকার
শায়র : মজরুহ সুলতানপুরী

হম হ্যঁয় মতা-এ-কুচা-ও-বাজার[১] কী তরহ
উঠতী হ্যয় হর নিগাহ খরীদার কী তরহ
ইস কু-এ-তিশনগী[২] মেঁ বহুত হ্যয় কি এক জাম
হাথ আ গয়া হ্যয় দৌলত-এ-বেদার[৩] কী তরহ
ওহ তো কহীঁ হ্যয় অওর মগর দিল কে আস-পাস
ফিরতী হ্যয় কোঈ শয় নিগহ-এ-য়্যার[৪] কী তরহ
সীধী হ্যয় রাহ-এ-শৌক[৫] পে য়্যুঁহী কহীঁ কহীঁ
খম হো গঈ হ্যয় গেসু-এ-দিলদার[৬] কী তরহ
বে-তেশা-এ-নজর[৭] ন চলো রাহ-এ-রফতগাঁ[৮]
হর নকশ-এ-পা[৯] বুলন্দ হ্যয় দীওয়ার কী তরহ
অব জা কে কুছ খুলা হুনর-এ-নাখুন-এ-জুনুঁ[১০]
জখম-এ-জিগর[১১] হুয়ে লব-ও-রুখসার[১২] কী তরহ
'মজরুহ' লিখ রহে হ্যঁয় ওহ অহল-এ-ওয়ফা[১৩] কা নাম
হম ভী খড়ে হুয়ে হ্যঁয় গুনহগার কী তরহ

১. বাজারের রাজধানী ; ২. তৃষ্ণার গলি ; ৩. অভাবিত সম্পত্তি ; ৪. প্রেমিকার দৃষ্টি ; ৫. প্রেমের পথ ; ৬. tresses of beloved ; ৭. without spade of eye ; ৮. path of those gone by ; ৯. পদচিহ্ন ; ১০. skill of madness, method of madness ; ১১. হৃদয়ের ক্ষত ; ১২. ঠোঁট ও চিবুক ; ১৩. loyalists

শিল্পী : জগজিৎ সিং
শায়র : কৈফি আজমী

তুম ইতনা জো মুস্কুরা রহে হো
ক্যা গম[১] হ্যয় জিস কো ছুপা রহে হো
আঁখোঁ মেঁ নমী হঁসী লবোঁ[২] পর

ক্যা হাল হ্যয় ক্যা দিখা রহে হো
বন জায়েঙ্গে জহর পীতে পীতে
য়ে অশক[3] জো পীতে জা রহে হো
জিন জখমোঁ[4] কো ওয়ক্ত ভর চলা হ্যয়
তুম ক্যুঁ উনহে ছেড়ে জা রহে হো
রেখাওঁ কা খেল হ্যয় মুকদ্দর[5]
রেখাওঁ সে মাত খা রহে হো
১. দুঃখ ; ২. ঠোঁট ; ৩. অশ্রু ; ৪. ক্ষত ; ৫. ভাগ্য

শিল্পী : জগজিৎ সিং
শায়র : কৈফি আজমী
ঝুকী ঝুকী সী নজর বে-করার হ্যয় কি নহীঁ
দবা দবা সা সহী দিল মেঁ প্যার হ্যয় কি নহীঁ
তু অপনে দিল কী জওয়াঁ ধড়কনোঁ কো গিন কে বতা
মিরী তরহ তিরা দিল বে-করার হ্যয় কি নহীঁ
ওহ পল কি জিস মেঁ মোহব্বত জওয়ান হোতী হ্যয়
উস এক পল কা তুঝে ইন্তিজার হ্যয় কি নহীঁ
তিরী উমীদ পে ঠুকরা রহা হুঁ দুনিয়া কো
তুঝে ভী অপনে পে য়ে এতিবার হ্যয় কি নহীঁ

শিল্পী : আশা ভোঁসলে, ভূপেন্দ্র সিং
শায়র : হসন কমাল
কিসী নজর কো তেরা ইন্তজার আজ ভী হ্যয়
কহাঁ হো তুম কি য়ে দিল বেকরার আজ ভী হ্যয়
ওহ ওয়াদিয়াঁ ওহ ফজায়োঁ কি হম মিলে থে জহাঁ
মেরী ওয়ফা কা ওহীঁ পর মজার আজ ভী হ্যয়
ন জানে দেখ কে ক্যুঁ উনকো য়ে হুয়া অহসাস
কি মেরে দিল পে উনহে ইখতিয়ার আজ ভী হ্যয়
ওহ প্যার জিস কে লিয়ে হমনে ছোড় দী দুনিয়া
ওয়ফা কী রাহ পে ঘায়ল ওহ প্যার আজ ভী হ্যয়
য়কীঁ নহীঁ হ্যয় মগর আজ ভী য়ে লগতা হ্যয়
মেরী তলাশ মেঁ শায়দ বহার আজ ভী হ্যয়
ন পুছ কিতনে মোহব্বত কে জখম খায়ে হ্যাঁয়
কি জিন কো সোচ কে দিল সোগবার আজ ভী হ্যয়

শিল্পী : আশা ভোঁসলে
শায়র : শাহরিয়ার
দিল চীজ ক্যা হ্যয় আপ মিরী জান লিজিয়ে
বস এক বার মেরা কহা মান লিজিয়ে
ইস অঞ্জুমন মেঁ আপ কো আনা হ্যয় বার বার
দিওয়ার-ও-দর কো গৌর সে পহচান লিজিয়ে
মানা কি দোস্তোঁ কো নহীঁ দোস্তী কা পাস
লেকিন য়ে ক্যা কি গৈর কা এহসান লিজিয়ে
কহিয়ে তো আসমাঁ কো জমীঁ পর উতার লায়োঁ
মুশকিল নহীঁ হ্যয় কুছ ভী অগর ঠান লিজিয়ে

শিল্পী : পংকজ উধাস
শায়র : নূহ নারভী
আপ জিন কে করীব হোতে হ্যঁয়
ওহ বড়ে খুশ-নসীব হোতে হ্যঁয়
জব তবিয়ত কিসী পর আতী হ্যয়
মৌত কে দিন করীব হোতে হ্যঁয়
মুঝ সে মিলনা ফির আপ কা মিলনা
আপ কিস কো নসীব হোতে হ্যঁয়
জুল্ম সহ কর জো উফ নহীঁ করতে
উন কে দিল ভী অজীব হোতে হ্যঁয়
ইশক মেঁ অওর কুছ নহীঁ মিলতা
সৈঁকড়োঁ গম নসীব হোতে হ্যঁয়
'নূহ' কী কদ্র কোঈ ক্যা জানে
কহীঁ এয়সে অদীব হোতে হ্যঁয়

শিল্পী : ওসমান মীর
শায়র : জাভেদ আখতার
জিধর জাতে হ্যঁয় সব জানা উধর অচ্ছা নহীঁ লগতা
মুঝে পামাল[১] রস্তোঁ কা সফর অচ্ছা নহীঁ লগতা
গলত বাতোঁ কো খামোশী সে সুননা হামী ভর লেনা
বহুত হ্যঁয় ফায়দে ইস মেঁ মগর অচ্ছা নহীঁ লগতা
মুঝে দুশমন সে ভী খুদ্দারী[২] কী উম্মীদ রহতী হ্যয়
কিসী কা ভী হো সর কদমোঁ মেঁ সর অচ্ছা নহীঁ লগতা

বুলন্দী পর উনহে মিটটী কী খুশবু তক নহীঁ আতী
য়ে ওহ শাখেঁ হ্যঁয় জিন কো অব শজর[৩] অচ্ছা নহীঁ লগতা
য়ে ক্যুঁ বাকী রহে আতিশ-জনো[৪] য়ে ভী জলা ডালো
কি সব বে-ঘর হোঁ অওর মেরা হো ঘর অচ্ছা নহীঁ লগতা
১. পদদলিত; ২. আত্মসম্মান; ৩. গাছ; ৪. tinderbox-plural, flints
শিল্পী : অনুপ জলোটা
শায়র : সাহির লুধিয়ানভী
মেরী তকদির মেঁ জলনা হ্যয় তো জল জাউঙ্গা
তেরা ওয়াদা তো নহীঁ হুঁ জো বদল জাউঙ্গা
সোজ ভর দো মিরে সপনে মেঁ গম-এ-উলফৎ কা
মঁয় কোঈ মোম নহীঁ হুঁ জো পিঘল জাউঙ্গা
দর্দ কহতা হ্যয় য়ে ঘবরা কে শব-এ-ফুর্কত মেঁ
আহ বন কর তিরে পহলু সে নিকল জাউঙ্গা
মুঝ কো সমঝাও ন 'সাহির' মঁয় ইক দিন খুদ হী
ঠোকরেঁ খা কে মোহব্বত মেঁ সঁভল জাউঙ্গা

শিল্পী পাপন
শায়র সাইদ রাহী
দোস্ত বন-বন কে মিলে মুঝকো মিটানে ওয়ালে
ম্যঁয়নে দেখে হ্যঁয় কঈ রংগ বদলনে ওয়ালে
তুমনে চুপ রহ কে সিতম অওর ভী ঢায়া মুঝ পর
তুমসে অচ্ছে হ্যঁয় মেরে হাল পে হঁসনে ওয়ালে
ম্যঁয় তো ইখলাক কে হাথোঁ হী বিকা করতা হুঁ
অওর হোঙ্গে তেরে বাজার মেঁ বিকনে ওয়ালে
আখরী বার সলাম-এ-দিলে মুশতর লে লো
ফির ন লৌটেঙ্গে শব-এ-হিজর পে রোনে ওয়ালে

তথ্যসূত্র

১. মাজদা অসদ, 'গজল : উত্তর অওর দক্ষিণ মেঁ', আজকল, মে ১৯৮১
২. পশুপতিনাথ পাঠক ব্যাকুল, 'সংগীত মেঁ গজল কা স্থান', আজকল, মে ১৯৮১
৩. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, 'এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্তষ', পৃষ্ঠা ২৩৭
৪. ফিরাক গোরখপুরী, 'মেরী শায়রী', পৃ. ১০৪
৫. Firaq Gorakhpuri, 'On Poetry', p. 126
৬. Joseph Vissarionovich Stalin, 'Selected Works', vol. 1
৭. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'কাব্যের মুক্তি', 'স্বগত', প্রথম সিগনেট সংস্করণ, পৃ. ৩২
৮. সুকুমার সেন, 'ভাষার ইতিবৃত্ত', পৃ. ২০৮
৯. মোহম্মদ মুমতার্জু রশীদ খাঁ, 'অসনাফে সুখন', পৃ. ২০৬
১০. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, 'হাফিজের কবিতা', দেশ, ২৪ এপ্রিল ১৯৮১
১১. ড. ধনঞ্জয় বর্মা, 'গজল কো গজল হী রহনে দেঁ', ধর্মযুগ, ১৬ নভেম্বর ১৯৮০
১২. ফিরাক গোরখপুরী, 'উর্দু কী ইশকিয়া শায়রী', পৃ. ১৩
১৩. দুষ্যন্ত কুমার, 'কল্পনা', মার্চ ১৯৭৫
১৪. দুষ্যন্ত কুমার, 'সারিকা'-সম্পাদক কমলেশ্বরকে লেখা চিঠি
১৫. Gopichand Narang : 'The Urdu Ghazal : A Gift of India's Composite Culture'
১৬. অজিত রায়, 'সন্দর্ভ হিন্দী গজল', দিগন্ত, ১৯৮৪
১৭. বিশদ বিবরণ পড়ুন এই গ্রন্থেই।
১৮. এক বিশেষ গাইয়ে-সম্প্রদায়।
১৯. সুফিমত নিয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে এই গ্রন্থেই।
২০. হাফিজ সিরাজী, 'রুমানিয়া শায়রী'
২১. পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন, নির্বাচিত বক্তৃতা থেকে
২২. পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন, ঐ
২৩. মাজদা অসদ, 'গজল : উত্তর অওর দক্ষিণ মেঁ', আজকল, মে ১৯৮১
২৪. ফিরাক গোরখপুরী, 'উর্দু কী ইশকিয়া শায়রী', পৃষ্ঠা ৬১
২৫. মোহম্মদ হসন অস্করী, 'মীর কী শায়রী', পৃ. ২৫৬
২৬. বুদ্ধদেব বসু, 'কালিদাসের মেঘদূত'
২৭. সুধীন্দ্রনাথা দত্ত, 'স্বগত', পৃ. ৩৮
২৮. জগন্নাথ চক্রবর্তী, 'জীবনানন্দ বনলতা রবীন্দ্রনাথ', দেশ, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪
২৯. ড. খানিক আনজুম, 'গালিব কে খত', পৃ. ৫-২৫
৩০. ড. খানিক আনজুম, ঐ
৩১. ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'কুটীরের গান', ১ম সংস্করণ
৩২. Benoy Ghosh : 'The Bengali Intelligentia and the Revolt in Rebellion', 1857
৩৩. ঊষা উর্বেশ, 'জফর অওর উনকী শায়রী', আজকল, মে ১৯৮৩
৩৪. Dr. Shaikh Maksud Hali : 'Perso-Arabic Element in Bengali', p.111

৩৫. সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, চিঠিপত্র, দেশ, ১৮ অগাস্ট ১৯৮৪
৩৬. ড. ব্রজরতল দাস, 'উর্দু সাহিত্য কা ইতিহাস', পৃ. ১৮২
৩৭. অমিয় চক্রবর্তী, 'ইকবালের কবিতা', 'ঈশ্বর', 'কবিতা সংগ্রহ', পৃ. ৩০৮
৩৮. যুথিকা তলাপাত্র, 'হসন নিজামী', আজকাল, ১৪ অগাস্ট ১৯৮৪
৩৯. যীশু চৌধুরী, 'গণনাট্য আন্দোলনের ইতিবৃত্ত', শারদীয় পরিবর্তন, ১৯৮৩
৪০. বুদ্ধদেব বসু, 'প্রবন্ধ সংকলন', পৃ. ৭৮
৪১. অজিত রায়, 'জীবন ও কবিতায় ফিরাক গোরখপুরী', গোধূলি মন, মে ১৯৮৩
৪২. মোহনচন্দ্র মন্থন, 'সাগর নিজামী : ব্যক্তিত্ব অওর কৃতিত্ব', আজকল, জুন ১৯৮৪
৪৩. ড. ধনঞ্জয় বর্মা, 'গজল কো গজল রহনে দেঁ', ধর্মযুগ, ১৬ নভেম্বর ১৯৮০
৪৪. হরিশংকর শর্মা, 'উর্দু সাহিত্য কা ইতিহাস', পৃ. ১৯
৪৫. অজিত রায়, 'রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে হিন্দী', দেশলোক, ১ এপ্রিল ১৯৮৪
৪৬. Mohun Kumar Manghaulam : 'Indian Language Crisis', p. 129
৪৭. রামচন্দ্র শুক্ল, 'হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস', পৃ. ৬৬
৪৮. ড. রাজনাথ শর্মা, 'হিন্দী সাহিত্য কা বিবেচনাত্মক ইতিহাস', পৃ. ৭৯
৪৯. অজিত রায়, 'বিষয় হিন্দী গজল', ধনবাদ সমাচার, অগাস্ট ১৯৮৪
৫০. আনন্দ নারায়ণ শর্মা, 'ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র', কিশোর ভারতী, অগাস্ট ১৯৬৪
৫১. মহাদেবী বর্মা, 'ছায়াবাদ', পৃ. ৭৮
৫২. ড. সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, 'আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাঙলার স্থান', পৃ. ৯৪-১১১
৫৩. ড. রামবিলাস শর্মা, 'রচনাবলী', ১৯৪৮
৫৪. Dr. Prabhakar Machwe : 'Hindi Writing : Poetry in Plenty', Statesman, 19 Ausust 1984
৫৫. Dr. Prabhakar Machwe : ঐ
৫৬. Dr. Prakash Verma : 'The History of Hindi Poetries'
৫৭. অজিত রায়, 'অকবিতা', আজকাল, ডিসেম্বর ১৯৮২
৫৮. আশুতোষ সিনহা, বেকল উৎসাহীর সাক্ষাৎকার, আজকল, জুন ১৯৮২
৫৯. সওয়াই সিং শেখাওৎ, 'দুষ্যন্ত কুমার : নঈ কবিতা সে ওয়াপসি অওর গজল', আজকল, মে ১৯৮১
৬০. সওয়াই সিং শেখাওৎ, ঐ
৬১. শেরজং গর্গ, 'গজল : জনজীবন কী সহী অভিব্যক্তি', আজকল, মে ১৯৮১
৬২. নরেন্দ্র বশিষ্ঠ, 'গজল পর পরিচর্চা', আজকল, মে ১৯৮১
৬৩. ড. সুধেশ বর্মা, 'হিন্দী গজল'
৬৪. মোবারক হোসেন খানের লেখা থেকে বাংলাপিডিয়া
৬৫. আবদুল হলিম শরর, 'গুজিস্তা লখনউ', পৃ. ৪৭-৪৮
৬৬. হামদি বে, 'বাঈজী', বর্তমান দিনকাল, এপ্রিল ১৯৮৪
৬৭. রেবা মুহুরী, 'ঠুংরী ও বাঈজী', প্রতিক্ষণ, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪
৬৮. অজিত রায়, 'গানের গজল', গোধূলি মন, জানুয়ারি ১৯৯৭
৬৯. আবদুল হলিম শরর, 'গুজিস্তা লখনউ'
৭০. অজিত রায়, 'চন্দার ব্যান্ড', আজকাল, ৪ জুলাই ১৯৮৪
৭১. আবদুল হলিম শরর, 'গুজিস্তা লখনউ', পৃ. ১১২

৭২. আবদুল হলিম শরর, ‘গুজিস্তা লখনউ’

৭৩. তবে, 'গুজস্তা লখনউ' গ্রন্থের লেখক আবদুল হালিম 'শরর' জোর দিয়ে বলেছেন, তাম্বুলবিলাসী হলেও নবাব কখনও মদ বা আফিম ছোঁননি।

৭৪. আবদুল হলিম শরর, ‘গুজিস্তা লখনউ’

৭৫. বিশদ বিবরণ রয়েছে শ্রীপান্থ রচিত ‘ মেটিয়াবুরুজের নবাব’ গ্রন্থে।

৭৬. ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, আনন্দবাজার পত্রিকা, অনলাইন সংস্করণ, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

৭৭. রেবা মুহুরী, ‘ঠুংরী ও বাঈজী’, প্রতিক্ষণ, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪

৭৮. অরশদ মলিক, ‘গওহর জান’

৭৯. শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, ‘শেষ বাঈজী’, দেশ, ১২ মে ১৯৮১

৮০. হবিবুর শেখ, ‘তামাঞ্জা জান’, পরিবর্তন, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩

৮১. শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, ‘বাঈজীর সম্মান’, দেশ, ২৪ জুলাই ১৯৮৫

৮২. শিবাংশু দে, ‘বইপাড়া’, ই-বাংলা

৮৩. শম্ভুনাথ মিশ্র, ‘গজল গায়কী কা সফর কহাঁ সে কহাঁ তক’, আজকল, মে ১৯৮১

৮৪. অজিত রায়, ‘হিন্দী কবিতা আর গানে গজলের ভূমিকা’, পরিবর্তন, ৪ নভেম্বর ১৯৮১

৮৫. ধীরেন্দ্র আস্থানা, ‘হিন্দী ফিল্মোঁ মেঁ গজল’, ধর্মযুগ, অগাস্ট ১৯৮৩

৮৬. হরিহর দিওয়ানে, ‘বেগম অখতার’, হংস, মার্চ ১৯৮৫

৮৭. শম্ভুনাথ মিশ্র, ‘গজল গায়কী কা সফর কহাঁ সে কহাঁ তক’, আজকল, মে ১৯৮১

৮৮. জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, ‘তহজীব-এ-মৌসিকী’

৮৯. শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, ‘বাঈজীর সম্মান’, দেশ, ২৪ জুলাই ১৯৮৫

৯০. অজিত রায়, ‘গায়কী কী দুনিয়া’, সারিকা, জুন ১৯৮৫

৯১. অজিত রায়, ‘গজল আজকের ক্রেজ’, বর্তমান দিনকাল, শারদীয়, ১৯৮৪

উল্লেখযোগ্য নাম-নির্দেশিকা